কমলা

[গার্হস্থ উপন্যাস]

"What is nearest us, touches us most ; the feelings rise higher at domestic than at imperial tragedies."

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

মূল্য ১।০

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত জলধর সেন

মহাশয় বহুগুণাশ্রয়েষু

অকিঞ্চিৎকর ও মুদ্রাঙ্কনের অযোগ্য হইলেও আপনার উৎসাহবাক্যেই যাহা মুদ্রিত করিতে সাহসী হইয়াছি, সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ তাহা আপনারই করকমলে অর্পণ করিলাম।

ভবদীয়

শ্রীআশুতোষ দেবশর্ম্মা

আভাষ

—:*:—

সাধারণ গৃহস্থের জীবনে যে সকল ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, সেই রকমের একটি তুচ্ছ ঘটনাই এই আখ্যানের অবলম্ব। সেই ঘটনাটিকে কল্পনার সাহায্যে বিস্তারিত করিয়া যথাবৃত্তবৎ বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য এবং তাহাই ইহার সর্ব্বস্ব। ইহা কি কাহাকেও ভাল লাগিবে ?

সামান্য গার্হস্থ ঘটনার নগ্ন তুচ্ছতাকে মোটামুটি একটা কল্পনার আবরণে ঢাকিয়া উপন্যাসের সমাজে উপস্থাপিত করায় তাহার আবর্জ্জনা বৃদ্ধি ছাড়া ইহা দ্বারা আর কি হইবে ?

তবে সংসারে ও সমাজে দেখিতে পাই, মহৎ ক্ষুদ্র, সুন্দর কুৎসিত, ভাল মন্দ, পাশাপাশি অবস্থান করে। ক্ষুদ্রাদি দ্বারা সংসারের বা সমাজের কি প্রয়োজন কতটুকু সাধিত হয় তাহা বলা যায় না ; কিন্তু দেখা যায়, তাহাদের দ্বারাও একটা উপকার হইয়া থাকে। তাহারা আপনাদের ক্ষুদ্রতা, কদর্য্যতা ও অপকৃষ্টতা দ্বারা মহতাদির মহত্ত্ব, সৌন্দর্য্য ও উৎকৃষ্টতাকে অধিকতর মহৎ, সুন্দর, ও উৎকৃষ্ট করিয়া দেখাইতে সহায়তা করে। সংসারে বা সমাজে যাহা হইয়া থাকে, সাহিত্যে বা উপন্যাসেও কি তাহাই হইতে পারে না ?

জনাই
আশ্বিন
১৩২১

বিনীত

শ্রীআশুতোষ দেবশর্ম্মা
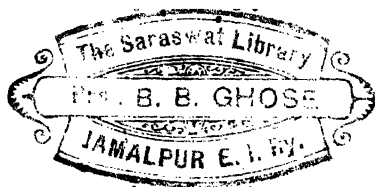
বৈশাখের মধ্যাহ্ন পল্লীগ্রামে নিশীথের মত একটা নিস্তব্ধতা আনিয়া দিয়াছে। পথে ঘাটে লোক নাই। মাঠে গরু বাছুর দেখা যায় না। বনে পশুপক্ষী সব নিবিড় গহন ও ঘন পল্লবের মধ্যে লুকাইয়া নীরবে অবস্থান করিতেছে। সংসারের অবিরাম কর্ম্ম-চঞ্চলতাও যেন একবার বিশ্রাম লইয়াছে। চারিদিকে শুধু রৌদ্র কাঁপিতেছে, আর তপ্ত বায়ু সন্তপ্তা প্রকৃতির উষ্ণশ্বাসের ন্যায় তপ্ত প্রান্তরবক্ষঃ হইতে হু হু করিয়া বহিয়া আসিতেছে।

প্রান্তরপারে চব্বিশ পরগণার একখানি বিরলবাস, বৃক্ষময় পল্লী-গ্রাম যেন রৌদ্রের ভয়েই বৃক্ষরাজির মধ্যে লুকাইয়া নীরবে অবস্থান করিতেছিল। তাহার প্রান্তভাগে একখানি বড় দোতালা কোঠাবাড়ী ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া অধিবাসিগণের অতীত সমৃদ্ধি ও বর্ত্তমান দৈন্যের পরিচয় দিতেছিল। সেই গৃহের একটি কক্ষে এক শীর্ণকায় প্রৌঢ় ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার পাশে একখানি 'যোগবাশিষ্ঠ' খোলা পড়িয়া

ছিল। অন্য এক কক্ষে এক কিশোরী বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল,—ফুলের মালা নহে, তুলসী কাঠের। সেই ঘরের সম্মুখে, দালানের এক-পাশে এক বৃদ্ধা মেজেতে পড়িয়া অসাড়ে ঘুমাইতেছিল। প্রৌঢ় গৃহস্বামী—তাঁহার নাম সূর্য্যনারায়ণ। কিশোরী তাঁহার অনূঢ়া কন্যা—কমলা; আর বৃদ্ধা তাঁহাদের প্রতিবেশিনী ও পরিচারিকা—অনঙ্গ-মোহিনী।

কমলার বয়স্ কত তাহা ঠিক বলিবার উপায় নাই; তাহার জননী নাই, জন্মপত্রিকাও ছিল না। সূর্য্যনারায়ণ কন্যার বয়সের হিসাব রাখেন নাই। অনঙ্গ বলে, "সে এই সবে এগারো উত্তুরে বারোয় পা দিয়েছে।" কিন্তু প্রতিবেশিনীরা বলেন, "একথা আমরা আজ তিন বছর ধ'রে শুনে আস্‌ছি।" এই দুইএর কোন্‌টা ঠিক তাহাও বলা কঠিন; কারণ, পরের বয়স্ ও পরের টাকা পরে বেশীই দেখিয়া থাকে, আবার এই দুইটাই অনেকে দোষের মত ঢাকিতেই যত্ন করে।

বয়স্ লুকাইয়া রাখিলেও বয়োধর্ম্ম কিন্তু লুকাইবার নহে। বাল্য-কাল নিজ শাসনকালের অবসান বুঝিয়া কমলার স্বাস্থ্যপূর্ণ প্রাংশু দেহ হইতে বিদায়-গ্রহণের উপক্রম করিতেছিল, এবং যৌবন নূতন অধিকারে নিজের অধিষ্ঠান-সূচনার আয়োজন করিতেছিল। চন্দ্র ও সূর্য্যের যুগপৎ অস্তোদয়ে প্রকৃতির অঙ্গশোভা যেমন মনোজ্ঞ হইয়া উঠে, তাহার দেহখানিও তেমনি বাল্য ও যৌবনের এই বিদায় ও আগমন সম্মিলনে মনোহর একটা অযত্নসম্ভূত, অভিনব শ্রী ধারণ করিতেছিল। বাল্যসুলভ চপলতা প্রভৃতিও যেন যৌবনের রমণীয় গাম্ভীর্য্যে হারাইয়া যাইতেছিল।

কমলা আধ-ভিজা চুলগুলিকে পিঠের উপরে এলাইয়া দিয়া, একটু ঝুঁকিয়া এরূপভাবে বসিয়া ছিল যে, তাহার দেহের পশ্চাদ্‌ভাগটি

সমস্তই চুলে ঢাকা পড়িয়াছিল, এবং সম্মুখের কতকগুলি চুল মুখের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া মেজেতে লুটাইতেছিল। অগাধ কালোজলে পদ্ম ফুটিয়া থাকিলে অথবা কালোমেঘের কোলে চাঁদ উঠিলে যেমন সুন্দর দেখায়, কালোচুলের মাঝে তাহার সুন্দর মুখখানিও তেমনি সুন্দর দেখাইতেছিল। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে তাহার শুভ্র গণ্ডস্থল এক একবার পৌর্ণমাসী উষার ন্যায় আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, আবার তাহার উপরে প্রভাতের মত একটা পাণ্ডুতাও আসিয়া পড়িতেছিল। নীরব গৃহের মধ্যাহ্ননিস্তব্ধতা একটা কথা তাহার মনে তুলিয়া দিয়াছিল। সেটা তাহার বিবাহের কথা।

সূর্য্যনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না; কিন্তু বিবাহেরও কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। ঘটক যে সব সন্ধান আনে, অনুসন্ধানে তাহা তাঁহার মনোমত হয় না—ঘর ভাল হয় ত বর ভাল হয় না, বর ভাল হয় ত ঘরে মিল হয় না; আবার ঘর ও বর দুই ভাল হয় ত দেনা পাওনায় মিলে না। 'আইবুড়' এতবড় মেয়ে ঘরে রাখিয়া তিনি কি করিয়া নিদ্রা যান, তাহা ভাবিয়া প্রতিবেশীদের নিদ্রা হয় না; তিনি যে এখনও স্নান-ভোজন করিতেছেন এই অপরাধে তাঁহাকে অনেকের অনেক সনিন্দপরিহাসও শুনিতে হয়। কমলাও তাহা হইতে অব্যাহতি পায় না। অনঙ্গই যখন তখন বলিয়া থাকে, "এমন ভাঙ্গারেশে মেয়ে ভুভারতে দেখি নি।" সে যে দিনে দিনে সবার উদ্বেগের হেতু হইয়া উঠিতেছে, তাহা ভাবিয়া তাহারও মন বেশ স্বচ্ছন্দ থাকিতে পায় না। সে প্রায়ই মনে করে—এখনও করিতেছি, বিধাতা কি সত্যই তাহার ভাগ্যে বিবাহ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন? এই চিন্তা আরও একটা কথা তাহার মনে আনিয়া দিল।

কমলা

বাড়ীতে ঘটক আসিলেই কমলা সরিয়া যায়। কখন হয় ত বা সে সুবিধা হয় না ; তাহাতে দুই চারিটা পাত্রের কথা তাহার কাণে উঠিয়া থাকে। কিন্তু মেঘ চলিয়া গেলে যেমন আকাশের গায়ে দাগ থাকে না, এই সব পাত্রের কথাও তেমনি তাহার মনে অঙ্কপাত করিতে পারে না। এক দিনের একটা কথা শুধু সে ভুলিতে পারে নাই। সে পাত্রটির নাম বিরাজমোহন। এই নামটা মনে হইলেই কে যেন তাহার নবনীতাভ গণ্ডে সিন্দূর ঢালিয়া দেয়। বিরলে বসিলেই তাহার মন সেই ঘটকবর্ণিত মূর্ত্তিটিকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। পূর্ব্বে সে যাহার যত রূপ দেখিয়াছে—যাহার যত গুণের কথা শুনিয়াছে, সব আসিয়া এই মূর্ত্তিকল্পনাকল্পে যোগদান করে। কেহ আসিয়া পড়িলেই সে অর্দ্ধগঠিত মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া যায়। লজ্জায় তাহার মুখখানি নত হইয়া পড়ে। আরক্ত কপোল দুইখানিকে সে তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। তাহার এ লুকান চিন্তার কথা কেহ জানিত না। সে নিজেই বুঝিত না, ইহা কি—অনুরাগ অথবা পূর্ব্বরাগ ; তবে হিন্দুর কুমারীকে যে এভাবের কোন কথা মনে করিতে নাই, অভিভাবক তাহাকে যাহার করে সম্প্রদান করেন—সে নির্গুণ বা নির্ধন হউক, মূর্খ অথবা কুৎসিত হউক—তাহাকেই দেবতা ভাবিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি-ভালবাসা অর্পণ করিতে হয়, আর বিবাহের পূর্ব্বে যদি কাহাকেও মনে ধরিয়া থাকে তাহার স্মৃতিটিকে পর্য্যন্ত মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হয়, পড়িয়া শুনিয়া সেটা তাহার ধারণা হইয়াছিল। তাহাতেই এ চিন্তাটাকে সে মন হইতে সরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার মন তাহা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। যাহার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, সে অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট যুবার চিন্তা তাহার মনের এত প্রিয় কেন তাহাও সে ঠিক

বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যাহা করিতে নাই তাহার উপরেই যে মনের কেমন একটা ঝোঁক পড়ে, যে সময়ে যে কথাটা মনে করিতে নাই ঠিক সেই সময়ে সেই কথাটাই যে আগে মনে উঠিয়া পড়ে, যে দিকে চাহিতে নাই চোখ যে নিয়ত সেই দিকেই ছুটিয়া যায়, তাহা সে বেশ বুঝিত। হরিতালিকায় চাঁদ দেখিবার জন্য তাহার চক্ষুদুটিও কতদিন কেবল আকাশের দিকেই ছুটিয়া গিয়াছে। তাহাতেই সে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, এটাও সেইরূপ একটা নিষিদ্ধের আকর্ষণ; কিন্তু সম্প্রতি আবার আর একটা কথা মনে উঠিয়া এ সিদ্ধান্তটাকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কমলা তাহার পিতার মুখে শুনিয়াছিল, মানুষের অনাত্মবশ মন বিধাতার ইচ্ছার অনুগামী হইয়া বায়ুতাড়িত তৃণের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। তাহাতেই সে ভাবিত এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ভাবিতেছিল, বিধাতা যদি বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার মরণের বিধান না করিয়া থাকেন তবে অবশ্যই একজনকে তাহার স্বামিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছেন—সংসারের অসংখ্য মনুষ্যের মধ্যে সেই একজনের অদৃষ্টের সঙ্গে তাহার অদৃষ্টকে একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেই কি এই বিরাজমোহন? কিন্তু তাহার পিতা সাধ্যাতীত বলিয়া সে প্রস্তাব বহুদিন পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া তাহার মনটা বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

কমলা ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একটা বীজের মধ্যে সূতা চালাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে সূর্য্যনারায়ণ জাগিয়া ডাকিলেন, "কোথা গো মা—কমলা!"

নিদ্রিত শিশু জাগিয়া ডাকিলে তাহার জননী যেমন আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত ত্যাগ করিয়া তাহার উদ্দেশে ধাবিত হইয়া থাকে, কমলাও

সেইভাবে মালা-গাঁথা ফেলিয়া, পিতার কক্ষে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বাবা ?—বাতাস ক'রব কি ?"

সূর্য্যনারায়ণ উঠিয়া, শয্যার উপরে বসিয়া বলিলেন, "না—মা ; জানালাগুলি এইবার সব খুলে দাও !"

কমলা তাহাই করিল এবং মালা-গাঁথার সরঞ্জাম আনিয়া আপনিও সেই ঘরের মেজেতে বসিল। সূর্য্যনারায়ণ চশমা পরিয়া বইখানি কোলে তুলিয়া লইলেন।

সূর্য্যনারায়ণের বয়স্ পঞ্চাশের বড় বেশী হইবে না ; কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, সম্পূর্ণ আশীটি বৎসর তাঁহার পলিত মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন দিনের সন্ধ্যার ন্যায় যেন সময়ের পূর্ব্বেই জরা আসিয়া তাঁহার রোগজীর্ণ দেহখানিকে অধিকৃত করিতেছিল। সুখ ও সম্পদ্ যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়, বসন্ত-রোগের মত তাহাদের মুখে একটা অনপনেয় চিহ্ন রাখিয়া যায়। তাঁহার মুখে সে চিহ্ন সুস্পষ্ট। একদিন তাঁহার অর্থ ও সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সংসার যাহাকে 'হিসাব' বলে, তিনি তাহা ভাল বুঝিতেন না ; তাহাতেই সুসময়ে অনেককে অর্থ দিয়া, কন্যা ও অন্যান্য দায় হইতে মুক্ত করিয়া সময়ের বিগতিতে আজ আপনিই একমাত্র কন্যার উদ্বাহ-উৎসবকেও দায় বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বইখানি খুলিয়া রাখিয়া দিয়া, চশমাখানি কাপড়ে মুছিতে মুছিতে সূর্য্যনারায়ণ বলিলেন, "তুমি কি একবারও একটু ঘুমও নি, মা ?"

কমলা। দিনে যে আমার ঘুম হয় না, বাবা !—তুমি ত বল দিনে ঘুমন ভাল নয়

সূর্য্য। তা সত্য, তবে আমার না কি রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না তাই দিনের বেলা হলেই চোখ দু'টি যেন ঘুমে বুজে আসে।

কমলা। তুমি ত সব জানালা খুলে রাখ—তবু ঘুম হয় না কেন?

সূর্য্য। গ্রীষ্ম ব'লে নয়, মা!—মনে কিছুর একটা ভাবনা থাক্‌লে চোখে ঘুম আস্‌তে চায় না।

"কেনই এত ভাব, বাবা" বলিয়া, কমলা যে কয়েকটা বীজের মধ্যে সূতা চালাইয়াছিল, সেইগুলিকে টানিয়া মালার সঙ্গে মিলাইয়া দিল।

সূর্য্য। ভাবতে কারুকে হয় না, মা—ভাবনা আপনি এসে জোটে! যার দেনা নেই, তার ভাবনা কিছু কম; দেনার উপরে আবার যার স্নেহের কারুকে নিঃসহায় ক'রে যাবার ভয় আছে, তার ভাবনা বড় বেশী। বিয়ে দিয়ে তোমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পারলে আমিও নির্ভাবনায় ঘুমতে পারব।

বিবাহের কথায় কমলার আনত মুখখানি আরও নত হইয়া পড়িল। সূর্য্যনারায়ণ চশমা পরিয়া আবার বইখানি তুলিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া, বইখানিকে নামাইয়া রাখিয়া চশমাখানি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "হ্যাঁ—দ্যাখ, কমলা! ঠাকুরপুত্র সেদিন হরোর সঙ্গে তোমার বের কথা পেড়েছিলেন! হর না কি নিজেই একথা তাঁকে ব'লেছে!"

হরকুমার তাঁহাদের গ্রামবাসী ধনাঢ্য যুবা। তাহার পিতার সহিত সূর্য্যনারায়ণের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। হরকুমারকেও তিনি বিশেষ স্নেহ করেন, সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকাও তাহার নিকটে ধার করিয়াছেন। কমলার কিন্তু ইচ্ছা নহে, আশৈশব যাহাকে সহোদরের মত ভাবিয়া আসিয়াছে—এখনও 'হরদাদা' বলিয়াই ডাকে, তাহারই গৃহিণী হয়।

সূর্য্যনারায়ণ পুনশ্চ বলিলেন, "হরকে তুমি বিশেষ জান, আমার ব'লে দেবার মত কিছুই নেই। সে মূর্খ নয়—কৃতবিদ্য, কুৎসিত নয়—বরং রূপ-

বান্ ; অর্থ ও সম্পত্তি তার যথেষ্টই আছে। দ্বিতীয়পক্ষও নামে মাত্র—তার বয়েসে কতজনের প্রথমবারই বিবাহ হয় না। তুমিই তার গৃহের সর্ব্বময়ী হবে, আমিও সর্ব্বদাই তোমাকে দেখ্‌তে পাব ; আর উপস্থিত ধারের উপরেই আবার আমাকে ধার ক'রতেও হবে না—সে এক পয়সাও নেবে না ব'লেছে। ঘটে ত মন্দ কি ?"

মন যাহা চাহে তাহা না পাইয়া ক্ষুব্ধ হয় বটে, কিন্তু যাহা চাহে না বাধ্য হইয়া তাহাই গ্রহণ করিতে ঔষধ-সেবনের নামে দুষ্ট শিশু যেমন বাঁকিয়া বসে তেমনি বাঁকিয়া বসে। হরকুমারের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে কমলার মনের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বীজের ছিদ্র সব যেন অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল। কমলা সূতা চালাইবার ছিদ্র না পাইয়া এক একটিকে তুলিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, আবার রাখিয়া দিতে লাগিল। শেষে গাঁথা বীজগুলিকেই টানিয়া টানিয়া একে একে সূতা হইতে বাহির করিতে আরম্ভ করিল। সেইরূপে মধ্যাহ্ন হইতে এই কাল তাহাতে যতটুকু পরিশ্রম করিয়াছিল, সব দেখিতে দেখিতে পণ্ড হইয়া গেল। তাহার কপোলে ও ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের সঞ্চার হইতে লাগিল।

সূর্য্যনারায়ণ চকিতে একবার কন্যাকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, আমাকে জানাতে লজ্জা ক'রো না, মা! তোমার গর্ভধারিণী নেই। তোমার অনিচ্ছায় আমি তোমাকে কারও হাতে সঁপে দিয়ে যা'ব না।"

কমলা কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল বটে, কিন্তু "আর উপস্থিত ধারের উপরেই আবার আমাকে ধার ক'রতেও হবে না"—সূর্য্যনারায়ণের এই কথাগুলি তখন ঘূর্ণবাতাসের মত তাহার মনের মধ্যে তাল পাকাইয়া

ঝুরিতেছিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া লজ্জানতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "এ সবের আমি কি জানি, বাবা?—কি ভাল কি মন্দ তুমি ভাল জান; আমি ত এখনও সব বুঝ্‌তে শিখি নি।"

অতি শৈশবে কমলা তাহার মাকে হারাইয়াছিল। সংসারে অন্য পরিজন ছিল না। কেবল পিতাকে মাত্র সহায় করিয়া সে এত বড় হইয়াছে। আর সূর্য্যনারায়ণেরও এই কন্যাই সংসারের একমাত্র অবলম্বন। যেদিন হইতে সে কিছু কিছু বুঝিতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতেই সংসারের যত কিছু কথা—যাহা কিছু পরামর্শ, সবই তিনি তাহাকে লইয়া স্থির করিয়া আসিতেছেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "কোন্ কাজটা আমি তোমাকে না ব'লে করি, কমলা? অন্য কিছুতেও তত কিছু যায় আসে না, এটা যে শুধু তোমার সুখ-দুঃখের চিরজীবনের, মা! অন্যে যে যাই করুক, আমি আর সব কাজের মত এটাও তোমার মতামত না বুঝে স্থির ক'রব না"—কমলা কোন কথা কহিল না; তিনি একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আর একটা কথা তুমি জান না, তোমার প্রসূতি যেদিন জন্মের মত চ'লে যায়, সেই দিন আমার হাতে ধ'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'লে গেছে—'তুমি রইলে, আমার কমলা রইল দেখো—তার চোখের এক ফোঁটা জল, আমার এই হিমাঙ্গের সমস্তটুকু রক্ত!'—আমি যদি ভাল ভেবেও একটা কাজ করি, আর তার ফলে তোমার সুখ না হয়, তা'র আত্মা শান্তি পা'বে না; আমিও কি ম'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারব?"

কক্ষমধ্যে ক্ষণকাল একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিল। সূর্য্যনারায়ণ দূর আকাশে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁর বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে তাহা মুছিতে মুছিতে উঠিয়া, মালার সরঞ্জামগুলি তুলিয়া রাখিয়া, বাহিরে চলিয়া যাইবার সময়ে

দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল, "তুমি ত বল, বাবা, সুখ দুঃখ সব কপালের লেখা!—কিন্তু দেনা আরও বেশী বাড়ান ভাল কি?"

কমলা চলিয়া যাইবার পর সূর্য্যনারায়ণ অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবনার শেষে তাঁহার মুখখানি বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে প্রফুল্লভাব বহুদিন তাঁহাতে দেখা যায় নাই। তিনি যেন আজ একটা নূতন কিছু পাইয়াছেন, যেন বহু জটিল বিতর্কের শেষে সত্যের সরল পথ দেখিতে পাইয়াছেন, সংশয়ের অবসানে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, অথবা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি সেই দিনেই অপরাহ্নে হরকুমারের বাড়ীতে গমন করিলেন। কমলাও বিবিধ যুক্তির বচনে নিজের অবাধ্য ও অবোধ মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

২

সূর্য্যনারায়ণের গ্রামের দুই তিন ক্রোশ দূরে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী আর একটি পল্লীগ্রামে নীলকমলের নিবাস। নীলকমল বেশ সমৃদ্ধ জমীদার। গ্রামে দু'মহল দ্বিতল কোঠাবাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী ও জমীজমা বিস্তর। তেজারতি, কোম্পানির কাগজ ও কলিকাতার বাড়ী-ভাড়া প্রভৃতিতেও তাঁহার বেশ আয় ছিল—ছিল না কেবল সুনাম। বিষয়ের বাসনা প্রবল থাকিলে সুনাম বড় কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায় না; কিন্তু মান-সম্ভ্রম সম্পদের চিরসহচর। সুখ্যাতি না থাকিলেও গ্রামে তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল।

বিধাতা তাঁহার দেহখানিকে সৌন্দর্য্যের উপাদানে সযত্নে নির্ম্মাণ করেন নাই বটে, কিন্তু আকৃতি অসুন্দরও বলা যায় না। অর্থেই শ্রী এবং স্বাস্থ্যেই সৌন্দর্য্য—তাঁহার দুইই ছিল।

এমন অনেক দেশের কথা শুনা যায়, যেখানে পুষ্প-সম্পদ্ লইয়া বসন্ত-ঋতুটা বর্ষে একবারও দেখা দেয় না ; আবার এমনও অনেক আছে, যেথা বসন্তই বর্ষের বহুলাংশব্যাপী। তেমনি অনেক মানুষও দেখা যায়, যাহাদের জীবনে যৌবন দেখা দেয় না—বাল্যের পরেই যেন বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়ে ; আবার কাহারও বা জীবনের অধিকাংশকাল ব্যাপিয়াই যৌবন থাকে। নীলকমলের এই শেষপ্রকার।

বয়সের হিসাবে তাঁহার যৌবনকাল বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বার্দ্ধক্যের কোন লক্ষণই এখনও দেখা দেয় নাই—একগাছি চুল শাদা হয় নাই, একটি দাঁত নড়ে নাই, সূক্ষ্ম বা দূরের বস্তু দেখিতেও কখন তাঁহার চশমার প্রয়োজন হয় না। উৎসাহ ও শ্রমশীলতায় তিনি যুবার সদৃশ।

নীলকমলের পরিবার বৃহৎ নহে ; পত্নী, একমাত্র পুত্র, আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র লইয়াই তাঁহার সংসার। তাঁহার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপনের সাধ অনেকেরই। তাঁহার সম্পত্তিই তাহার একমাত্র হেতু নহে ; তাঁহার পুত্র বিরাজমোহনও রূপে ও গুণে কন্যাবান্‌গণের আকর্ষণ-কেন্দ্র।

বিবাহের বয়স্ হইলেও বিরাজের এখনও কোথাও সম্বন্ধ স্থির হয় নাই। প্রথমে তাহারই এ বিষয়ে ভারী আপত্তি ছিল, এবং পিতা মাতার অবাধ্য না হইয়া যাহা একেবারে এড়াইবার উপায় ছিল না, তাহা সে পড়া শুনা শেষের ওজর করিয়া এতদিন ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। এখন আর তা আপত্তি করিবার কিছুই নাই ; কিন্তু নীলকমলের অসঙ্গত অর্থাকাঙ্ক্ষা তাঁহার পত্নীর অসামান্যসুন্দরী-পুত্রবধূ-কামনা কোনও কন্যা কামনা পূর্ণ হইতে দেয় না। যাহার কন্যার রূপ থাকে তাহার অর্থসঙ্গতি থাকে না, আবার যাহার তাহা থাকে তাহার কন্যা তাদৃশ রূপবতী হয় না। গ্রামের লোক বলিয়া থাকে, বিরাজের অদৃষ্টে বিবাহ

নাই। সম্প্রতি সূর্য্যনারায়ণ নীলকমলের গৃহে আসিয়া কন্যাদায় জানাইয়া গিয়াছেন।

নীলকমল অনুপাত কসিয়া দেখেন, দশ হাজার টাকা পাওয়াও তাঁহার পক্ষে অধিক পাওয়া হয় না। তিনি বলেন, "পাঁচ শ টাকা পণ দিয়ে যে মেয়ে কিনে বিয়ে ক'রেছে, সেও এখন একটা পচা কোঠাঘর নিয়ে, পাস্-করা দূরে থাক একটা ফেল্-করাও নয়—এমন নিরেট্ মূর্খ কালো কুচ্ছিত ছেলের বিয়ে দিতে দু'হাজার চেয়ে বসে—পেয়েও থাকে; আর আমার এই বিষয়, এমন এম্-এ-বি-এল্ পাস্-করা কার্ত্তিকের মত ছেলে!—তবে মেয়ে যদি পরীর মত হয়, আমি এক আধ শ ছাড়্তেও পারি।"

একদিন তিনি স্বয়ং, পত্নীর বিশ্বস্তা পরিচারিকা মনোমোহিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুধাংশুভূষণকে সঙ্গে করিয়া সূর্য্যনারায়ণের কন্যাকে দেখিয়া আসিলেন। মোহিনীর মত বিশ্বনিন্দক রমণী বিশ্বে বড় বেশী থাকে না; তাহাকেও বলিতে হইল, "হ্যাঁ—মেয়ে সুন্দরী বটে, রূপের খুঁত্ নেই; তবে চোখ দুটি একটু ছোট ছোট, আর নাকটি একটু বসা বসা হ'লেই যেন আরও মানান্ হ'ত ব'লে মনে হয়।"

মোহিনীর নিজের চক্ষু দুটি কুঁচের মত ছোট ছোট, আর নাসিকাটি ওষ্ঠের সমতলবর্ত্তী বলিয়া সে যে ঐ দুইটা অঙ্গের ক্ষুদ্রতা ও অনুচ্চতাকেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, নীলকমলের পত্নী তাহা জানিতেন; সুতরাং তিনি আর মুখ বাঁকাইয়া "কুচ্ছিৎ" বলিয়া আপত্তি করিলেন না। নীলকমলেরও আন্তরিক ইচ্ছা সেই মেয়েটিকেই ঘরে আনিবেন। ও আর অধিক দর-কষা-কষি না করিয়া, সর্ব্বসমেত সাত হাজার টাকা লইয়াই কন্যাদায়গ্রস্ত সূর্য্যনারায়ণকে দায়মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন। তবে এ টাকাটা সমস্তই নগদ্। গহনাদি তিনি মনের মত করিয়া নিজে

চূড়ামণি সমধিক উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ইচ্ছে বা অনিচ্ছে কিসে বুঝ্‌লে ?—তোমার মেয়ে কি সেকথা তোমাকে ব'লেছে ?"

সূর্য্য। আজ্ঞে না—কারও মেয়েই সে কথা তা'র বাপ্‌কে ব'ল্‌তে পারে না—সেটা কতকটা অনুমানে বুঝে নিতে হয়। আমার মেয়ে বরং অনেকটা ব'লেছে—তাতে আপনার প্রস্তাবিত বিবাহেই কতকটা সম্মতির আভাস দিয়েছে ; কিন্তু তার অন্তরের কথা কি, সেটা আমি অনুমানে বুঝেছি।

চূড়ামণি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "ও-হো!—তোমার অনুমান!"

সূর্য্যনারায়ণের ললাটে একটা অপ্রসন্নতার ছায়া পড়িল। তিনি ভ্রুযুগ কুঞ্চিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—আমার অনুমানই বটে, কিন্তু সেটা ভুল মনে ক'রবেন্ না! আমি যে তাকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, ঠাকুর! সে যখন এতটুকুটি, তখন তার প্রসূতি তাকে ফেলে চ'লে গেছে ; আমি প্রসূতির মত তাকে লালন পালন ক'রেছি, বালকের মত হ'য়ে তার সঙ্গে খেলা ক'রেছি, আবার গুরুমহাশয় হ'য়ে তাকে লেখা পড়া শিখিয়েছি। আমি মুখের ভাবেই তার মনের কথা প'ড়্‌তে পারি।"

চূড়ামণি প্রতিবাদ করিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না, গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। সূর্য্যনারায়ণ আরও বলিলেন, "ঘটক যেদিন প্রথম নীলকমলের পুত্রের কথা উত্থাপিত করে, কমলা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই দিনই তার আরক্ত গণ্ডে আমি পূর্ব্বরাগের আভাস পেয়েছিলাম। সাধ্যাতীত ব'লে যেদিন পরিত্যাগ করি, সেদিনও তার আনত মুখে নৈরাশ্যের ছায়া দেখেছি। সে যে আমার বড়টি হ'য়েছে, ঠাকুর! আমিও অন্ধ নই—জড় নই ; শুধু আপনার অনুরোধ আর

অর্থের অসদ্ভাব আমাকে এতদিন কর্ত্তব্য স্থির ক'রতে দেয় নি। জিজ্ঞাসা ক'রে যেদিন তা'র মনের ভাব বুঝেছি, সেই দিনই টাকার যোগাড় ক'রতে বেরিয়েছি। যেদিন টাকার যোগাড় ক'রতে পেরেছি, সেই দিনেই নীলকমলের দ্বারস্থ হ'য়েছি। কারও অনুরোধে নয়—স্বেচ্ছায়; শুধু ইচ্ছায় নয়— কর্ত্তব্য বুঝে; আমার এ কাজে আপনারা কোন কথা কইবেন না!"

চূড়ামণি ঢেউ দেখিয়াই হাইল ছাড়িবার পাত্র নহেন। অনুরোধে যাহা হইল না তাহাই কৌশলে ঘটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "যে এত টাকা দিতে প্রস্তুত, তার এমন সুন্দরী মেয়ে কেন এত বড় হ'য়ে থাকে সেটা বুঝে দেখুন" ইত্যাদি প্রকারের নানা কথায় নীলকমলের মন ভাঙ্গাইয়া বিবাহটা ভাঙ্গাইবার জন্য গোপনে গোপনে অনেক চেষ্টা করিলেন। ভবিতব্যতার বিরুদ্ধে মানুষের চেষ্টা সফল হয় না। পাত্র-পাত্রী আশীর্ব্বাদ হইয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

তৈলহীন দীপ যেমন নিভিবার পূর্ব্বে দীপবর্ত্তিকার সমস্ত তৈলটুকু নিঃশেষে টানিয়া লইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সূর্য্যনারায়ণের নিরানন্দ গৃহখানিও তেমনি একদিন বৈশাখের শেষে সর্ব্বস্ববিনিময়ে সংগৃহীত দ্রব্যভার লইয়া উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া তিনি প্রথমে যে সাত হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলি সমস্তই পাত্র-আশীর্ব্বাদের দিনে নীলকমলের লোহার সিন্দুকে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। এখন বাকী সব হয় কিসে? কাজেই তাঁহাকে আরও এক হাজার ধার করিতে হইল। তাহাতে তাঁহার বাসগৃহ পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িল। কিন্তু দেনার ভাবনা উৎসবের আনন্দকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। গৃহসংস্কার ও ঘর, উঠান প্রভৃতি পরিষ্কারের ধুম্ পড়িয়া গেল। যে সকল কক্ষ বহুদিন হইতে রুদ্ধ ছিল, তাহাদের অন্তর্বাসী মাকড়সা,

চামচিকা প্রভৃতির অবাধ বসতিতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ভাঙ্গা দালানে মাকড়সার জাল ছিঁড়িয়া চাঁদোয়া টাঙ্গান হইল। পরিত্যক্ত বৈঠক-খানায় মেজে-ঢাকা শাদা বিছানার উপরে শাদা তাকিয়ার সারি পড়িল—ঝুলের বদলে ঝাড় ঝুলিল। পরিজনশূন্য নীরব গৃহখানি প্রতিবাসিগণের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং বিরলপত্র, নির্জীবপ্রতীয়মান বন-মল্লিকা যেমন বসন্তের বাতাসে ফুলে ও মুকুলে ভরিয়া উঠে, প্রতিবেশিনী বালিকা, বৃদ্ধা, নবীনা ও প্রবীণা পুরাঙ্গনাগণের শুভাগমনে তেমনি হইয়া উঠিল। গ্রামের ছোট বড় সকলেই সে উৎসবে যোগ দান করিতে উপস্থিত হইল; আসিলেন না কেবল চূড়ামণি, আর আসিতে পারিল না হরকুমার।

উৎসবের সে রাত্রি কখন আসিয়া কোন্ পথ দিয়া চলিয়া গেল; সূর্য্যনারায়ণ তাহা যেন বুঝিতেই পারিলেন না। প্রভাতে বর-বধূ-বিদায়ের কালে যেমন মনে হইল, কমলা আর তাঁহার নাই, অমনি তাঁহার চক্ষু দুটি অশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল।

জনক-জননী ও শৈশবের গৃহ ছাড়িয়া পরের ঘরকে আপনার করিতে যাইবার প্রথম দিনটা বালিকা-জীবনের আনন্দের দিন নহে। স্বামী তখন তাহাদের নিকটে শুধু একটা লজ্জাপ্রদ সংজ্ঞা মাত্র—বিবাহও কেবল একটা লজ্জাজড়িত, আনন্দ-কৌতুকমিশ্রিত প্রহেলিকা। যাহারা অপেক্ষাকৃত একটু অধিক বয়সে স্বামিগৃহে যাত্রা করে, লজ্জায় তাহারা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহাদেরও নিরুদ্ধ বিষাদ নিবিড় গহনের নীরব, নিভৃত নির্ঝরের ন্যায় অবগুণ্ঠনের মধ্যে অলক্ষ্যে অবিরাম অশ্রুধারায় বিগলিত হইতে থাকে।

কমলা পিতার পদধূলি লইয়া, তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া নীরবে

কাঁদিতে লাগিল। তিনিও আশীর্ব্বাদ বা সান্ত্বনার একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিলেন না, কন্যার অবগুণ্ঠিত মস্তকের উপরে হাতটি রাখিয়া সাশ্রুনেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন।

সূর্য্যনারায়ণ একদিনের জন্যও কখন কন্যাকে চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই; রাত্রিতেও মধ্যে মধ্যে জাগিয়া ডাকিয়া দেখিতেন, কমলা ঘুমাইতেছে কি না, এবং অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া থাকিলে তাহার নাসিকার নিকটে হাত রাখিয়া দেখিতেন, শ্বাস বহিতেছে কি না। অবিভক্ত স্নেহের একমাত্র আধার সেই কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া তিনি বাড়ীতে আহার করিতে বা নিদ্রা যাইতে পারেন না। বাড়ীতে যেন কত লোক ছিল, সবাই চলিয়া গিয়াছে—যেন কত আলো জ্বলিত, সব নিভিয়া গিয়াছে। কমলার একটি টিয়াপাখী ছিল; সেটিও তিন চারি দিন ছোলা কাটিল না—দুধের বাটীতে মুখ দিল না। কমলা যে পথে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল সেই পথটা সূর্য্যনারায়ণের সকালে ও সন্ধ্যায় বেড়াইবার পথ হইল। তাঁহার আশা ছিল, পাকস্পর্শের দিনে গিয়া কমলাকে দেখিতে পাইবেন; কিন্তু নিমন্ত্রণের পত্র আসিল না।

অনঙ্গ কমলার সঙ্গে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—খুব ঘটা করিয়া বউ-ভাত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কমলাকে পাঠাইবার কথায় তাহার শাশুড়ী বলিয়াছেন—"এতদিন মেয়েকে কাছে রেখেও কি বাপের সাধ মেটে নি? বাপের বাড়ীতে ফেলে রাখ্‌ব ব'লে বউ ঘরে তুলেছি না কি? ঠাকুর-দেবতার কত পূজো মানসিক আছে—সব দেওয়া হ'ক, তারপর তখন সেই ওমাসে দেখা যাবে!"

সূর্য্যনারায়ণ সেই 'ওমাস' চাহিয়া দিন গণিতে লাগিলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

দীপশিখা কোথাও অন্ধকার দেখিতে পায় না—যে ঘরে যায় সেই ঘর হইতেই অন্ধকার সরিয়া যায়, যে ঘরে যতক্ষণ থাকে সেই ঘরই ততক্ষণ আলোকময় হইয়া থাকে—তাহার অভাবে ঘর যে অন্ধকার হয় তাহাও বোধ হয় বুঝিতে পারে না! দীপশিখা অচেতন।

নবোঢ়া চেতন হইলেও কতকটা যেন এই অচেতন দীপশিখার মত! তাহারাও পিতৃগৃহ হইতে গিয়া স্বামিগৃহ আলো করিয়া থাকে। তাহাদের অভাবে তাহাদের পিতা মাতার গৃহে ও মনে যে অন্ধকারের আবির্ভাব হয় সেটা কি তাহারা বুঝিতে পারে?

সূর্য্যনারায়ণের গৃহ অন্ধকার হউক, কমলা আসিয়া নীলকমলের গৃহ আলো করিয়াছে। তাহার আগমনে সকলেই আনন্দিত—দাস, দাসী ও প্রতিবাসী সকলেই যেন কত সুখী! নীলকমল বিষয়-কর্ম্ম দেখিবার ভার কর্ম্মচারীদের উপরে দিয়া নিজে অধিকাংশ সময় অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার পর উপরের দালানেই তাঁহার বৈঠক হয়। আলবোলার নলটি মুখে দিয়া, পুত্রবধূকে নিকটে বসাইয়া তিনি গল্প করিতে বসেন। কমলা প্রথমে প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া ঘোম্‌টা টানিত—কথা কহিতে চাহিত না; তিনি সে সব কিছুই করিতে দেন না।

নববধূর আদরযত্নে কাহারও কোন প্রকার ত্রুটি নাই। কিন্তু অচির-পিঞ্জরাবদ্ধ বনবিহঙ্গ যেমন স্বর্ণপিঞ্জরে বসিয়াও জন্মবিটপীর চিরপরিচিত তৃণনীড়ের কথা মনে করিয়া উড়ু উড়ু করে, কমলার মনটাও তেমনি এই সকল আদরযত্নের মধ্যেও জনকের সেই জীর্ণ গৃহখানির কথা ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। এমাস নয় ওমাস করিয়া শেষে ছয় মাসের পর কমলা একবার পিতৃগৃহে যাইতে পাইল; কিন্তু ছয় মাসের পর গিয়া ছয় দিনও থাকিতে পাইল না। পঞ্চম দিবসেই নীলকমল তাহাকে

আনিবার জন্য পাল্কী, বেহারা ও মেয়ে-লোক সঙ্গে দিয়া সুধাংশুকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর আর পাঠাইবার নাম পর্য্যন্ত করিলেন না।

৪

রাত্রি নয়টা কি দশটার সময়ে একবার মেঘ উঠিয়া জ্যোৎস্নাটাকে একেবারে ঢাকিয়া দিয়াছিল, এক পশলা বৃষ্টির পর আবার নীল আকাশে চাঁদ দেখা দিয়াছে। জ্যোৎস্নাটা যেন বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শুভ্রতর হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি গভীর। পল্লীর জাগরণ-শব্দ সুপ্তির নীরবতায় ডুবিয়া গিয়াছে। নীলকমলের নিদ্রানিস্তব্ধ গৃহের একটি উপরকক্ষে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। দীপ্ত প্রকোষ্ঠের শুভ্র ভিত্তিতে মধ্যে মধ্যে একটা চঞ্চল ছায়া পড়িয়া, কক্ষমধ্যে কাহারও নীরব-জাগরণ সূচিত করিতেছিল।

সেই কক্ষতলে একটি শুভ্র শয্যাতে বসিয়া বিরাজ একখানা বই পড়িতেছিল। কমলা তাহার পাশে শুইয়া ধীরে ধীরে পাখা নাড়িতেছিল। পাখার বাতাসটুকু কিন্তু সমস্তই বিরাজের গায়ে লাগিতেছিল। তাহাকে ও বাতাস করিতে হইবে অথচ সে তাহা করিতে দিবে না এরূপ অবস্থায় লোকে যে ভাবে বাতাস খাইবার ছলে বাতাস করিয়া থাকে, কমলার এ পাখা-নাড়াটাও যেন সেই ভাবের।

অল্পক্ষণ পরেই পাখাখানি কমলার অবশ হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। বিরাজ ফিরিয়া দেখিল—কমলা ঘুমাইয়াছে। বাতায়ন-পথ দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া কক্ষতলে পড়িয়াছিল। কমলার দেহপূর্ব্বার্দ্ধ তাহাতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। বিরাজ ধীরে ধীরে বইখানি বন্ধ করিয়া, কমলার শুভ্র রূপরাশির দিকে চাহিয়া এরূপভাবে বসিয়া

রহিল, যেন সে তাহাকে আর কখনও দেখে নাই। সেই ইন্দুকলার মত শুভ্র ও মসৃণ, ক্ষুদ্র কপাল, তাহার নিম্নভাগে তুলিকাচিত্রিত ধনুরেখার মত কৃষ্ণ ভ্রূযুগ, চিত্রিত পদ্মে চিত্রিত ভ্রমরের মত দীর্ঘ ও কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত নিদ্রানিমীলিত দুইটি স্থির চক্ষু, ফুটন্ত গোলাপের দুইখানি পাপড়ির মত নিদ্রালস্যে ঈষৎ বিযুক্ত ওষ্ঠাধর, তাহার মধ্যে পদ্মপলাশগর্ভে ক্ষুদ্র মুক্তার মত সম্মুখের কয়েকটি শুভ্র ও ক্ষুদ্র দশনের অগ্রভাগ, সেই সুপ্তিশিথিলিত বিপুল কৃষ্ণকবরী ও নিদ্রাবেশে অলসবিন্যস্ত সেই কুসুমপেলব দেহখানি বিরাজ কতবার দেখিয়াছে, তথাপি সমস্তই যেন তাহার চক্ষে নূতন প্রতিভাত হইতেছিল। বিধাতা তাহার জন্যই যে এত রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় সৌভাগ্য-গর্ব্বে ভরিয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে কমলা জাগিয়া পাখাখানা তুলিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "এখনও ব'সে আছ ?"

বিরাজ। কেন—ব'ল্‌তে পার ?

কমলা। আরও খানিকক্ষণ কিছু প'ড়বে কি না তাই ভাবছ বুঝি ?

বিরাজ। না—কমলা!—চুরি ক'রে তোমাকে দেখ্‌তেছিলুম।

কমলা সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "তোমাদের আইনের বইএ এমন চুরির কিছু শাজা নেই কি ?"

বিরাজ। তা জানি না ; তুমি যদি কিছু শাজা দেওয়া উচিত মনে কর—নিতে প্রস্তুত আছি।

কমলা। তবে কাল থেকে আর এ ঘরে বই এনো না!

বিরাজ। কেন—বই তোমার কি ক'রেছে, কমলা ?

কমলা। তুমি যখন কল্‌কেতায় গিয়ে—কি সদরে ব'সে বই পড়, আমি কি তোমাকে আগুল্‌তে যাই ?

বিরাজ। ও! বই কেন তবে তোমার অধিকারে আমাকে আগুলে রাখ্‌বে! কিন্তু যাও না কি? যাও না যদি তবে সব কাজেই আমার এত ভুল হয় কেন?—আমি যেথাই থাকি আর যাই করি, তুমি সর্ব্বদাই আমার মনটি আগুলে রাখ, কমলা! দিক্-নিরূপণ-যন্ত্রের যেমন উদীচী—আমার মনের তেমনি তুমি।

কমলা। এত রাত জেগে কি প'ড়ছিলে?

বিরাজ। একটি ভালবাসার গল্প—তুমি বিয়ের আগে কারুকে ভালবাস নি?

"জানি না"—বলিয়া, কমলা পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিরাজ। তবে আমিও রাগ করি?

কমলা তখনই আবার পাশ ফিরিয়া, একমুখ হাসিয়া বলিল, "কেন, আমি কি রাগ ক'রেছি?"

সে শুভ্র হাসির তুলনায় জ্যোৎস্নাটাও যেন বিরাজের চক্ষে ম্লান বোধ হইল। কমলার হাত হইতে পাখাখানি কাড়িয়া লইয়া বাতাস করিতে করিতে বিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, "তবে বল!"

কমলার মুখখানি একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কি আর ব'ল্‌ব?—প্রথম যেদিন ঘটকের মুখে তোমার কথা শুনি, সেই দিন থেকে জেনেছি ভালবাসা কি, তার আগে কিছুই জানতুম্ না।"

বিরাজ। কৈ—ভালবাসার কথা ত কখন তোমার মুখে একটিও শুন্‌তে পাই না?

কমলা। ভালবাসার আবার কথা কি রকম তা ত জানি না!—তুমিও ত কখন তা বল না?

বিরাজ। ব'ল্‌ব কি—তুমি ত আমার সঙ্গে কখন বেশী কথাই ক'ও না—আমি না কওয়ালে একটিও না!

কমলা। সত্যি, তোমার কাছে এলেই যেন আমি সব কথা ভুলে যাই! যখন কাছে থাক না তখন কত কথাই ব'লব ব'লে মনে করে রাখি, তুমি কাছে এলে আর সে সব একটিও মনে আসে না! যখন দূরে থাক, আমার মন তখন তোমার কাছেই প'ড়ে থাকে; কিন্তু যখন কাছে থাক, তখন যে আমার মন কোথায় কত দূরে চ'লে যায় তার ঠিকানা পাই না! তোমাকে দেখে আমার কথা কইতেই ইচ্ছে হয় না—যেন কেমন হ'য়ে যাই! কেন এমন হয় ব'ল্‌তে পার?

বিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, "নদীতে যখন প্রথম জোয়ার আসে, তখনই জলের উচ্ছ্বাস—কল্লোল—চঞ্চলতা; ভরা জোয়ারে নদীর ভাব স্থির, প্রশান্ত ও পূর্ণ! ভালবাসারও প্রথম অবস্থাতেই হৃদয়ের চঞ্চলতা—কথার উচ্ছ্বাস; তার পর আর সে সব কিছুই থাকে না। তখন মুখ মৌন; দৃষ্টি অলস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবেশমগ্ন—স্থির, হৃদয় প্রশান্ত! সে যেন শুধু মনের একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ—মৌন তৃপ্তি! তখন আকাঙ্ক্ষা সব দূরে স'রে যায়—প্রবৃত্তিও সব ঘুমিয়ে পড়ে! সে আনন্দটুকু বোঝ্‌বার জন্যেই যেন জেগে থাকে শুধু হৃদয়, কিন্তু সে জাগাটাও যেন ঘুমন্তে জাগা! তুমিও হয় ত ভালবাসার সেই অবস্থাটায় এসে প'ড়েছ!"

কমলা। যাও—ঠাট্টা! তবে আর কিছু ব'ল্‌ব না।

বিরাজ। তবে আমিও ব'ল্‌ব না—তোমাকে ভালবাসি কি না।

কমলা। নাই বল—আমি তা জানি।

বিরাজ। আর কারুকে বাসি কি না তা ত জান না?

কমলা। তা জান্‌বার আমার দরকার নেই; তুমি পৃথিবীর সব লোককে ভালবাস—আমি জান্‌তে চাই না, তারা কত জন।

বিরাজ হাসিয়া বলিল, “কেন তা’তে তোমার কিচ্ছু ক্ষেতি নেই?”

কমলা। কি ক্ষেতি?—আমি যদি প্রাণ মন সব দিয়ে তোমাকে ভালবাসতে পারি, তুমি কি আমাকে একটুও না দিয়ে থাক্‌তে পার?—আমি সব চাই না—বেশীও চাই না।

একগুচ্ছ কুঞ্চিত কেশ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কমলার কপালের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। বিরাজ সযত্নে সেইগুলিকে সরাইয়া দিয়া বলিল, “না—কমলা! আমার সমস্ত মনটিকেই তুমি কেড়ে নিয়েছ—দেবারও অপেক্ষা রাখ নি।”

হৃদয় যখন ভাবাতিশয্যে মগ্ন থাকে বাক্‌প্রবৃত্তির তখন যেন চেতনাই থাকে না। বহুক্ষণ আর কেহই কোন কথা কহিল না।

বিরাজ আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, সহসা কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার দীর্ঘনয়নপ্রান্তে দুইবিন্দু অশ্রুও দেখা দিয়াছে! বিস্মিত হইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি?—তুমি কাঁদ্‌ছ, কমলা?”

কমলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, অশ্রু মুছিয়া বলিল—“না”।

বিরাজ। না—কি? আমি তোমার চোখে জল দেখ্‌তে পেয়েছি এই যে হাস্‌ছিলে, এখনি আবার এমন কি কথা মনে হ’ল—আমাকে ব’লবে না?

“তোমাকে যদি না ব’ল্‌ব তবে ব’লব কাকে—কাঁদি নি। একটা কথা মাঝে মাঝে আমার মনে হয়।”—কমলা মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিল; সেই সময়ে একখানা

কালো মেঘ চাঁদের উপরে আসিয়া পড়িয়া জ্যোৎস্নাটাকে নিভাইয়া ফেলিতেছিল। সে আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল— "ঐ দেখ! ঠিক যেন ঐ রকমের একটা কালো মেঘ মাঝে মাঝে আমার মনে এসে আমার সব আনন্দকে নিভিয়ে দেয়! যখনই আমি 'আপনাকে বড় সুখী—বড় ভাগ্যবতী মনে করি, তখনই যেন কে আড়ালে থেকে আমার কাণের কাছে বলে—তোর এ সুখ—এ সৌভাগ্য বেশী দিনের জন্যে নয়!"—কমলা আবার একবার দুই করে চক্ষুদুটিকে মুছিয়া লইয়া বলিল—"সত্যিই কি আমার কপাল এত ভাল হ'য়েও এতই মন্দ হবে যে, পেয়েও আমি তোমার ভালবাসা হারাব? তোমার ভালবাসাই আমার সুখ—আমার সর্ব্বস্ব; আজ আমার মত সুখ কা'র—আমার মত ভাগ্যবতী কে? কিন্তু কাল যদি আমি তোমার ভালবাসা হারাই, আমার কি থাক্‌বে—আমার মত দুঃখিনী জগতে আর কে থাক্‌বে?"

কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল। পদ্মপলাশপ্রান্তে শিশির-বিন্দুর মত দুই বিন্দু অশ্রু আবার তাহার নয়ন-প্রান্তে জাগিয়াছিল। বিরাজ ধীরে ধীরে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, "আলোর মধ্যেও ছায়ার কল্পনা ক'রে দুঃখ ডেকে আন কেন, কমলা? আমাকে হারাতে পার, কিন্তু আমার ভালবাসা হারাবে এ আশঙ্কাকে মনে আস্‌তে দিও না! অন্য দুঃখ?—আস্‌তে পারে, চঞ্চল মানব-ভাগ্যে কখন কি ঘ'টবে—কে জানে? প্রকৃতির দিনরাত্রির মত সুখদুঃখ মানুষের ভাগ্যে নিয়ত ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু যে আলো সংগ্রহ ক'রেছে অন্ধকারে তার ভয় কি? জীবনের অন্ধকারে সে আলোর নাম—ভালবাসা। দুঃখ আসুক— দরিদ্রতা আসুক, দুর্দ্দিনের অন্ধকারে বিপদের মেঘ মাথার উপরে

গভীর গর্জ্জন করুক, তোমার আমার তা'তে ভয় কি? পরস্পরের ভালবাসা নিয়ে কি আমরা সে সবই সইতে পারব না?"

কমলা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে দেখিয়া বিরাজ আর তাহাকে ডাকিল না, তাহার স্বেদসিক্ত ললাটে মৃদু মৃদু ব্যজন করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিল।

অদৃষ্টাকাশে যখন কোন বিপদের মেঘ গাঢ় হইয়া উঠে, মানুষের অন্তরে যেন তাহার একটা ছায়া পড়িয়া থাকে। সে ছায়া যে একটা আসন্ন দুর্ঘটনার পূর্ব্ব-সূচনা মানুষ সুখের মধ্যেও তাহা বেশ বুঝিতে পারে। কমলার অদূরভবিষ্যতে কি দুঃখের মেঘ উঠিয়া তাহার বর্ত্তমান সুখের উপরে এই ছায়াপাত করিতেছিল, বিরাজ অনেকক্ষণ ভাবিয়াও তাহা অনুমান করিতে পারিল না; শেষে আপনিও সেই জ্যোৎস্নাবিভাসিত গগনে মেঘচ্ছায়া দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইল।

সুধাংশু নীলকমলের সহোদর-পুত্র। শৈশবে পিতা মাতা হারাইয়া সে পিতৃব্যের আশ্রয়েই লালিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই লেখা পড়ায় তাহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না, সঙ্গীত ও ব্যায়াম লইয়াই দিন কাটাইত; ফলে সে একটিও পাস্ করিতে পারে নাই, কিন্তু বেহালা ও সেতার প্রভৃতি খুব ভাল বাজাইতে পারিত, আর বলে গ্রামের কোন যুবাই তাহার সমকক্ষ ছিল না। বয়সে সে বিরাজের অপেক্ষা দুই এক বছরের ছোট, কিন্তু আকৃতি দেখিয়া তাহাকেই বড় বলিয়া মনে হয়। নীলকমল তাহাকে বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়-কর্ম্ম দেখিতে বলেন, সেটা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। একটা কিছু

না করিলে বিরাজের নিকটে কলিকাতায় থাকা হয় না, তাহাতেই দরকার না থাকিলেও সে এমন একটা চাকরী স্বীকার করিয়াছিল যাহাতে উপার্জ্জন যেমনই হউক অবকাশ ইচ্ছামত। পর্ব্বাদি উপলক্ষে আদালত বন্ধ হইলেই তাহাকেও একটা কিছুর ছুতা করিয়া ছুটী লইতে হয়। বাল্যকাল হইতে নিয়ত একত্র থাকায় উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অপেক্ষা মিত্রভাবটাই যেন কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল।

দুইজনে বাড়ী আসিয়া একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গার তীরে গি: বসিয়া ছিল। কথায় কথায় সুধাংশুর বিবাহের কথা উঠিল।

বিরাজ বলিল, "মায়ের কথা ত শুনিস্ নি, বাবার কথাও অগ্রাহ্য ক'রেছিস, আবার আমাকেও কথা ক'ইতে মানা ক'রছিস্! আচ্ছা— তোর আপত্তিটা কি?"

সুধাংশু মুখটা অন্যদিকে ফিরাইয়া বলিল, "আপত্তি আবার কি— আমার ইচ্ছে নেই।"

বি। তুই বুঝছিস না; বিয়ে করাটা যদি সখের হ'ত—স্ত্রী শুধু একটা অনাবশ্যক আস্‌বাব মাত্র হ'ত, তা হ'লে আমি তোকে অনুরোধ ক'রতুম না—এটা দরকার।

সু। সে যার ভাত রেঁধে দেবার লোক নেই, বিষয় আছে—ভোগ করবার কেউ নেই—প্রাণ ধ'রে দশের কাজে কি দেশের কাজে দিতে পারে না, শেষ বয়েসে সেবার ত্রুটি হ'বার ভাবনা আছে, কি বিখ্যাত বংশটা শেষ হ'য়ে যাবার আশঙ্কা আছে, তার দরকার।

বি। তুই পাগল! এই সবের জন্যেই বুঝি লোকে বিয়ে করে?

সু। আমার ত তাই মনে হয়।

বি। না—সুধা! গৃহধর্ম্ম পালনের জন্যেই হিন্দুর বিবাহ; সংসারে

থাক্‌তে হ'লে যেগুলি গৃহীর দরকার, সে সবই পুরুষের নেই—সবগুলি স্ত্রীলোকেরও থাকে না। বিবাহ সেই সবগুলিকে একত্র করে। আর বিবাহ না ক'রলে জীবন সম্পূর্ণও হয় না।

সু। এই ত সেদিনও ব'লেছ—"বিয়ে করা মানুষের একটা মস্ত ভুল, বিবাহ শুধু দরিদ্রতা বাড়ায়, অনেক অনাসন্ন অভাব ও দুঃখ টেনে আনে, মানুষকে স্বার্থপর করে, তার মনকে সঙ্কীর্ণ ক'রে দেয়; যে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখেছে সে আর পরের কথা ভাব্‌তে পারে না, কোন বড় কাজে প্রাণ ঢেলে দিতে পারে না"—এখন আবার সে মত ফিরে গেল কেন?

বি। জীবনের এদিক্‌টা ত তখন এমন ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাই নি!

সুধাংশু মৃদু হাসিয়া বলিল, "এখনই বা এদিকের কতখানি কি দেখ্‌তে পেলে? এদিকের সবে ত তোমার এই প্রভাত, দাদা! আগে মধ্যাহ্নের উত্তাপ—অপরাহ্নের অবসাদ ভোগ কর, সন্ধ্যের মেঘ-ঝড়—রাত্রির অন্ধকার দেখ, তার পর ব'লো!"

বি। সব দেখ্‌বার দরকার নেই, সুধা! সমস্ত আকাশই যে নীল তা বুঝ্‌তে পৃথিবীটা সব ঘুরে দেখ্‌বার দরকার হয় না। যেটুকু দেখেছি তাতেই ব'ল্‌ছি—মানুষের জীবনে বিবাহের মত এমন একটা ব্যাপার আর কিছু নেই। সংসারে অনেক রকমের অনেক দুঃখ—অনেক অভাব ও অশান্তি; কিন্তু আত্মহারা হ'য়ে যে কারুকে ভালবাস্‌তে পেরেছ—আপনার প্রাণকে আর একজনের প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছে, কোন দুঃখই আর তা'র দুঃখ ব'লে বোধ হয় না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে তাতে বঞ্চিত, তার জীবন যতই উন্নত বা মহৎ হ'ক, অসম্পূর্ণ—সে অন্যদিকে আর যতই সুখী হ'ক, তার মত দুঃখী জগতে নেই।

সুধাংশু হাসিয়া বলিল, "পথ্যের ব্যাবস্থাটা যাতে বেশ মুখরোচক, সে ব্যারামটাও বোধ হয় আরামের ব'লে মনে হয়!"—তারপর একটু থামিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "না—দাদা! তোমার শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি, আমি আপনাকে একটুও অসুখী মনে করি না। অপূর্ণতাও জীবনে কিছু বুঝ্‌তে পারি না; আমি এ বেশ আছি।"

বি। এমন 'বেশ' কি বেশী দিন থাক্‌তে পারবি মনে করিস্‌?

সু। পারব না কি জন্যে?

বি। ফুলের জীবনে যেমন একটা সময় আসে যখন তার হৃদয় আপনা হ'তেই মধু ও গন্ধের আধার হ'য়ে ওঠে, মানুষের জীবনেও ঠিক তেমনি একটা সময় আসে, যখন স্ত্রী কি পুরুষ কেউই আপনাতে আপনাকে সম্পূর্ণ মনে ক'রতে পারে না। তখন সবারই মনে হয়, জীবনটা যেন আধখানা—তার আর আধখানা আর কোথাও প'ড়ে আছে। সেই আধখানার জন্যে এমনি একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় যে, যতক্ষণ মিলন না ঘটে ততক্ষণ কিছুতেই মন শান্ত হয় না। মিলনের জন্যে অন্তরের সেই যে ব্যাকুলতা, তারই নাম প্রণয়; আর মিলিত হওয়ার নাম বিবাহ। প্রণয় অন্তরের ধর্ম্ম, বিবাহটা বাহ্যিক আচার—সামাজিক প্রথা। অন্তরের ধর্ম্মকে আচারপূত করা—শাস্ত্র অথবা সমাজসম্মত পথে প্রবর্ত্তিত করাই বিবাহ।

সু। তা হবে! আমাদের কিন্তু বিবাহটাই আগে, যদি ঘটে ত প্রণয়টা তার পরে—নয় কি? আচ্ছা—মধুর সঞ্চার হ'লে তার পরেই ত মৌমাছির সঙ্গে ফুলের বিয়ে হয়, দাদা! আমাদের সমাজে তবে এত তাড়াতাড়ি কেন? ফুল ফোটা দূরে থাক্‌—মুকুলের পাশে মৌমাছির ডিম ছেড়ে রাখার ব্যাবস্থাটা কেন ব'ল্‌তে পার?

বি। আমাদের প্রণয় আর বিবাহের ক্রমটা বিপরীত

হ'লেও ফলে সমানই, সুধা! বিয়ে কর্—বুঝ্‌তে পারবি, সংসার কত সুন্দর! প্রণয়ের মত এমন মধুর ও পবিত্র ভাব হৃদয়ের আর কিছুই নেই; প্রণয়ের স্পর্শে সংসারের অনেক নীরস, কঠোর কর্ত্তব্যও মধুর ও মনোহর হ'য়ে ওঠে—অনেক দুর্ব্বহ দুঃখ সুবহ হ'য়ে যায়। অবিবাহিত জীবন সত্যই অপূর্ণ, সুধা! বিবাহিত জীবনের উপরে আবার যদি সৌভাগ্য-ক্রমে ঈশ্বর-প্রেমের প্রবাহ এসে পড়ে, তখন তার ভাব যে কত মহান্—কত সুন্দর হ'য়ে ওঠে তা বলা যায় না! শ্রাবণের ভরা নদীতে বান এলে যেমন আর নদীর কূল-কিনারা দেখা যায় না—বিপুল জলস্রোত নদীগর্ভের অমেয় হ'য়ে উঠে, সীমা-বাঁধ ছাপিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ে, ঈশ্বরপ্রেমের আবির্ভাবও মানুষের দাম্পত্য-প্রণয়পূর্ণ জীবনে তেমনি একটা পূর্ণতা এনে দেয়! তখন উভয়ের প্রেম নিজ নিজ আধারকে অভিভূত ক'রে, চারিদিকে বিসর্পিত হ'য়ে পড়ে এবং সংসার-সীমা অতিক্রম ক'রে, পার-লৌকিক রহস্যের বাঁধ ছাপিয়ে, অন্তহীন—নির্ব্বিকার প্রেমের অসীম—অগাধ—প্রশান্ত মহাসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করে!

সু। সেটা কি আর বিয়ে না ক'রলে হ'তে পারে না? বিয়ে ত প্রায় সবাই করে, ক'জনের জীবনে ঈশ্বরপ্রেমের বান ডাকে, দাদা? সবারই ত জীবনের ক্ষীণ ধারা, ঘোলা জলের প্রবাহ নিয়ে সংসারের সঙ্কীর্ণ পথেই প'ড়ে থাকে! আচ্ছা, দু'টো ভাঙ্গা জিনিসে জোড় মিলিয়ে, একটা ছোট আধখানার সঙ্গে আর একটা ছোট আধখানাকে মিশিয়ে, একটা ছোট—সান্ত—সীমাবদ্ধ খণ্ড-পূর্ণতা পাবার চেষ্টা না ক'রে, হৃদয়ের প্রণয়-প্রবৃত্তিকে একবারেই ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্তহীন—অসীম—অখণ্ড পূর্ণতা পা'বার জন্যে চেষ্টা করাই কি ভাল নয়, দাদা?"

বিরাজ উত্তর করিতে যাইতেছিল; সেই সময়ে হীরালালকে সঙ্গে লইয়া,

নলিনীরঞ্জন ও যামিনীকান্ত আসিয়া কথাবার্ত্তার স্রোত অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল।

হীরালাল বিরাজের জ্ঞাতিভ্রাতা, নলিনী উভয়েরই সহপাঠী, আর যামিনী জনৈক সম্পন্ন প্রতিবেশীর জামাতা। নলিনী ও যামিনী উভয়েরই আর্থিক অবস্থা ভাল, হীরালালের তাদৃশ নহে; কিন্তু তাহার পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তাহা বোধ হয় না—সে সব খুব সৌখীন এবং আধুনিক বাবুয়ানার উপযোগী। চুল কাটার ধরণে আধুনিকের মাত্রাটা খুবই ছাপাছাপি—ঘাড়ের দিকে ও দুই পাশে মোটেই নাই, শুধু মধ্যস্থলে বালি-চড়ার লতান দূর্ব্বাঘাসের মত খুব লম্বা লম্বা একপটী চুল। দাড়ি ছাঁটার ধরণটায় কিন্তু এমন একটা উদার সাম্যভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যাহাতে হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষেরই কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। জুল্‌পির নিম্নদেশ হইতে চিবুকের উপর পর্য্যন্ত হিন্দুর মত বেশ পরিষ্কার কামান; কেবল চিবুকের নিম্নদেশে পটুয়ার তুলির মত একটু খোদা-নুর বা এক গুছি চুল। যামিনীও একটি আধুনিক 'ফ্যাসান্'এর বিগ্রহ। তাহারও মাথায় খুব লম্বা টেড়ি, চোখে নীল চশমা, হাতে সরু একগাছি ছড়ি, কব্‌জীতে বগ্‌লসে বাঁধা ঘড়ি, গিলা দিয়া কোঁচ্‌কান মিহি পাঞ্জাবী-জামার বুক্‌-পকেটে—একটু বা'র ক'রে রাখা—'এসেন্স্' মাথান পাটকরা রুমাল, আর পৌষের শীতেও বিলাতী মহিলাগণের ঘন ঘন হাত-পাখা নাড়ার মত, দরকার না থাকিলেও তাহা টানিয়া লইয়া—চুলে না ঠেকে এমন ভাবে—অতি সন্তর্পণে ঘন ঘন মুখ মুছা। নলিনীর পরিচ্ছদাদিতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নাই; তবে দেখিলেই বোধ হয় যেন সে সেকাল ও একালের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে।

হীরালালের ইচ্ছা ছিল না সেখানে বসে; কিন্তু নলিনী ও যামিনীকে

তাহা করিতে দেখিয়া সেও অগত্যা একটু দূরে মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া বসিল। সকলে নানা রকমের কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল, হীরালাল একটি কথাও কহিল না।

বিরাজ কিছুক্ষণ পরে বলিল, "হীরুদা, না হয় কথাই কইবে না—আমাদের মুখ অবধি দেখ্‌বে না—না কি?

হীরালাল তাহাতেও কথা কহিল না, শুধু ঠোঁট চাপিয়া একটু হাসিল। সে হাসিটা যেন ঘনাচ্ছন্ন দূরদিগন্তের অস্পষ্ট বিদ্যুৎ-রেখার মত চকিতে একবার উৎপত্তি-স্থলের অন্ধকারভাবটা দেখাইয়া দিয়াই নিভিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বিরাজ নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, হীরুদার কি হ'য়েছে জান?"

নলিনী। ঝগড়া ক'রে এসেছে বোধ হয়!

যামিনী। হীরুবাবুর wife কি বড় quarrel-some?—লোকটাকে বেশ happy ব'লে বোধ হয় না!

বিরাজ। বড় বউঠাক্‌রুণের মত গুণ বড় একটা কারও দেখা যায় না। তাঁর মুখখানি ত কখনও হাসি-ছাড়া দেখি নি; আর মনটি যেন ঠিক কলাগাছের মাঝের মত সরল, অন্তর স্ফটিকের মত নির্ম্মল—আকাশের মত উদার, চরিত্রও গঙ্গাজলের মত পবিত্র।

যামিনী। দেখ্‌তে?

নলিনী। খুব খাসা—তবে রংটাকেই যদি রূপের সর্ব্বস্ব মনে কর, তা হ'লে কিন্তু সে মোটেই সুন্দরী নয়।

যামিনী। কেন, সেটা কি বড় ঘুটঘুটে—Ethiopean type এর না কি?

নলিনী। তা নয়; তবে খুব ফুট্‌ফুটেও নয়—শ্যাম বর্ণ। সে শ্যামের

ভিতর থেকে কিন্তু গৌরের একটা আভা ফুটে বেরুচ্ছে ব'লে বোধ হয়। মুখ, চোখ, নাক, খুব তর্ তরে। গড়নটিও বেশ মেয়েলি মেয়েলি—যেন কাঁচা কাদার গড়নের মত থস্ থসে। ডগার কাছে ঈষৎ একটু কোঁক্ড়ান, মেঘের মত কালো, একমাথা চুল—এলিয়ে দিলে সেগুলি পায়ের কাছে ঝুলে পড়ে। টানা টানা, ভাসা ভাসা, থাসা দুটি চোখ—তা'তে ভোমরার মত কালো কালো দুটি তারা। পাতলা পাতলা, রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট দু'খানি যেন হাসির জমাটে গড়া, আর ছোট ছোট, ঘেঁষ্ ঘেঁষ্ দাঁতগুলি একটু হাস্‌লেই ডালিমদানার মত বেরিয়ে পড়ে। সে মুখের সে হাসি যে একবার দেখেছে সে আর জীবনে কখন ভুল্‌তে পারবে না!—তুমি একদিন দেখ্‌তে চাও?

যামিনী গোঁফ্‌টা পাকাইতে পাকাইতে বলিল—"নাঃ!"

নলিনী। কেন, বন্ধুর স্ত্রীকে দেখ্‌বে তা'তে আর এমন বিশেষ দোষ কি? বেশ পবিত্রভাবে দেখ্‌বে—কবিরা যেভাবে পদ্মশোভা দেখেন—কি ছেলেরা যেভাবে চাঁদ দেখে?

হীরালাল উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, "বাজে কথা নিয়ে তোমরা বড়ই বাড়া বাড়ি ক'রে তুল্‌লে—আমি উঠি।"

নলিনী তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, "না—বাজে কথা আর মোটেই না!—হীরে কি কথায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠে ব'ল্‌ব?"

বিরাজ। কি—রাজনীতি?

যামিনী। উঁহুঁ—হীরুবাবুর favourite topics হচ্ছে—phi—lo—so—phy!

বিরাজ। হীরুদা তা হ'লে আজ কাল গভীর তত্ত্বের আলোচনা ক'রছ! তাই বুঝি আর আমাদের মত চপলের দলে মিশ্‌তে চাও না?

যামিনী। আপনি কি জান্‌তেন্‌ না—হীরুবাবু Epicurusএর একজন খুব faithful follower—atheismএর একজন staunch advocate ?—সম্প্রতি libertineএর দলেও নাম লিখিয়েছেন।

বিরাজ। ছিঃ— হীরুদা ! লেখা পড়া শিখে কি শেষে এই হ'ল ?

সুধাংশু। লেখা পড়া না শিখ্‌লে কি কেউ তুচ্ছ লোকের কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, না তর্কের বলে পরকালকে পরলোক পাঠাতে পারে ?

হীরালাল তীব্রস্বরে বলিল, "নাস্তিক—লম্পট—যথেচ্ছাচারী—মাতাল আর যাই হই, কারও ত কিছু কেড়ে নিই নি ? আমার কথায় তোমাদের দরকার কি ? আমার যা ইচ্ছে তাই ক'রব।

বিরাজ। না—হীরুদা ! ইচ্ছে ব'লে তুমি যা তা ক'রতে পার কি ? ধর্ম্ম ও সমাজকে মেনে চ'ল্‌তেই হবে।

যামিনী। Really হীরু বাবু, মনে মনে আপনি Epicurus কেন—স্বয়ং Luciferএর শিষ্য হ'ন না, (কেবল ভাঙ্গা মন্দির দেখ্‌লেও একবার হাতটা কপালের দিকে তুল্‌বেন, আর সবাই যা করে না এমন যদি কিছু করেন তবে সেটা একটু লুকিয়ে ক'রবেন ! তা হ'লেই আপনি একজন orthodox, rigid হিন্দু—আপনার সাত খুন মাফ্‌।)

হীরালাল। তাই বটে ; কথায় ত দেখি—অনেকেই আস্তিকের চূড়ামণি, মুখে হিঁদুয়ানির খুব বড়াই, নুড়ী দেখ্‌লেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, সর্ব্বাঙ্গে হরি-নামের ছাপ, কাঁধে নামাবলি, হাতে জপের ঝুলী, গলায় তুলসীকাঠের মালা, মাথায় এক হাত টিকি, কিন্তু মনে মনে, বাবা, সবাই হীরালাল। ইচ্ছেটা পূরো মাত্রায় আছে, কেবল জোটে না তাই নিবৃত্তির

গোঁড়ামি ক'রে বেড়ান। মাছের হাঁড়ী ভাঙ্গবার সুবিধে না পেলে অনেক কুণো বেরালেও হবিষ্যি করে।

বিরাজ। সবাই তা ব'লে তোমার মত মনে ক'রো না, হীরুদা!

হীরালাল। ঠগ্ বাছ্‌তে গাঁ উজড়—বাদ্ ত বড় কারুকে দেখি না, দাদা! পাপ-পুণ্য বা পরকাল ব'লে কিছু আছে—ভগবান্ ব'লে কেউ আছে, এ বিশ্বাস যদি মানুষের থাক্‌ত, তা হ'লে কি সংসারে এত পাপ—এত অত্যাচার—এত অবিচার থাক্‌তে পায়? না—যার বল আছে সে দুর্ব্বলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ভোগ ক'র্‌তে পারে? আমার কথা ছেড়েই দাও—আমি ত নাস্তিক! আমি বেদ মানি না, ঈশ্বর মানি না, পরকাল—ধর্ম্মাধর্ম্ম—পাপ-পুণ্য—কিছুই মানি না, স্বর্গ—অপবর্গ—আত্মা—এ সব অনুমানের কথায় একটুও বিশ্বাস করি না, প্রত্যক্ষ যা দেখ্‌তে পাই তা ছাড়া আর কিছুই মানি না; কিন্তু পরের কিছু কেড়ে নিতেও ছুটি না।

নলিনী। আচ্ছা—প্রত্যক্ষটা কি দেখ্‌তে পাস্, হীরু?

হীরালাল। ভোগের জিনিস আর ভোগ করবার শক্তি। দুনিয়াটা কেবল একটা মস্ত ভাগাড়। ভোগের জিনিসগুলো সব মরা জন্তু, মানুষগুলো প্রবৃত্তি আর শক্তি অনুসারে শিয়াল—কুকুর—শকুনি ইত্যাদি। কাজের মধ্যে, পরস্পরে খাওয়াখায়ি—যে যতখানি পেটে পূরতে পারে—যে যার মুখ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। এই নিয়েই দিন রাত কাড়া-কাড়ি—টানাটানি মারামারি—ছড়োছড়ি চ'ল্‌ছে। দু'জনের কাড়া-কাড়িতে যা প'ড়ে যাচ্ছে, আর একজন তাই কুড়িয়ে নিয়ে পালাচ্ছে; আবার আর একজন তার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেবার সুযোগ দেখ্‌ছে। এই ত সংসার!—এই ত সমাজ! সংসারের সারনীতি আর সমাজের

মূলতত্ত্বই হ'চ্ছে যে যতটুকু পার কেড়ে নাও—উদরসাৎ কর! তাই পুরুষার্থ—তাই পুণ্য—তাইতে যে আনন্দ তাই স্বর্গ।

যামিনী। Bravo! apostle of agnosticism!

সুধাংশু। বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরেজীর এই বুক্‌নিগুলো মাখমের সঙ্গে কাঁকরের মত আপনার মুখে ঠেকে না, জামাই বাবু?

যামিনী গোঁফ্‌টা পাকাইয়া, উপরদিকে তুলিয়া দিয়া বলিল, "কাঁকর নয়, brother—মিছরীর দানা বল! বাঙ্গলা conversationএর modern styleই হ'চ্ছে, one-third বাঙ্গলা আর two-thirds ইংরেজী, বেশী হয় ভালই—অন্ততঃ অর্দ্ধেকও হওয়া চাই।"

সুধাংশু। তা হ'লে—আমার স্ত্রী শুধু আলু ভাতে আর ভাত রেঁধেছিল—এই কথাগুলিকে style মত ব'লতে হ'লে বোধ হয় ব'ল্‌তে হ'বে—আমার wife শুধু potato ভাতে and ভাত cook ক'রেছিল? দাদা, তুমি থাক—আমি যাই!

সুধাংশু এই কথা বলিয়া একবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিরাজও ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, "চল্‌—আমিও যাই!"

তাহারা চলিয়া গেলে যামিনী বলিল, "what benighted fools!—I pity them! যাক্‌—হীরু বাবু! আপনার philosophical diatribe বেশ লাগ্‌তেছিল। আচ্ছা—আপনি আজ এতটা excited হ'য়ে উঠ্‌লেন কেন? আপনার কথাগুলিতে যেন একটা covert irony আছে—একটু বেশ sharp stingও আছে; hypocrisy সম্বন্ধে আপনার remarkগুলি যেন personal attack ব'লে মনে হয়—তাই কি?

হীরালাল। শুধু কথায় নয়—আমার অন্তরেও একটা বিষের হাঁড়ী আছে—

যামিনী। তা সেটা এমন ক'রে পুষে রেখেছেন কেন, ঢেলে ফেল্‌লেই ত মনটা খালি হ'য়ে যায় ?

হীরালাল। ঢাল্‌বার যে সুবিধে পাচ্ছি না।

নলিনী। তা যতদিন না পাচ্ছিস্‌ সেটা চেপে রাখ্‌না কেন ?

হীরালাল। তাই রাখি, তবে তাপ পেলে মাঝে মাঝে সেটা উথলে ওঠে—একটু আধটু বেরিয়েও পড়ে।—এখন আমাকে যেমন দেখ্‌ছেন, চিরদিনই আমি এমনি ছিলুম না, যামিনী বাবু! একদিন আমার চরিত্র খুব ভালই ছিল—তখন আমার সুখও ছিল। আর কিছু সুখ না থাক্‌, প্রাণ খুলে হাস্‌তে পারতুম—প্রাণ ভ'রে কাঁদ্‌তেও পারতুম। কিন্তু আমার সে সব সুখ গেছে। এখন যথার্থই আমি—আপনার কথাতেই বলি, atheist—agnostic—libertine—আরও যা বলেন তাই। আমি চিরদিন এমনি দরিদ্রও ছিলুম না—অন্ততঃ দরিদ্রের ঘরে আমার জন্ম হয় নি! অজ্ঞান-শৈশবের যে অবস্থাটা এখনও স্বপ্নের মত আমার মনে আসে, সেটা বেশ সুখের অবস্থাই ছিল; কিন্তু শৈশবের আর সব সুখের ছায়া-বাজির মত সেটা যে কবে আমার মনে শুধু একটা অস্পষ্ট স্মৃতি রেখে চ'লে গেল তা মনে নেই। জ্ঞান হ'বার পর দেখি, আমার কিছুই নেই। যা আছে তা'তে একজনের একরকমে চ'ল্‌তে পারে; কিন্তু আমি ত একা নই! পুত্রবধূর মুখ দেখে সুখে মরবার জন্যে অল্প বয়েসেই মা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। বিবাহের ফলে আমি একাই শুধু বহু হই নি—আমার অভাবও বহু হ'য়ে প'ড়েছিল। লোকের মুখে শুন্‌তে পেতুম, আমাদের অনেক সম্পত্তি নীলু কাকা—এই বিরাজের বাপ ফাঁকি দিয়ে কিনে নিয়েছেন—আর অনেক তাঁর কাছে বন্ধকও আছে। একদিন তাঁকে ব'ল্‌লুম, "নীলু কাকা! উচিত মূল্যেই হ'ক আর অনুচিত মূল্যেই হ'ক—আমাদের

যে সব সম্পত্তি আপনি কিনে নিয়েছেন তার কথাই নেই, যেগুলি বাঁধা আছে শুনতে পাই, তা'তে আমার আইন-সঙ্গত কোন দাবী দাওয়া থাক্ বা নাই থাক্,আমার স্ত্রীর গয়না বেচে টাকা দোব,দয়া ক'রে আমাকে এমন একটি সম্পত্তি ফিরিয়ে দিন যাতে আমার ভাতের অভাবটা না থাকে !" প্রথমে ত হেসেই উড়িয়ে দিলেন, তার পর পেড়াপীড়ি ক'রতে রেগে উঠে, আমাকে চোখ রাঙ্গিয়ে হাঁকিয়ে দিলেন। ভারী রাগ হ'ল—আদালতের আশ্রয় নিলুম। ফলে কিন্তু কিছুই হ'ল না। যারা জানে—যাদের মুখ থেকেই আমার শোনা, তারাও আদালতে গিয়ে, নীলু কাকার দিক্ হ'য়ে স্বচ্ছন্দে মিথ্যে ব'লে এল ! লাভে হ'তে স্ত্রীর ছ'একখানি গয়না নষ্ট হ'য়ে গেল। সেই থেকে ভেবে ভেবে যেন কেমন হ'য়ে গেছি ! ভাল ছিলুম—মন্দ হ'য়েছি, আস্তিক ছিলুম—নাস্তিক হ'য়েছি, আরও কি হ'ব তা জানি না, কিন্তু ছনিয়াটাকে বেশ ক'রে চিনে নিয়েছি।

নলিনী। ছনিয়া এই রকমই। তোর বরাতে ছেল না তাই গেছে—বরাত কখন ফেরে আবার হবে, তাই ব'লে ফূর্ত্তি ছাড়্বি কেন ?—

যামিনী। তা বই কি—আপনার philosophyই ত ব'লেছে, "Eat, drink and bé merry !"

হীরালাল। ফূর্ত্তি ক'রব কি—সমাজের অত্যেচারে, সংসারের অযথা বৈষম্য, অবিচার আর মানুষের ছর্ব্যাবহারে আমি একেবারে হাড়ে হাড়ে জ্ব'লে গেছি ! নীলু কাকার রাজার মত বাড়ী—আর আমার ভাঙ্গা কোঠাতে বৃষ্টির দিনে এক তিল শুকন ঠাঁই থাকে না কেন ? তাঁর স্ত্রীর আর বউএর গায়ে হীরে মুক্তো ধরে না—আর আমার স্ত্রীর শত স্থানে সেলাই-করা ছেঁড়া কাপড়খানিও চামের মত কালো কেন ? তাঁর ছেলের আর ভাই-পোর ক্ষীরে সরে অরুচি—আর আমার ছেলে মেয়েরা পথের পোড়া মুড়িটিও

খুঁটে খেতে চায় কেন? তিনি মখ্‌মলের গদিতে ব'সে তাকিয়ে হেলান দিয়ে,রূপোর আলবোলায় সোণার নল লাগিয়ে বাদ্‌শাই চালে দিন কাটান —আর আমাকে জ্বরে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বাজার ক'রে আন্‌তে হয় কেন? নীলু কাকা কখন চাকরী করেন নি। পৈতৃক সম্পত্তি ত আমারও ছিল! তবে কি চেষ্টার ফলে বা যোগ্যতার বলে তাঁর বিষয় বর্ষার নদীর মত বেড়ে গেছে—আর কি চেষ্টা বা যোগ্যতার অভাবে আমার সে সব গ্রীষ্মের ডোবার মত শুকিয়ে গেছে? কে কোথায় লুকিয়ে একটু মদ খেলে, তাই নিয়ে দেশের লোক হৈ চৈ ক'রতে পারে; কিন্তু একজন যে নাবালকের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ভোগ ক'রছে—সে বিষয়ে ত কেউ একটি কথাও কইতে চায় না? পায়ে ধ'রে সাধ্‌লেও কেউ আমার পক্ষ হ'য়ে একটা সত্যি কথা ব'ল্‌তে চায় না—আর নীলু কাকার হ'য়ে অযাচিত মিথ্যে ব'ল্‌তে শত জন নিজের খরচায় আদালতে উপস্থিত হয়!—যে বেশী পয়সা খরচ ক'রে ভাল উকীল দিতে পারে, তার মিথ্যেটাও সত্যি সাব্যস্ত হয়—যে তা পারে না, তার সত্যিটাও মিথ্যে হ'য়ে ভেসে যায়! যে প্রবল সে দুর্ব্বলের কেড়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ভোগ করে—যে সহায়বান্ সে অসহায়কে দুঃখ দিয়ে সুখে থাকে, তবে ধর্ম্ম কোথায়? লোকে বলে, ভগবান্ আছেন!—ভগবান্ কি ক'র্‌তে আছেন? যে পরের কেড়ে নিতে পারে তার অবস্থাই উন্নত—আর যে দুর্ব্বল ব'লে নিজের বজায় রাখ্‌তে পারে না বা নিঃসহায় ব'লে কি ধর্ম্ম ভেবে প্রতিশোধ নিতে চায় না, সেই দরিদ্রতার নিম্নস্তরে নেমে পড়ে। ধর্ম্মাধর্ম্ম—পাপ-পুণ্য—ও সবই মিছে—সমস্তই বামুণের বুজ্‌রুকী; ভগবান্ কেবল ভূতের মত একটা মিছে কথার ভয় মাত্র। জগতের কেউ ন্যায়-পরায়ণ নিয়ন্তা নেই। জীবন-সংগ্রামে যে দুর্দ্দান্ত সেই বিজয়ী—যে নিরীহ সেই নির্জ্জিত। যে বঞ্চক আর ধূর্ত্ত সেই বুদ্ধিমান্—যে সরল সেই নির্ব্বোধ।

পরের কেড়ে নিতে না পারলে আর আপনার কিছু বাড়ে না—পরের অনিষ্ট ক'রতে না পারলে আপনার ইষ্টসিদ্ধি হয় না।

যামিনী। Exactly so!

হীরালাল। যেদিন জেনেছি—নীলু খুড়ো আমার বিষয়-গ্রাসে রাহু, আমিও সেই দিন থেকে তাঁর সংসার-সুখে ধূমকেতুর দৃষ্টি দিতে আরম্ভ ক'রেছি—

নলিনী। কিন্তু তা'তে আর তাঁর ক'র্‌বি কি? তিনি প্রবল—তাঁর লোক-বল, অর্থ-বল যথেষ্ট—তোর কি আছে?

হীরালাল। আমার কিছু নাই থাক্—নীলু খুড়োরই সংসারে ঘরোয়া একটা বিবাদ বিসংবাদ আমি চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি। সুধা ছোঁড়াটা অর্দ্ধেক বিষয়ের অধিকারী, কিন্তু যেন চাকরের মত থাকে; এ ভাব কতদিন চ'ল্‌বে মনে কর? আর বিরাজের শুন্‌তে পাই না কি বউ-গত প্রাণ, খুড়ী-ঠাক্‌রুণ সেই বউকেই দু'চোখে দেখ্‌তে পারেন না। এদিক্ দিয়েও কিছু একটা হ'তে পারে না? যেদিক্ দিয়েই হ'ক্ একটা কিছুর আগুন একটু জ্বল্‌বার উপক্রম হ'লেই হীরালাল তা'তে বাতাস দিয়ে সেটাকে বেশ ক'রে জ্বালিয়ে দেবেই দেবে। সে আগুনে কি নীলু খুড়োর কিছুই পুড়্‌বে না?

নলিনী। তাতে তোর লাভ?

হীরালাল। চোখের সুখ!

যামিনী। আচ্ছা—বিরাজের মা কি বড়—what do they call it—বউ-কাঁটকী?

হীরালাল। শুন্‌তে ত পাই সেই রকম—আচ্ছা, তাঁকে কখন হাস্‌তে দেখেছ, নলিনী? আমি ত কখন দেখি নি! তাঁর হাসিটা যেমন মরুভূমির

ফুলের মত একটা অসাধারণ দৃশ্য, রঙ্গরস প্রভৃতিও তেমনি অকাল ফুল-ফলের মত তাঁর স্বভাবের একটা ব্যভিচার বা অদ্ভুত ! মুখখানি ত সর্ব্বদাই যেন একটি বড় রকমের ঘাটালে তোলো হাঁড়ী ! যাত্রা টাত্রা হ'লে কত ভিন্ন গ্রামের লোক এসে তাঁদের বাড়ীতে রাত জেগে যায়, তিনি কিন্তু ঠিক সময়ে মশারিটি ফেলে সমানে নিদ্রা যান !—

যামিনী। Such characters—ঠিক্ জান্‌বেন—are fit for treasons, strategems and spoils !

হীরালাল। মুখের গুণে দাসী চাকর বাড়ীতে পুরন হ'তে পায় না ; যে ক'দিন যে থাকে তাঁর রসনার বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে থাকে। বিরাজের বউ আসার পর থেকে কিন্তু তাদের হাড়টা যেন একটু জুড়িয়েছে।

নলিনী। কেন ?

হীরালাল। ব্যাপ্তিতে গভীরতার হ্রাস হয় না ? বিষটা এখন ছড়িয়ে প'ড়েছে—বউএর ওপরেই সেটা খুব বেশী বেশী।

যামিনী। আপনি এ সব খবর এত কোথায় পান—আপনার wifeএর কাছে বোধ হয় ?

হীরালাল। আরে না—সেটা একতর !—মোহিনী ব'লে খুড়ীঠাক্‌রুণের কালপেঁচী এক বেটী খুব পেয়ার ঝি আছে, তাঁদের ঘরের কথা জান্‌বার জন্যে মিষ্টি কথায় সেই বেটীকে একটু হাতগত ক'রে রাখা গেছে।

যামিনী। তা বেশ ক'রেছেন—এখন চলুন eveningটা একটু enjoy করা যাক্ !—আজ old-blended Beehiveএর একটা case খোলা গেছে !—

নলিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, old-blended ?—অতি উপাদেয় !—"পুরাণশীধুং নবপাটলঞ্চ !"

যামিনী হীরালালের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল, এবং তিন জনে কথা কহিতে কহিতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অদুঃখসম্মিন্ন সুখ সংসারে নিতান্তই বিরল; এখানে এমন সুখী কাহাকেও দেখা যায় না যাহার কোন কিছু একটা দুঃখ নাই। তবে কাহারও অনেক সুখের মধ্যে সেই একটুখানি একটা দুঃখ জ্যোৎস্না-সাগরে চন্দ্রের কলঙ্ক-ছায়ার মত ডুবিয়া থাকে, কাহারও বা সেই একটা ও একটুই বাসি-করা ধপ্ধপে শাদা বিছানার চাদরে কালী পড়ার দাগের মত জাগিয়া থাকে। কমলারও একটা দুঃখ তাহার সমস্ত আনন্দ ও সমস্ত সুখকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল, তাহার শাশুড়ী—শ্রীমতী কাত্যায়নী তাহাকে দেখিতে পারেন না।

সকল ব্যাপারেরই কিছু না কিছু একটা কারণ থাকে; তবে সকল বিষয়েরই সেটা প্রত্যক্ষ হয় না, কোন কোন বিষয়ের আবার অনুমান করাও দুরূহ। কাত্যায়নীর বধূ-বিদ্বেষের কারণটাও এই শেষবিধ। মানুষের অনুমান কিন্তু দুরবগাহ বিষয়ের প্রতিও ধাবিত হইতে পশ্চাৎপদ হয় না। আমরাও ইহার দুইচারিটা সম্ভবপর হেতু অনুমান করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

সূর্য্যনারায়ণ কন্যার বিবাহ-পণেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং উপঢৌকনাদিতে তিনি কাত্যায়নীর সন্তোষ সম্পাদন করিতে পারিতেন না। পিতার দরিদ্রতাও কি কন্যার দুরদৃষ্ট—তাহার দোষ নহে?

কমলা কাত্যায়নীর পুত্রবধূ। পুত্রবধূ অন্য কোন দোষ না করিলেও কেবল পুত্রবধূ বলিয়াই শ্বশ্রূর বিরাগভাগিনী হইতে পারে।

বিবাহিত পুত্রের উপরে জননীর যে আর পূর্ব্বের মত পূর্ণাধিকার থাকে না, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যাহাতে একাধিপত্য ছিল তাহাতেই বিভক্তাধিপত্য লইয়া কে সন্তুষ্ট থাকে? আর সে অনিষ্টপাতের যাহারা হেতু তাহাদের প্রতি কোন্ পুত্রবতীই বা প্রীতির চক্ষে চাহিতে পারেন.?

বিবাহের পূর্ব্বে বিরাজের নিজের বলিয়া কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ঘর ছিল না। তখন কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিয়া তাহার দৃষ্টি সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরটার দিকে ছুটিয়া যাইত না। এখন তাহাই হয়। সেই ঘরটায় গিয়া না বসিলে তাহার মনটা যে বেশ সুস্থির হয় না, কাত্যায়নী সেটা বেশ বুঝিতে পারেন।

গৃহ-কর্ম্মের অবসরে কমলা কখন কখন একবার রামায়ণ বা মহাভারত লইয়া বসিত। স্ত্রীলোকের বইপড়া আর তামাকু খাওয়া কাত্যায়নীর চক্ষে তুল্য বিষদৃশ। পাঁচ দিন সহিয়া তিনি একদিন বিরাজকে বলিলেন, "মেয়ে-মানুষের আবার বই পড়া কি রে, বিরাজ? বউমাকে মানা ক'রে দিস্, ছিঃ—লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে যে!" বিরাজ তদুত্তরে বলিয়াছিল—"কাজ ফেলে বই প'ড়লেই লক্ষ্মী ছেড়ে যায়, মা; কাজ কর্ম্ম যখন কিছু থাক্‌বে না তখন বাজে গল্প না ক'রে ভাল বই প'ড়তে আর দোষ কি?"

শত দিন সহস্র দফায় কাত্যায়নী দেখিতে পান, পরের মেয়ে ঘরে আসিয়া তাঁহার ছেলেকে পর করিয়া দিতেছে। শুধুই কি ছেলে? যে 'কর্ত্তা' পূর্ব্বে 'গিন্নী' বই আর জানিতেন না, সেই কর্ত্তার এখন বউ-মা খাওয়ার কাছে না বসিলে অর্দ্ধাশন হয়। কোন বিষয়ের পরামর্শ করিতে হইলেও এখন আর গিন্নীকে দরকার হয় না, বউ মার সঙ্গেই পরামর্শ করেন।

সুধাংশু কাহারও বশীভূত নহে বলিয়াই কাত্যায়নীর ধারণা ছিল।

একদিন অন্তরালে থাকিয়া তিনি যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার সে ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

উপরের দালানে বসিয়া কমলা পাণ সাজাইতেছিল, হীরালালের পত্নী তরঙ্গিণী ছেলে কোলে করিয়া তাহার কাছে বসিয়া ছিল। সুধাংশু পাণ লইতে আসিয়া বলিল, "ফিস্ ফিস্ ক'রে তোমাদের এত কিসের কথা হ'চ্ছে, বউ ঠাকৃরুণ?"

তরঙ্গিণী। "দুটি যা আছি—এইবার তিন জন হবার একটা পরামর্শ আঁটছি।"

সুধাংশু। কেন, দু'জনে কি গল্পের জুত হ'চ্ছে না?

তরঙ্গিণী। কৈ আর—সত্যি, ছোট্‌ঠাকুরপো, একটি বেশ সুন্দরী বড় মেয়ে আছে; তার বাপ ওঁকে ভারী জিদ্ ক'রে ধ'রেছে। কথা পাড়্‌তে ব'ল্‌ব?

সুধাংশু দুই তিনটা পাণ একবারে মুখে ফেলিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "বেশ ত, তাঁকেই কেন বলো না!—দু'টো বিয়ে করা ত কুলীন-দের গৌরব, বউঠাকৃরুণ!

তরঙ্গিণী। তাই ত—পরের বেলায় দু'টো আর নিজের বেলায় এক-টাও নয়! কেন বল দেখি?

সুধাংশু হাসিয়া—"কি ক'রব বিধাতা-পুরুষ ওটা আমার কপালে লেখেন্ নি"—বলিয়া, চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

কমলা এতক্ষণ শুধু ঠোঁট টিপিয়া একটু একটু হাসিতেছিল; তরঙ্গিণী আর কিছু বলিল না দেখিয়া বলিল, "ঠাকুরপো! তোমার কি ভীষ্মের পণ?"

সুধাংশু। কেন—বউদিদি?

কমলা। কিছুতেই বিয়ে ক'রবে না—কারু কথা রাখ্‌বে না?

সুধাংশু। আমার ইচ্ছে নেই, বউদিদি!

কমলা। ইচ্ছে না থাকলেও কি মানুষকে উপরোধ অনুরোধেও অনেক কাজ ক'রতে হয় না?—অনিচ্ছের কারণটাও কি কারুকে বল্‌বার মত নয়?

সুধাংশু। আমার মনটা বড় ছোট, বউদিদি! তা'তে বেশী মানুষের—বেশী জিনিসের ঠাঁই হয় না। সংসারে অনেক মানুষ আছে, আমার মনের মত শুধু দুটি! আমার ভয়—পাছে আর কেউ এসে তাদের দু'টিকে আমার মন থেকে স'রিয়ে দেয়!

তরঙ্গিণী। বিয়ে ক'রলে ভক্তি-ভালবাসাটুকু কি সবই সেই শ্রীপায়ে ঢেলে দিতে হয়, ঠাকুরপো? কৈ তোমার দাদারা ত কেউ তা করে নি?

কমলা। ছোট কি আর বড় হয় না, ঠাকুরপো? ছেলে বেলায় যখন 'ক' 'খ' প'ড়তে, তখন সেই একখানি বইএর একটি পাতাই ত তোমার সমস্ত মনটিকে আগুলে রাখ্‌ত। তার পর যখন বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বই বাড়্‌তে লাগ্‌ল, তখন সে সবও ত সেই মনেই ধ'রেছিল?

সুধাংশু। স্পষ্ট ক'রে না ব'ল্‌লে দেখ্‌ছি ছাড়বে না—ভাই ভাই যে ঠাঁই ঠাঁই হয়, তার গোড়া কি জান ত? আমি যাকে বিয়ে ক'রে আন্‌ব, সে যে তোমার মতই হবে তার কিছু ঠিক্‌ আছে কি? আমি সব ছাড়্‌তে পারি, বউদিদি! যাতে দাদাকে ছাড়্‌তে হবে তার এতটুকু সম্ভাবনাও আছে তেমন কিছু ইচ্ছে ক'রে ডেকে আন্‌তে চাই না।

তরঙ্গিণী। আহা—মেয়েরাই যত ঘর-ভাঙ্গা আর মন-ভাঙ্গার গোড়া বুঝি! পুরুষেরা সব সাধু—কেমন, ঠাকুরপো? আচ্ছা—মেয়েগুলোই না হয় শুদ্ধু মুদ্ধু ঝগড়া ক'রে মরে—ঘরের খুটি নাটি কথাগুলি

সব পুরুষদের কাণে তোলে, কিন্তু মহাপুরুষেরা সে সব কথায় মন দেন কেন ?

কমলা। কথাতে মন ভাঙ্গে না, ঠাকুরপো !—মনের দোষেই মন ভাঙ্গে আর ঘরও ভাঙ্গে। যে জিনিসটা আপনা হ'তেই ভাঙ্গ ভাঙ্গ হ'য়ে র'য়েছে, সেইটাই কিছুর একটু ঘা সইতে পারে না—ভেঙ্গে পড়ে।' তাই যদি তোমার ভয় হয়, আমি না হয় এমন একটা কিছু লেখা-পড়ায় সই ক'রে দিচ্ছি যে—

তরঙ্গিণী। যে—শ্রীমান্ সুধাংশু বাবুকে কাহারও লাগান ভাঙ্গান শুনিতে হইবে না; যদি হয়, আর যদি তাহাতেই তাঁহার মনটি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে আমি তাহা জুড়িয়া দিব, না পারি মনের দাম ধরিয়া দিব—কেমন ?

কমলা। কেমন—তা হ'লে রাজী হও ?

হাতে যে কয়েকটা পাণ ছিল সব মুখে পূরিয়া সুধাংশু হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা—তোমার এতে এত জিদ্ কেন, বউদিদি ? তোমার কি দাসীর অভাব হ'য়েছে ?—তা যেদিন হবে দাদাকে তোমার মনের মত একটা দাসী দেখে দিতে ব'লো, আমি বিয়ে ক'রে এনে দোব—আর কিছু কথা আছে ?"

যাহাতে সকলের হার হইয়াছিল তাহাতেই কমলার জয় হইল। কিন্তু ক্ষুদ্র বিজয়ী যেমন বিজিতকে তখনই বাঁধিয়া বন্দী করিবার ব্যবস্থা করে, সে তাহা করিল না—বরং তাহাকে আরও দুই চারিটা পাণ দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা—যেমন ছাড়া বেড়াচ্ছ বেড়াও, কিন্তু যেদিন ব'লব সেই দিন এই কথা মনে ক'রে লক্ষ্মী হ'য়ে বাঁধনটি গলায় নিও !"

সেই দিন হইতে কাত্যায়নী বুঝিয়াছিলেন, কমলাকে 'ভিটে-ছাড়া' করিতে না পারিলে আর তাঁহার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবার আশা নাই।

এইগুলিই ঠিক্ তাঁহার বধূ-বিদ্বেষের হেতু কি না তাহা বলা যায় না ; তবে এতদ্দতিরিক্ত আর কিছুও হেতুরূপে নিরূপিত হইবার মত আমাদের জানা নাই।

কারণ যাহাই হউক কার্য্যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কাত্যায়নী তিরস্কার করিবার জন্য নিয়ত কমলার ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ান। মন যাহার প্রতি অপ্রসন্ন তাহার অপরাধের অভাব কি? "বউ-মানুষের অমন ক'রে চাওয়া—তেমন ক'রে চলা—কথা কওয়া" ইত্যাদি কমলার যে কত দোষ তাহার সংখ্যা হয় না।

প্রথম আসিবার দিনে কমলার পিতা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "সর্ব্বস্ব ক্ষয় করিয়া তোমার আশ্রয় কিনিয়া দিলাম, যেন নিজের দোষে হারাইও না—কদাচ গুরুজনের প্রতিবাদিনী হইও না!" কমলা তাহা মনে করিয়া বোবার মত থাকে ; কিন্তু মূকতাও যে অদৃষ্টের দোষে দোষ হইতে পারে সে তাহা জানিত না—সূর্য্যনারায়ণও বোধ হয় তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। কাত্যায়নীর নিকটে বিনয়-বচনে প্রসাদ বা ক্ষমা ভিক্ষা করার নাম, "মুখে মুখে উত্তর" আর চুপ করিয়া থাকার নামও—"দেমাক্"!

কাচা কাপড় শুকাইবার পর তুলিতে একটু বিলম্ব হইলেই কাত্যায়নী বড় বকেন। কমলা একদিন স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, ছাতে এক ছাত কাপড় শুকাইয়া গিয়াছে। মাথা না মুছিয়াই সে তাড়াতাড়ি আগে কাপড়-গুলিকে তুলিতেছিল। কাত্যায়নী আসিয়া মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা—মিছে কাজ নিয়ে র'য়েছ, বাছা, দাসীগুলোর খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে গেল দেখ্‌তে পাও না? একটু বাটনা বেটে দিতে পার নি?" কমলা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে আসিয়া, শিল পাতিয়া বাটনা বাটিতে বসিল।

কাত্যায়নী তখনই ফিরিয়া আসিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন,

হ্যাঁ গা—এক তাল বাট্না র'য়েছে দেখ্‌তে পাও নি? আবার যে বড় বাট্‌তে ব'সেছ?" কমলা ধীরে ধীরে বলিল, "বামুণ-মা যে ব'ল্লেন, মা!" ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণীও বলিলেন, "ধনে বাটনা বড় কম ছেল তাই আমিই একটু বেটে দিতে ব'লেছি।" কিন্তু সে কথা কে শুনে? কাত্যায়নী ঝঙ্কার করিয়া—"অকম্মের ওপোর আবার চোপা?"—বলিয়া কমলার গালে একটা ঠোনা মারিয়া চলিয়া গেলেন।

আর একদিন কি একটা তরকারিতে আলু কম হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী কমলাকে চারিটি আলু কুটিয়া দিতে বলেন। কমলা আনাজের চাঙ্গারী লইয়া আলু কুটিতে বসিয়াছে, কাত্যায়নী আসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা—ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ক'রে কতকগুলো আলু কুঁচিয়ে দিচ্ছ যে?—

কমলা উত্তর করিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী বলিলেন, "ঝোলে বড় কম হ'য়েছে ব'লে আমিই দিতে ব'লেছি।" কাত্যায়নী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া—"তেজ দেখ মুখে কথা নেই"—বলিয়া কমলার মুখে এমন একটা চাপড় মারিলেন যে, তাহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

নির্যাতন ভোগ করিতে বিধাতা যাহাদিগকে সংসারে পাঠাইয়া দেন তাহাদের হৃদয় কি সাধারণের অপেক্ষা কিছু দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দেন? কমলার দেহ যাহা সহ্য করিতে পারে না, তাহার হৃদয় তাহা অক্লেশে সহ্য করিয়া থাকে। কাত্যায়নীর নির্দ্দয় প্রহারে তাহার অঙ্গ ক্ষত হইয়া রক্তপাত হয়, কিন্তু তাহার নয়নে কেহ কোন দিন এক বিন্দু অশ্রু দেখিতে পায় না!

পৌষের দুরন্ত শীত—তূলার গদিতেই যেন কে বরফ ঢালিয়া

রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কমলাকে সেই শীতে নীচের ঘরে সিমেণ্ট্ মাটীর মেজেতে পড়িয়া, আঁচল গায়ে দিয়া রাত কাটাইতে হয়। শীতের দুঃসহ বর্ষা, পশমী কাপড়েই শীত ভাঙ্গে না, কমলাকে ভিজা কাপড়েই কাজ করিতে হয়। কখন বা চৈত্রতাপে অনাবশ্যক কার্য্য লইয়া মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ছাদে বসিয়া থাকিতে হয়। তাহার উপরে অর্দ্ধাশন—কখন অনশন!

মধ্যাহ্নে একদিন এক ভিখারিণী আসিয়া দুটি ভাত ভিক্ষা করিল। মোহিনী কঠোর প্রত্যাখ্যানকে কটুস্বরে অতিমাত্র তিক্ত করিয়া বলিল, "মর্ মাগী—ভাত এত বেলায় তোর জন্যে কে বেড়ে রেখেছে লা? ধুম্‌স গতর্ র'য়েছে—খাটিয়ে খেতে পারিস্ না?—আমরা কি ক'রছি?" ভিখারিণী বেগতিক বুঝিয়া চলিয়া যাইতেছিল; কমলা ইশারা করিয়া তাহাকে দাড়াইতে বলিল, এবং নিজাংশের অন্নগুলির যথেচ্ছব্যবহারে তাহার অধিকার আছে ভাবিয়া সেইগুলি ভিখারিণীকে ঢালিয়া দিয়াছিল। অন্নের সেই অপ-ব্যবহারের অপরাধে দুই দিন তাহাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

বাড়ীতে প্রতিবেশিনী কেহ বেড়াইতে আসিলে কাত্যায়নী তাহাকে কমলার কাছে বসিতে দেন না। তরঙ্গিণীকে কেবল তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। সে কোন কথাই গায়ে মাখে না—সব কথাই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়; কমলাকে বলে, "তুই কেন মুখ শুকিয়ে থাকিস্, ভাই? আমি ত কিছু মনে করি নি! তুই থাক্‌তে আমার এখানে আসা কেউ বন্ধ ক'র্‌তে পারবে না। কাকী-মা যদি পথে কাঁটা দেন—সরিয়ে ফেলেও আস্‌ব, যদি ঝাঁটা ঝুলিয়ে রাখেন—তলা দিয়ে গ'লে আস্‌ব, যদি বাড়ী ঢুক্‌তে না দেন, তবু জানালা দিয়েও একবার তোকে উঁকি মেরে দেখে যাব—দু'টো কথা ক'য়ে যাব।"

কাত্যায়নী একদিন বধূর শাসন করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইবার

পরক্ষণেই তরঙ্গিণী আসিয়া পড়িল। কমলা অধোমুখে বসিয়া ছিল, তরঙ্গিণীর নিঃশব্দে আগমনটা জানিতে পারে নাই; সুতরাং চক্ষের জলটুকু সেদিন আর তাহার কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারিল না। তরঙ্গিণী তাহা দেখিয়া ফেলিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে লো! তোর চোখে জল কেন, ভাই—কাঁদ্ছিস্?"

কমলা মৃদু হাসিয়া—"কাঁদ্‌ব কি দুঃখে, দিদি?—চোখে কি একটা প'ড়েছে, সেই অবধি কেবলই কর্ কর্ ক'রছে"—বলিয়া চক্ষু দুটিকে বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিল।

তরঙ্গিণী তখনই আঁচলের খুঁটটি পাকাইয়া, "কৈ কোন্ চোখে—দেখি" বলিয়া, কমলার শিশিরসিক্ত পদ্মের মত অশ্রুদিগ্ধ চক্ষুটিকে বিস্ফারিত করিয়া ধরিয়া অশ্রুর কারণ অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চোখে নয়, বোন্, তোর মনে কিছু একটা হ'য়েছে—আমার কাছেও লুকিয়ে রাখ্ছিস্!"

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "হবে আবার কি, দিদি?—তুমি যেমন পাগল!" তারপর অপর কথায় আসল্ কথাটা ঢাকিয়া লইল।

কাত্যায়নীর ভয়ে কমলা পড়া ছাড়িয়াছিল, পত্র লেখাও প্রায় ত্যাগ করিয়াছিল—পিতাকে লিখিত না, কেবল বিরাজ রাগ করে বলিয়াই রাত্রিকালে চুরির মত করিয়া তাহাকে কখন কখন লিখিত। মোহিনী দাসীর গোয়েন্দাগিরিতে একদিন সে চুরি ধরা পড়িয়া গেল।

মোহিনী কুলালকুলসম্ভবা, বালবিধবা; বয়স্ বেশী হয় নাই, কিন্তু তাহার নাম ও রূপ পরস্পর বড় বিসদৃশ। নামের সহিত আকৃতির সামঞ্জস্য অল্পই দেখা যায়। পাঠক হয় ত অনেক কুরূপার নাম 'জ্যোতির্ম্ময়ী'—'পদ্মিনী' অথবা 'অহল্যা' শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু মোহিনীর মত

অশেষগুণালঙ্কৃতা পরিচারিকা বোধ হয় অল্পই দেখিয়াছেন। প্রতিবেশিনীরা বলেন, "মোহিনী কুঁদুলের রাজা—কেঁইএর সর্দ্দার—মিছে কথার ধুকুড়ী।" তাহার জন্য কাহারও মাচায় পুঁই ডগা মেলিতে পায় না, উঠানে নটে বা পালম্ মাথা তুলিতে পায় না, কলার গাছে কাঁদি পড়ে না, পুকুরে মাছ থাকে না, বাগানে তাল, বেল বা নারিকেল পড়িয়া থাকিতে পায় না। কুড়ে মানুষের মত সে কখন সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারে না, সকলে ঘুমাইলেই মার্জ্জারসঞ্চারে বাহির হইয়া পরের বাতায়নপার্শ্বে পরিক্রমণ করে, ছিদ্র পাইলে দেখিতে চেষ্টা করে, না পাইলে কাণ পাতিয়া তাহাদের পেটের কথাগুলি পর্য্যন্ত চুরি করিয়া আনে।

এই বিকটদর্শনা নিশাচরী একদা তাহার নৈশরহস্য-মৃগয়ায় যাত্রা করিবে এমন সময়ে কমলার কক্ষদ্বারের অবকাশ দিয়া সূতার সঞ্চারে আলোকরশ্মি নির্গত হইতে দেখিতে পাইল; এবং তৎক্ষণাৎ কাত্যায়নীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া সেই অদ্ভুত আলোকদর্শনের কথা নিবেদন করিল।

ঘরে আগুন লাগিয়াছে শুনিয়াও বোধ হয় কাত্যায়নী সে নিশীথ নিদ্রার ঘোর লইয়া তাদৃশ ক্ষিপ্রতা পরিগ্রহ করিতে পারিতেন না; দণ্ডেই আসিয়া তিনি কমলাকে দ্বার খুলিতে বলিলেন এবং দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, আলোকের নিকটে একখানা অর্দ্ধলিখিত পত্র ও দোয়াত, কলম প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম! ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে তাঁহার ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না, রোষকষায়িতনেত্রে তীব্রস্বরে বলিলেন, "বলি—হ্যাঁ গা! কত দিন তোমাকে বলি নি যে এ লক্ষ্মীছাড়া খিরিষ্টানি কাণ্ড আমার ভিটেতে চ'ল্‌বে না?"

কমলা অধোবদন—নিরুত্তর! কাত্যায়নী আর বৃথা বাক্যে নিদ্রার সময় নষ্ট না করিয়া প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন—কলমটাকে চাপিয়া

ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কালীটা পিক্‌দানীতে ঢালিয়া, দোয়াতটাকে এক আছাড়ে চূর্ণ করিলেন, শেষে অর্দ্ধলিখিত পত্রখানাকে ছিন্ন করিয়া দীপ-শিখায় দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ; তদনন্তর কৃত অপরাধের দণ্ডস্বরূপে কমলার ঘাড়ে ধরিয়া, তাহার সেই অরবিন্দসুন্দর মুখখানিকে দেয়ালে ঠুকিয়া—ঘসিয়া—মথিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া, ভবিষ্যতে যাহাতে হিন্দুর গৃহে আর সেরূপ অনাচার না ঘটে তাহার প্রতিবিধানকল্পে তাহাকে কঠিন শপথে আবদ্ধ করিয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

মিথ্যাকপটতাপূর্ণ সংসার সত্য ও সরলতার স্বাতন্ত্র্য সহ্য করিতে চাহে না—তাহাদিগকেও আপনার মত হইতে বাধ্য করে। কমলা সংসারের শান্তির জন্য আশৈশবাচরিত সত্য-ব্রত ত্যাগ করিয়া সঙ্গোপন-শঠতার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। বিরাজ বাড়ীতে আসিয়াই কমলার মুখে ও চোখের কোলে ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"ঘুমের ঘোরে প'ড়ে গেছ্‌লুম"—পত্র না লেখার কারণে বলিল, "অবকাশ ছেল না" এবং বিরাজ দোয়াত খুঁজিলে বলিল—"আমার হাত থেকে প'ড়ে ভেঙ্গে গেছে।"

*　　　*　　　*　　　*

শ্রাবণ মাস। তিন চারি দিন ধরিয়া নিরন্তর বৃষ্টি হইতেছে। দিবসে একবারও সূর্য্য দেখা যায় না, রাত্রিতে একটিও নক্ষত্র প্রকাশ পায় না—আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন। এক পশলা ভারী বৃষ্টির পর আকাশ যেমন একটু ফর্‌সা হয় অমনি কোথা হইতে পুঞ্জে পুঞ্জে নিবিড় মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে।

কাত্যায়নীর মুখখানিও আজ কয়েকদিন ঠিক এই প্রাবৃট্‌জলদাচ্ছন্ন গগনের মতই অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে দাসীচাকরদের উপরে এক

একটা তীব্র বাক্যের বৃষ্টি হইয়াও সে মেঘের ঘোর কাটিতেছে না। মেঘে শুধুই বৃষ্টি থাকে না—বজ্র, ঝটিকা, করকা প্রভৃতি বহু অনর্থ ঘনোদরে সঞ্চিত থাকে। কাত্যায়নীর এই ক্রোধ-জলদের অভ্যন্তরে কাহার কি সর্ব্বনাশ প্রচ্ছন্ন আছে কে জানে? গৃহস্থ সকলেই সশঙ্ক। ভয় ছিল না কেবল মোহিনীর। সে বহুদর্শী নাবিকের মত মেঘ দেখিয়াই বুঝিতে পারে, তাহা ভয় করিবার মত কি না।

কমলার সহিত কাত্যায়নীর কথাবার্ত্তা নাই। সে সাধিয়া কথা কহিতে আসিলে তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকেন, পায়ে ধরিতে আসিলেও পা গুটাইয়া লন, কোন কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "আমি তা কি জানি—আমি বাঁদী বই ত না।"

কমলা চিরদিন নীরবে নিগ্রহ ভোগ করে, কেহ তাহা জানিতেই পারে না। বিরাজ ও সুধাংশু বাড়ীতে থাকিলে কাত্যায়নী একটু শান্তভাবে থাকেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কমলার যেগুলি পাওনা তাহা বাদ যায় না; সেসকল অদৃষ্টবাদীর কর্ম্মফলের মত অবশ্যভোগ্য ও অক্ষয়—তাহারা কলিকাতায় চলিয়া গেলে কমলাকে সে সব সুদে আসলে বুঝিয়া লইতে হয়। নীলকমল নিয়ত গৃহে থাকিয়াও কিছুই জানিতে পারেন না; যাহা শুনিতে পান তাহাতে কমলারই দোষ শুনিতে পান। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কথা কহে না। নিয়ত তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়া শুনিয়া তাঁহারও পূর্ব্বস্নেহের উপরে যেন একটা আবরণ পড়িয়া আসিয়াছিল। তরঙ্গিণী কবে অন্তরাল হইতে কি দেখিয়া গিয়াছিল, সে কমলার 'মাথার দিব্যি' না মানিয়া বিরাজ ও সুধাংশুকে সেই কথা বলিয়া দেয়। বিরাজ তাহা গ্রাহ্য করা আবশ্যক মনে করে নাই; কিন্তু সুধাংশু তাহা লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলে এবং নীলকমলকে বলিয়া তাহার প্রতি-

বিধানের জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। অগত্যা তিনি গৃহিণীকে মিষ্ট কথায় একটু সাবধান করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই হইতেই কাত্যায়নীর এই নির্ব্বিণ্ণভাব।

পুরুষেরা কেহ বাড়ীতে নাই—বিষয়কর্ম্মের অনুরোধে নীলকমলও স্থানান্তরে গিয়াছেন। বৃষ্টির দিনে সকলেই সকাল সকাল কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পরেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। মোহিনী কাত্যায়নীর পা দুইখানি কোলে লইয়া টিপিতে টিপিতে বলিল, "কত্তা বাবুর ওপরে তোমার রাগ করা মিছে, মা! তাঁর দোষ কি ?—ছোট বাবুরও দোষ নেই; বউঠাক্রুণ যদি সব কথা পুরুষের কাণে না তোলেন ত কোন গোলই হয় না।"

কথাগুলিতে কি বৈদ্যুতিক শক্তি নিহিত ছিল বলা যায় না, তাহা শুনিয়াই কাত্যায়নী একবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং কাপড়খানি কষিয়া পরিয়া, চুলগুলি জড়াইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে কমলার কক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কমলা কক্ষতলে পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; অকস্মাৎ কাত্যায়নীর সরোষপদাঘাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সবিস্ময়ে ভ্রূকুটিকুটিলাননা শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কাত্যায়নী উপর্য্যুপরি পদচালনায় পরিশ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কমলাকে বিবিধ কটু ও গ্রাম্য ভাষায় ভৎ‌র্সনা করিতে করিতে বলিলেন, "তোকে ভিটে-ছাড়া ক'র্‌তে না পার্‌লে আর আমার কিছুতেই শান্তি নেই।"

কমলা আজ প্রথম দিন তাহার পিতার অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তাইতেই যদি তুমি সুখী হও, মা, তাই কর—সবার মত ক'রে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও!"

কাত্যায়নী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তবে লা নাগানী—ঘরভাঙ্গানী—শতেকখোয়ারী! মত ক'রব আবার কার লো? আমি কেউ নই বটে? তুই এখনি—এই দণ্ডে আমার ভিটে থেকে বের!—বের ব'ল্‌ছি, নইলে মোহিনীকে দিয়ে গলা টিপিয়ে বা'র ক'রে দেওয়াব।"

রাত্রিকাল—তাহাতে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার! নীলকমল বাড়ীতে নাই—বিরাজ দূরে! বাড়ীর বাহির হইয়া কুলবধূ কোথায় যায়? কমলার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কুপিতা শ্বশ্রূদেবীকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সে তাহার পা দুইটিকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি পা ছিনাইয়া লইয়া মোহিনীকে একটা অতি নিষ্ঠুর কাজ করিতে আদেশ করিলেন।

কমলা তাহা শুনিয়া, একবার চক্ষু হইতে অঞ্চল অপসৃত করিয়া মোহিনীর দিকে কটাক্ষ করিল। মোহিনী সেই বয়সে অনেক রকম দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অভিমানাশ্রুদিগ্ধ দীর্ঘনয়নের সগর্ব্ব, কাতর দৃষ্টি তাহার চক্ষে এই নূতন। সে কাত্যায়নীর নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিতে সম্মত হইতে পারিল না। তখন কাত্যায়নী স্বয়ং কমলার চুলের ঝুঁটী ধরিয়া, তাহাকে নিম্নে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং সত্য সত্যই সেই রাত্রিকালে বয়স্থা পুত্র-বধূকে গৃহের বাহিরে রাখিয়া অন্তঃপুরদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিলেন।

কাত্যায়নী উপরে আসিয়া স্বচ্ছন্দে শয়ন করিলেন। মোহিনীর কৌতূহল তাহাকে সুস্থির হইতে দিল না। সে অল্পক্ষণ পরেই নামিয়া, নিঃশব্দে দ্বারটি খুলিয়া বাহির হইল; কিন্তু কমলাকে সেখানে দেখিতে

পাইল না। সেই সময়ে হীরালাল গৃহে ফিরিতেছিল, দুইজনে দুই চারিটা কথা হইল। তাহার পর হীরালাল বাড়ী চলিয়া গেল। মোহিনীও দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়া শয়ন করিল।

কমলা কোথায় গেল? সেই ঘনশব্দবিক্লবা, বৃষ্টিঝটিকাকুলা, তিমিরা রজনীতে কুলবালা কোথায় আশ্রয় লইল?

বাড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া কমলা চক্ষু হইতে অঞ্চল অপসৃত করিয়া দেখিল, প্রকৃতিও তাহার শ্বশ্রূদেবীর মত ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাহার উপরে ভ্রূকুটি করিতেছে—রাত্রি তাহার ভবিষ্যতের মত গাঢ় তমসাচ্ছন্ন! তাহার পশ্চাতে স্বামিগৃহের দ্বার রুদ্ধ, পুরোভাগে প্রগাঢ় অন্ধকার, উপরে নিবিড় মেঘমালা, মুষলধারায় বৃষ্টি নামিতেছে, ঝটিকার বেগে বায়ু বহিতেছে, গভীরনাদে মেঘ ডাকিতেছে, পৃথিবী মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রভায় জাগিতেছে, তখনই আবার ঘনতিমিরগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে! মনুষ্যের ত কথাই নাই—নিশাচর পশুপক্ষীও সেরূপ রাত্রিতে বিবরাবাস বা বিটপিনীড় ছাড়িয়া বাহির হয় নাই—সেই কেবল আশ্রয়ের বাহিরে।

অশ্রু মার্জ্জন করিয়া কমলা ভাবিল, মোহিনী এখনই দ্বার খুলিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইবে। কিন্তু কতক্ষণ চলিয়া গেল কেহই দ্বার খুলিয়া দিল না। বায়ু বেগে বহিয়া তাহার সিক্ত বসন উড়াইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল। বায়ুসঞ্চালিত বৃষ্টিবিন্দু তাহার আর্দ্র বসন ভেদ করিয়া করকার মত তাহার গাত্রে প্রহার করিতেছিল। শীতে তাহার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া,

বৃথা অপেক্ষায় শ্রান্ত হইয়া ভাবিল, 'কোথায় যাই'? অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক ভাবিয়া দেখিল, তাহার যাইবার স্থান নাই। পিতার গৃহ নিকট বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যে আশ্রয় কিনিয়া দিয়াছেন, নিজের দোষে বা অদৃষ্টের দোষে তাহা হারাইয়া, তাঁহার গলগ্রহ হইতে—তাঁহার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার ভার বাড়াইতে, সেখানে যাওয়া সে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। কলিকাতায় বিরাজের নিকটে!—সেই কি পিতা মাতার বিরুদ্ধে তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিবে?—পারিলেও কমলা তাহা বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারিল না। নীলকমল যাবৎ ফিরিয়া না আসেন সেই পর্য্যন্ত তরঙ্গিণীর বাড়ীতে সে থাকিতে পারে; কিন্তু কাত্যায়নী যখন শুনিবেন তরঙ্গিণী তাঁহার বিতাড়িতা বধূকে আশ্রয় দিয়াছে? আপনার বিপদ্ লইয়া প্রিয় সখীকে বিপন্ন করাও সে সঙ্গত মনে করিতে পারিল না। তবে আর যাইবার স্থান কোথায়? যে অদৃষ্ট এত বড় সংসারকে—এই বিপুলা ধরিত্রীকে, তাহার পক্ষে এত সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছে, সেই অদৃষ্টের উপরে তাহার বড় রাগ হইল।

রাগের সময়ে হৃদয়ের অনান্য বৃত্তিগুলি যেন একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মানুষের মন তখন অন্ধ উন্মাদের মত সুপথ কুপথ বুঝিয়া চলিতে চেষ্টা করে না—দুর্গমে পা বাড়াইতেও একটু ইতস্ততঃ করে না। কমলা রাগ করিয়া নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাই?" তাহার ক্রোধোপহত মন স্বচ্ছন্দে বলিয়া দিল, "গঙ্গার গর্ভে!" সে ভাবিয়া দেখিল, দুঃখজ্বালা জুড়াইবার তেমন শীতল স্থান আর নাই। আর কোন কথা না ভাবিয়া সে সেই পথেই চলিল।

গঙ্গার তিমিরাবৃত তীর নির্জ্জন—নীরব! বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ ও প্রবল বায়ুর শন্ শন্ শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হয় না। নিকটে

বা দূরে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না—চারিদিকেই শুধু অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে! কমলা গঙ্গাতীরে—যে ঘাটে তাহারা স্নান করিত সেই ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, শ্রাবণের নদী কূলে কূলে ফুলিয়া উঠিয়াছে। জনমানবের সমাগম-সম্ভাবনাও নাই—ডুবিয়া মরিবার এমন সুযোগ আর হয় না! যে কয়েকটা ধাপ জাগিয়াছিল সে ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতে লাগিল। সেই চিরপরিচিত ঘাটও আজ তাহার পক্ষে যেন নূতন—প্রত্যেক ধাপ যেন জীবন ও মৃত্যুর এক একটা ব্যবধান! নিম্ন সোপানে পদার্পণ করিতেই একটা ঢেউ আসিয়া তাহার পায়ের উপরে আছাড় খাইয়া পড়িল। কমলা তাহাতে শিহরিয়া উঠিল—ইহা যেন মৃত্যুর তুষারবৎ স্পর্শ! এতক্ষণ সে যেন স্বপ্নে পথ চলিয়া আসিয়াছিল—সে যে মরিতে আসিয়াছে একথা যেন তাহার মনেই ছিল না। এই তরঙ্গস্পর্শ সেই কথাটা তাহার স্মরণে আনিয়া দিল। সেই সঙ্গে তাহার মনে হইল, যাহারা তাহাকে ভালবাসে তাহাদের কাহারও সঙ্গে দেখা হইল না—তাহাদের কাহাকেও কোন কথা বলিয়া যাওয়া হইল না। এই চিন্তাটা তাহার চরণের গতি মন্থর করিয়া দিল। কমলা জানু পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

অঙ্গ ভরা রূপ, বুক ভরা ভালবাসা ও অতৃপ্ত আশা লইয়া যৌবনে সংসার ছাড়িয়া যাইতে কে না ভাবে? কিন্তু যে ভাবে সে কি আত্ম-নিধনের পথে অগ্রসর হইতে পারে? এক চিন্তা অন্য সহস্র চিন্তাকে ডাকিয়া আনে। মন চিন্তাজালে জড়িত হইয়া উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারে না—বিলম্ব করিয়া ফেলে। বিলম্ব বহুবিধ বাধা-বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়া মরণের পথ দূরতর করিয়া দেয়। কমলা শুনিয়াছিল, আত্মঘাতীর গতি স্বতন্ত্র—তাহার কোন কালেই মুক্তির আশা নাই, তাহাকে

অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত যাতনায় আকুল হইয়া ধ্বান্তময় নির্জ্জনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে হয়। মরিয়া সকলে যেদিকে যায় সে সেদিকে যাইতেই পারে না—মৃত আত্মীয়গণের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। যে মরণ যেন সে মরণ কে চাহে, কিন্তু না মরিয়াই বা সে কোথায় যায়? তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিদেশে দাঁড়াইয়া কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিল, এমন কে আছে যে জানে—নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, আত্মঘাতীর গতি কি প্রকার? এমন সময়ে সে শুনিতে পাইল, তাহার অনতিদূর পশ্চাতে কে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে—আশঙ্কা ও উদ্বেগবিজড়িতকণ্ঠে তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! অন্ধকার তাহাকে ঢাকিয়া রাখিলেও কণ্ঠস্বরেই কমলা বুঝিতে পারিল, সে কে। যে গৃহ ছাড়িয়া সে মরণের দেশে পলাইতে চাহে এ যে তাহাকে সেই গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্যই আসিতেছে তাহা বুঝিয়াও সেই স্নেহপূর্ণ ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তাহাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইল। ইত্যবসরে তরঙ্গিণী আসিয়া একেবারে জলে নামিয়া কমলাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

মোহিনীর কথায় হীরালালের ধারণা হইয়াছিল, কমলা তাহাদেরই গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। সে বাড়ীতে আসিয়াই অনুচ্চস্বরে তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিরাজের বউ কোন্ ঘরে?" তরঙ্গিণী অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ হীরালালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হীরালাল তাহার বিস্ময়ভাবকে বিস্ময়ের অভিনয় ভাবিয়া লইয়া বলিল, "বল না—আমার কাছে আর ঢাক্‌ছ কি? আমি এইমাত্র মোহিনীর মুখে সব শুনে আস্‌ছি। তা

বেশ করেছ ; তবে কথা হ'চ্ছে খুড়ী-ঠাকৃরুণ যাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন তাকে বাড়ীতে রাখাটা নিতান্ত অমনি অমনি যাবে না।"

. তরঙ্গিণীর প্রথম বিস্ময়ের সে জড়তাটা নিমেষে ক্ষিপ্রতায় পরিণত হইল। সে আর কোন কথা না কহিয়া, অর্দ্ধনিদ্রিত শিশুকে শয্যায় ফেলিয়াই তীরের মত ছুটিয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেল এবং দুই বাড়ীর চারি পাশ খুঁজিয়া যখন কমলাকে দেখিতে পাইল না, সে আর অন্য কোথাও খুঁজিতে না গিয়া একেবারে গঙ্গাতীরে ছুটিয়া আসিয়াছে।

তরঙ্গিণী কমলাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে না ব'লে যে বড় পালিয়ে যাচ্ছিলি ?"

কমলা তাহার উত্তরে কেবল কাঁদিল। প্রিয়জনের সমক্ষে হৃদয়ের নিরুদ্ধ দুঃখ, বিষাদ ও অভিমান যেন বিবৃত দ্বার পাইয়া সহস্রধারায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। কমলা তরঙ্গিণীর বক্ষে মুখ রাখিয়া আবেগভরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুর নদীতে আজ যেন বন্যা উপস্থিত হইয়াছিল। তরঙ্গিণীরও সে বিষয়ে বড় ক্রটি হইল না ; দুই জনে গলা জড়া জড়ি করিয়া, গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ নীরবে নয়নাম্বু বিসর্জ্জন করিল। শেষে তরঙ্গিণী একটু দৃঢ় হইয়া, কমলাকে অনেক বুঝাইয়া তাহাকে গৃহাভিমুখে টানিয়া লইয়া চলিল।

মোহিনীর চক্ষে ঘুম ছিল না। অন্তঃপুরদ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইয়াই সে ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তরঙ্গিণী রোরুদ্যমানা অনীপ্সিতগমনা বিষাদবিবশা সঙ্গিনীকে টানিয়া লইয়া গিয়া কাত্যায়নীর ঘুম ভাঙ্গাইল, এবং মিনতি করিয়া তাঁহাকে অনেক বলিল, কিন্তু তাহার ওকালতীতে কিছুই হইল না। তিনি মেঘমন্দ্রের ন্যায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তখন লাথী মেরে গলা টিপে বার ক'রে দিয়েছি, এবার এলে

মোহিনীকে দিয়ে ঝাঁটা-পেটা ক'রে বিদেয় ক'রব—আর যে ঘরে ঠাঁই দেবে তাকেও বুঝে নোব।"

তরঙ্গিণী সে ভয়ে পিছাইল না। কমলাকে টানিয়া লইয়া সে আপনার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। অতি প্রত্যূষে পল্লী জাগ্রত হইতে না হইতে হীরালাল একখানা পাল্কী ডাকিয়া দিল। কমলার ইচ্ছা না থাকিলেও তরঙ্গিণী অনেক বুঝাইয়া জানাশুনা একজন মেয়েলোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল এবং বাপের বাড়ীতে পা দিয়াই সব কথা খুলিয়া লিখিয়া বিরাজকে একখানা পত্র দিবার জন্য মাথার দিব্য দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিল।

প্রভাতে প্রকৃতি আবার শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কত দিনের পর সূর্য্য দেখা দিয়াছে, কিন্তু কিরণের বেশ তেজ নাই; তখনও নীল আকাশের মাঝে মাঝে নীল সমুদ্রের বক্ষে ফেনা-জমাটের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা শাদা শাদা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

কাত্যায়নীর মুখের ভাবটাও কতকটা সেইরূপ। কমলা তাঁহার দুঃস্বপ্ন, দুরদৃষ্ট, কণ্ঠলগ্ন কণ্টক—সে দূর হইয়াছে, তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিয়াছে; কিন্তু সে হাসিটার বেশ জোর ছিল না। তাঁহারও প্রফুল্ল মুখের উপরে মাঝে মাঝে যেন কি একটা দুর্ভাবনার ছায়া ভাসিতেছিল।

মোহিনী প্রভাতে বাহির হইয়া কমলার বাপের বাড়ী যাওয়ার সংবাদ আনিয়া দিবার পর হইতেই কাত্যায়নীর মনটা যেন কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। মধ্যাহ্নে তিনি মোহিনীকে ডাকিয়া লইয়া নিজ কক্ষে

প্রবেশ করিলেন এবং 'কর্ত্তা' ফিরিলে কমলার পলায়ন-সংবাদটা কি ভাবে প্রকাশ করিলে সুবিধা হয় সেই বিষয়ের একটা পরামর্শ করিতে বসিলেন।

মোহিনী শুধু তাঁহার পরিচারিকা নহে ; পরকীয় রহস্য আহরণে সে তাঁহার চর, সংবাদ পরিচালনায় দূতী, কার্য্যবিশেষে দাসী, করণীয় বিষয়ে মন্ত্রী—আর তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতিতে রঙ্গরস যদি সম্ভব হইত, তবে 'রঙ্গে সখী'ও বলা যাইতে পারিত।

মন্ত্রণা অনেকক্ষণ ধরিয়া হইল। সিদ্ধান্ত কি হইল কে জানে ? সকলে দেখিল, কাত্যায়নীর মুখের মেঘটা সম্পূর্ণ কাটিয়া গিয়াছে—তাহা অস্বাভাবিক প্রফুল্ল ! আর মোহিনীর মুখের ভাবটা অস্বাভাবিক গম্ভীর !

মোহিনী অপরাহ্নে অন্যান্য দাসদাসীকে কুড়েমির জন্য বকিতে বকিতে একটা জলপূর্ণ কলসী লইয়া তাহার জলটুকু সব গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত একটা যূথিকার মূলে ঢালিয়া দিল। শ্রাবণ মাস—যূথিকা মনুষ্যের জল সেক চাহে না, কিন্তু মোহিনী চাহে শূন্য কুম্ভ, সে তাহা লইয়া গঙ্গাজল আনিতে বাহির হইল।

সাধারণে যে ঘাট ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার কিছু দূরে বহুকালের একটা বাঁধা ঘাট ছিল। তাহার ধাপগুলি সবই পোকায় খাওয়া দাঁতের মত ক্ষয়া ক্ষয়া আর বহুবিধ আবর্জ্জনায় পূর্ণ। ঘাটে যাইবার পথের দুই দিকেই বন—পথও খুব সঙ্কীর্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন। নূতন ঘাট ছাড়িয়া কেহই সে ঘাট ব্যবহার করে না। মোহিনীর কিন্তু সেই ঘাটটি ভিন্ন অন্য ঘাটের জল পছন্দই হয় না। ঘাট ভেদে জল ভিন্ন হয় না ; কিন্তু কেহ জল তুলিবার জন্যই ঘাটে আইসে, আবার কেহ বা ঘাটে আসিবার জন্যই জল তুলিয়া থাকে। হীরালাল প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই ভাঙ্গা ঘাটে

একাকী বসিয়া বায়ু সেবন করে। মোহিনীর প্রয়োজন তাহার সঙ্গে দেখা করা।

মোহিনীর মূর্ত্তিটা যে কাহারও মন মুগ্ধ করিবার মত নহে সে কথা এক রকম বলা হইয়াছে ; তবে বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। তাহার খর্ব্ব তনু কৃশ, হ্রস্ব কেশ বিরল, বিশাল ললাট সানুতটের মত উন্নত, ভ্রূদেশ নূতন খাতের অজাততৃণ পাহাড়ের মত উচ্চ ও অলোম। ওষ্ঠের কিছু উপরেই কর্কটবিবরানুকারী রন্ধ্রমাত্রোপলক্ষিত নাসা। ওষ্ঠাধর কাফ্রি জাতীয়ার মতই স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ। ওষ্ঠক্রোড়ে বা অধরবক্ষে বন্ধুর ও দীর্ঘ দশন-পঙ্‌ক্তি মেঘ-বক্ষে বলাকাশ্রেণীর শোভা মনে তুলিয়া দেয়! বর্ণটা তাহার পাথুরে কয়লার মতই ছিল, সে যে কি করিয়া সেটাকে বায়সের বক্ষো বর্ণের মত পাংশুকৃষ্ণে দাঁড় করাইয়াছিল তাহা বলা যায় না ; তবে তাহাকে জামা বা রুমালে সাবান দিতে দিলে, সাবান কখন একটুও ফিরে না, অথচ ময়লা যেমন তেমনই থাকে। সে যেদিন দুধ জ্বাল দেয়, কাত্যায়নী তাহার পর দিনেই দুধে সর পড়ে নাই বলিয়া গোয়ালাকে ভর্ৎসনা করেন। আর ঝোল তাড়াতাড়ি গাঢ় করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী যেখানে যত ময়দা লুকাইয়া রাখেন দরকারের সময় দেখিতে পান না। এই সকল ব্যাপারের সহিত মোহিনীর বর্ণবিবর্ত্তের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা অনুমেয়।

আপনারা তাহাকে যতই কুৎসিত বলুন, সে কিন্তু আপনাকে একটুও তাহা মনে করে না। এ দোষটা বোধ হয় শুধুই মোহিনীর একার নহে, আত্মবিষয়ে মানুষের কেমন একটা অনুরাগ-মোহ থাকে তাহাতে আপনার কোন কিছু কেহই মন্দ মনে করে না। ভাল হউক বা মন্দ হউক এ মোহটা না থাকিলে কিন্তু আমরা অনেকের মুখ দেখিতে পাইতাম না,

অনেকের বক্তৃতা ও গান শুনিতে পাইতাম না এবং এই প্রকারের অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিও অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইত।

মোহিনী আদর্শতলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবে—"রংটা কালোই ভাল; এই যে কেষ্ট ঠাকুরের—শ্যামা ঠাক্‌রুণের এই জগৎ আলো করা কালো রং! কটা রংটা কি?—গাময় যেন কুঠ হ'য়েছে ব'লে মনে হয়!—মুখের মাঝখানে পাহাড়ের মত একটা উঁচু নাক আর তবলার চাঁদীর মত দুটো বড় বড় চোখ কি ভাল?—ছিঃ! বড় নাক নিয়ে উপুড় হ'য়ে শোবারই জো নেই—থ্যাব্‌ড়া নাকের কোন জ্বালাই নেই।—দাঁত যদি ঠোঁটেই ঢাকা রইল তবে আর তার বাহারটা কি? হাস্‌লে দাঁত বেরিয়ে পড়ে তাই হাসিমুখ দেখ্‌তে ভাল; আমার মত যাদের দাঁত একবারও ঠোঁটে ঢাকা পড়ে না তাদের মুখ কতই সুন্দর—যেন সদাই হাস্‌ছে!"—ইত্যাদি নানা প্রকার যুক্তির বলে মোহিনী আপনাকে অসাধারণ সুন্দরী মনে করিয়া থাকে।

একটা বিষয়ে মোহিনীর বড় ক্ষোভ ছিল। কেহ তাহাকে ভালবাসে না, আদরযত্ন করে না, এমন কি তাহার নামটি পর্য্যন্ত কেহ ভাল করিয়া বলিতে চাহে না—পরোক্ষে 'মনী দাসী' ও সমক্ষে 'মনী' ভিন্ন কেহ তাহাকে 'মোহিনী' পর্য্যন্ত বলিত না। হীরালাল কেবল তাহার পুরা নাম ধরিয়াই ডাকিয়া থাকে। মোহিনী হীরালালের সেই মৌখিক সাদর সম্ভাষণকেই আন্তরিক প্রীতির আহ্বান ভাবিয়া লইয়া আনন্দে গলিয়া যায়। নীলকমলের গৃহচ্ছিদ্রান্বেষী হীরালাল তাঁহার ঘরের কথা শুনিতে ভালবাসে, ভালবাসার কাঙ্গালিনী মোহিনী দিনান্তে একবার গঙ্গাজল আনিবার ছলে হীরালালের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সেই সব কথা শুনাইয়া আইসে এবং তাহাতেই যেন কেমন একটু আনন্দও পায়। দুষ্ট লোকে তাহার সে নির্দ্দোষ

আনন্দটুকুতেও কুদৃষ্টি দিয়া থাকে। তাহার গঙ্গাজল আনা লইয়া তাহারা নানা প্রকার কল্পনা ও জল্পনা করিয়া থাকে, এমন কি তাহার সম্বন্ধেই তাহা লইয়া কতজন কত পরিহাসও করিয়া থাকে। কিন্তু—"ন কামবৃত্তির্ব্বচনীয়মীক্ষতে"—মোহিনী সেসব কথায় কর্ণপাত করিত না।

হীরালাল প্রতিদিনের মত আজিও সন্ধ্যার সময়ে সেই ভাঙ্গা ঘাটটিতে বসিয়া, আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময়ে অদূরে প্রত্যক্ষ সন্ধ্যারূপিণী মোহিনীর আবির্ভাব হইল।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই হীরালাল গান বন্ধ করিয়া প্রফুল্লমুখে বলিল,—"অয়ি মনোমোহিনি—কুলালকুলবৈজয়ন্তি—জন-নয়নচকোরানন্দেন্দুলেখে! বড়বাড়ীর কি সংবাদ?"

মোহিনীর উপর পাটার কয়েকটি সম্মুখের দাঁত স্বভাবতঃই বাহির হইয়া থাকিত—তাহার বিপুল ওষ্ঠাধরেও ঢাকা পড়িত না। অবশিষ্ট যেগুলি তাহার আস্যবিবরে লুকাইয়া থাকিত, হীরালালের সাদর-সম্ভাষণে সেগুলিও আমূল বিকাশ লাভ করিয়া তাহার দংষ্ট্রাকরালাস্যের বীভৎস-ভীষণতা পরিস্ফুট করিয়া দিল। গুঞ্জাবিগঞ্জিত নেত্রে কটাক্ষ যতদূর সম্ভব হইতে পারে তাহাতেই হীরালালকে বিদ্ধ করিয়া—অথবা বিদ্ধ করিল ভাবিয়া মোহিনী বলিল, "আহা—বৈঠকখানায় চামচিকে নাচ্‌তেছে আর ঘাটে ব'সে বাবুর গান হ'চ্ছে!—শুন্‌ছে কে তার ঠিকানা নেই!"

হীরালাল। সব জিনিস সবার জন্যে নয়, মনমোহিনী! তোমার রূপ যেমন শুধু আমার চোখের জন্যে—আর কেউ তা দেখ্‌তে পায় না, আমার গানও তেমনি শুধু তোমার জন্যে আর কেউই তা শুনতে পায় না—

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে এখানে বসিয়া থাকি,
যেদিন না হেরি ও চাঁদবদন মরমে মরিয়া থাকি।

এখন খবর কি বল দেখি ?

মোহিনী ভাবিতেছিল, তাহার রূপ সার্থক, তাহার ঘাটে আসার শ্রম—ভরে আসার ক্লেশ—দাসীপণার দুঃখ, সব সার্থক। তাহার সে অবস্থাটা স্বপ্ন কি জাগরণ তাহাই যেন সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল যেন তাহার শরীরটা বরফের মত একটু একটু করিয়া গলিয়া জল হইয়া যাইতেছে।

মোহিনী সে গলিয়া যাওয়ার ভাবটা একটু সামলাইয়া বলিল, "খবর মন্দ নয়—একটা কাজ ক'রতে পারবেন ?"

হীরালাল। কি শুনি আগে।

মোহিনী। পারেন ত বলি।

হীরালাল। আমি পারি না এমন কি আছে—কারুকে ওষুধ বিষুধ ক'রতে হবে—না আর কিছু ?

মোহিনী একবার চারিদিকটা চাহিয়া লইয়া, আপনার উল্কিকলঙ্কিত কৃষ্ণচন্দ্রানন হীরালালের মুখের কাছে আনিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিতে লাগিল। তাহা শুনিতে শুনিতেই হীরালালের পরিহাস ও প্রফুল্লতা একেবারে নিভিয়া গেল।

মোহিনীর কথা শেষ হইলে হীরালাল বলিল "দূর! তা কি ক'রে হবে—সবাই জানে না ?"

মোহিনী। তাই জন্যেই ত ব'লতে চাই নি—শুধুই কথার ভট্‌চাজ্জী ?

হীরালাল কোমরে হাত দিয়া, নীরবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, "তবেই পেরেছেন—আপনার কর্ম্ম নয়" বলিয়া,

মোহিনী জল আনিতে নামিতেছিল ; তাহাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাইবার জন্য হীরালাল তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা মোহিনীর বাম হস্ত !

এই অনাচরিতপূর্ব্ব অবৈধ স্পর্শে অন্য দোষ যাহাই হউক, মোহিনীর বাম হস্তের উপরে হীরালালের এই অতর্কিত অত্যাচারটা একটা ভারী মুশ্‌কিল ঘটাইয়া দিল। আকস্মিক আকর্ষণে মোহিনীর বাম হস্তটা যেমন একটু সরিয়া পড়িল, অমনি তাহার কক্ষচ্যুত শূন্য কুম্ভ—"সোপানমারুহ্য চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠঃ"—ইত্যাদি, তার পর একেবারে জলে !

মোহিনী অবাক্। হীরালাল অপ্রতিভ। কুম্ভ ওদিকে স্রোতে ভাসমান ! তাড়াতাড়ি জলে নামিতে গিয়া মোহিনী প্রথমেই শৈবালব্যাপ্ত পিচ্ছিল সোপানতটে আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল, চেতন অচেতন যে যেখানে আছে সকলেই তাহার পতনে হাসিতেছে। হীরালালও সে হাসিতে যোগ দিয়াছে কি না তাহা দেখিবার অবসর পাইল না—উঠিয়াই তাড়াতাড়ি গিয়া জলে পড়িল।

মোহিনী সন্তরণ দ্বারা বহুকষ্টে কুম্ভের উদ্ধার সাধন করিয়া আর্দ্র বসনে ফিরিবার সময়ে হীরালালের দিকে চাহিয়া তাহার অসমিক্ষ্যকারিতার অপরাধে বলিল, "ছিঃ !"—আর কাজের কথায় বলিয়া গেল,—"যদি পারেন তবে যেন আজই গিয়ে গিন্নী-মার সঙ্গে দেখা করেন !"

মোহিনী সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশিয়া গেল। হীরালাল পুনর্ব্বার ভাগীরথীর সেই প্রদোষতিমিরাচ্ছন্ন নির্জ্জন সোপানতটে বসিয়া বহুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া নীল-কমলের গৃহে প্রবেশ করিল।

৯

নীলকমল পর দিনেই বাড়ীতে আসিলেন। তিনি জলযোগান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে গড়গড়ার নলটি লাগাইয়া মুখে দিবেন এমন সময়ে কাত্যায়নী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখখানি আজ বড় গম্ভীর! কোন কথা না কহিয়া তিনি বাম হস্তের দুইটি অঙ্গুলিতে নথের মুক্তাটিকে ধীরে ধীরে সরাইতে লাগিলেন।

নীলকমল তামাকুটা একটু ধরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি, গিন্নী—মুখে কথা নেই কেন?"

কাত্যায়নী মিহি স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "খবর খুব চমৎকার!"

নীলকমল শোষটানের ধোঁয়াটুকু নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "কি রকম?"

কাত্যায়নী। এই তোমার গুণের বউমা গো—বউ মা ব'লতে অজ্ঞান হও যে!

নীলকমল। হাঁ, তার হ'য়েছে কি—তিনি কিছু ক'রেছেন?

কাত্যায়নী। ক'রবেন আর কি—তোমার মুখখানাকে খুব উজ্জ্বল ক'রেছেন!—শুনবে এখন লোকের মুখে।

নীলকমল। তার আগে তোমার মুখেই একটু শুনে রাখি না; ব্যাপারটা কি বল দেখি?

কাত্যায়নী। তা ভাল—তুমি যেদিন গেলে সেই দিন হয় কি তার পর দিনই হয়—কোথাও কিছু নেই আমার সঙ্গে ঝটাপটী ঝগড়া! সে কি মুখের দৌড়! মুখে ত যা এল তাই বল্লে! ব'লুক্—ভগবান্ আছেন, মুখের শাজা দেবেন!

নীলকমল। কি ব'ল্লেন ?

কাত্যায়নী। সে কটিই বা মনে আছে আর কটিই বা ব'ল্ব ?—তাই মরুক, যা ব'ললি—যা ক'রলি ঘরেই কর !—রাগ ক'রে বউমানুষের একলা বাপের বাড়ী চ'লে যাওয়া কি গো ?—রাত্তির কাল—আর সে কি মেঘ, ঝড়, বিষ্টি, অন্ধকার ! সাপ্‌টানিতে এঘরের মানুষ ওঘরে যেতে ভয় পায় ! সঙ্গে মেয়ে-নোক নেই, পাল্কী নেই—এ সব কি ?

নীলকমল কিছুক্ষণ তামাকু টানিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বল কি ! —একাই চ'লে গেলেন ?"

কাত্যায়নী। হয় না হয়, বাড়ীতে ত আরও মানুষ ছেল—জিগ্‌গেসাই কর না।

তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী ছায়ার মত নিঃশব্দে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছিল র‍্যা—মনী ?"

মোহিনী। হবে আবার কি—খানকাই ! ব'ল্লে পিত্তায় যাবেন না—সে কি মুখের তোড়্‌ ! দেখে শুনে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যায় ! থাকৃতেন ত দেখ্‌তেন !

কাত্যায়নী। আমি সবই মিছে বলি আর কি ! তবু সতিন্‌পোর বউ নয়। এত নোকের মরণ হয় আমার মরণ নেই—মুখপোড়া যম যেন একেবারে ভুলে গেছে !

কাত্যায়নী নির্ব্বেদবচনের শেষে অভিমানাশ্রু মোচন করিতে আরম্ভ করিলেন।

গৃহিণীর চক্ষের জল যিনি কখন দেখেন নাই তিনি বুঝিবেন

না ইহার কি মহিমা। বৈদান্তিকী ব্রাহ্মী মায়ার মত ইহার শক্তিও 'অঘটন-ঘটনপটীয়সী'—ইহার প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।

মোহিনীর সাক্ষ্যদানের পরেও নীলকমলের মনে যেটুকু সংশয় ছিল, গৃহিণীর অশ্রুতে সেটুকু ক্ষালিত হইয়া গেল। তিনি বিনা প্রতিবাদে সব কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাই ত এমন ছোট লোকের মেয়ে ঘরে আনা গিয়েছিল যে বাড়ীতে একটি দিনের জন্যেও শান্তি নেই!"

অশ্রুতে 'কত্তা'র মনটা ভিজিয়াছে বুঝিয়া কাত্যায়নী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, স্বকপোল-কল্পিত পদাবলীতে বিবিধ অলঙ্কার যোগ করিয়া পুত্রবধূর অপরাধ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কমলার সামান্যদোষাখ্যানেও অতিশয়োক্তিই হইল কাত্যায়নীর স্বভাবোক্তি, এবার বিষয় যেমন গুরুতর বর্ণনাও তদনুরূপই হইল; তবে অলঙ্কার আগাগোড়াই অপহ্নুতি। উপসংহারে তিনি নিজের স্থির সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, সে দুর্ব্বিনীতাকে যদি পুনর্ব্বার গৃহে লইবার ব্যবস্থা হয় তবে তিনি আর সে গৃহে অন্ন জল গ্রহণ করিতে থাকিবেন না—উদ্বন্ধনে, বিষপানে অথবা প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবেন।

মোহিনী প্রভু-পত্নীর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার যথাসাধ্য প্রশংসা করিয়া বলিল, "ওগো আমি তবু কত ব'ল্লুম যে, বউদিদি, কত্তা বাবুর আসা অব্‌ধিও না থাক, রাত্তিরটে পোয়াতে দাও, পাল্কী ডেকে দোব—সকালে যেও! ও বাবা! মেয়ে যেন উল্কোপাত! কার বাপের সাধ্যি ধ'রে রাখে! হ্যাঁ গা! ভদ্দর ঘরের বউ, তায় সমথ বয়েস্, তায় রাত্তির্ কাল, তায় মেঘ, অন্ধকার, ঝড়, বিষ্টি! আর তাই কি এপাড়া ওপাড়া গা? ও মা! এক

রাজ্যি ! ধন্যি মেয়ে বাবা ! আর বুকের পাটাও ধন্যি ! এখন পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে না ? কা'র মুখে সরা চাপা দোব গা ?"

নীলকমল বৃদ্ধবয়সে বিপত্নীক হইবার আশঙ্কায় কতদূর শঙ্কিত হইয়াছিলেন বলা যায় না ; তবে মোহিনীর শেষকথাগুলিতে তিনি কিছু বিচলিত হইলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না ; কিন্তু সামাজিক ব্যবহারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতেন। যাহাতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কহিতে না পারে সেই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া, সেই দিনেই লোক পাঠাইয়া বিরাজ ও সুধাংশুকে বাড়ীতে আনাইলেন।

* * * * *

নীলকমলের ইচ্ছা ছিল না উক্ত বিষয়ের কোনরূপ তদন্ত করেন ; কিন্তু সুধাংশু বড় একগুঁইয়া আর অবুঝ—তাহার জন্যই গোপনে গোপনে কিছু তদন্ত করিতে হইল। তাহাতে তরঙ্গিণী যাহা বলিল, সে কথা সে যাহাদের যাহাদের নাম করিয়াছিল, তাহারা কেহই বলিল না। সুতরাং তাহার কথা মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইল।

তরঙ্গিণী অনেক কাঁদিল, স্বামীর পায়ে মাথা কুটিল, উপবাস করিল, কিন্তু হীরালালকে কিছুতেই সত্য কথা বলাইতে পারিল না।

নীলকমল একদিন উপরের দালানে পরিবারবর্গকে একত্র করিয়া বিচার করিতে বসিলেন। সুধাংশুর সঙ্গে তাঁহাকে অনেক বিতর্ক করিতে হইল। তাহার শেষে তিনি এই রায় প্রকাশ করিলেন— "তিনি (কমলা) যে কাজ ক'রেছেন, তাতে তাঁকে একেবারে পরিত্যাগ করাই উচিত ; তা একবারেই ততটায় কাজ নেই। এখন তিনি বাপের বাড়ীতেই থাকুন, তারপর সমাজের ভাবগতিক বুঝে তখন যেমন

হয় করা যাবে। কিন্তু তাদের সঙ্গে এখন আর আমাদের কোনও সংস্রব রাখা চ'ল্‌বে না—চিঠি পত্র পর্য্যন্ত না—বুঝেছ বিরাজ ?"

বিরাজ এতক্ষণ একটা দ্বারের পার্শ্বে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল, কোন কথা কহে নাই ; এখন পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নতমুখে শুধু বলিল, "যে আজ্ঞে।"

কাত্যায়নী অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে মোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। নীলকমল ফড়াৎ ফড়াৎ করিয়া চোঁয়া তামাকের ধোঁয়া টানিতে লাগিলেন।

সুধাংশু অস্থিরপদে বারাণ্ডায় পাইচালি করিতেছিল ; বিরাজের 'যে আজ্ঞে' শুনিয়াই সে দ্রুতপদে নামিয়া একবারে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

তরঙ্গিণী কোথায় ছিল, সুধাংশুকে হন্ হন্ করিয়া একমনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, তাহার পশ্চাতে একটু ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিচারে কি দণ্ড হ'ল, ঠাকুরপো ?"

"যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন" বলিয়াই সুধাংশু চলিয়া গেল—ফিরিয়া চাহিল না। তরঙ্গিণীও চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

১০

কয়েকদিন বৃষ্টি হয় নাই। আকাশ মেঘমুক্ত—নির্ম্মল। পশ্চিম দিগন্তে কেবল একখানা শাদা মেঘ স্থির হইয়া ঝুলিয়া ছিল। দিগন্তের তরুগুলি মেঘের কোলে মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সন্ধ্যার রবি তরুমালার পশ্চাতে নামিয়া সেই শুভ্র মেঘ-পটে বিবিধ বর্ণের বহুবিধ চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল। সুধাংশু গঙ্গাতীরে আসিয়া, সেই অস্তমিত সূর্য্যের বিলীয়মান বর্ণচ্ছটার প্রতি নির্ণিমেষনেত্রে চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া

জল। দুই বিন্দু অশ্রু কখন তাহার নয়নপ্রান্তে সঞ্চিত হইয়াছিল—ঝরিয়া পড়ে নাই। সে তাহা মুছিয়া ফেলিতেও চেষ্টা করে নাই—তাহা ধীরে ধীরে চোখের কোলেই মিলাইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে বিরাজ আসিয়া তাহার পাশে বসিল। সুধাংশু তাহা জানিতে পারিয়াও ফিরিয়া চাহিল না, যেমন পরপারে চাহিয়া বসিয়া ছিল সেই ভাবেই বসিয়া রহিল।

বিরাজ সুধাংশুর কাঁধে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে যে বড় ডেকে এলি নি, সুধা?"

সুধাংশু মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর করিল, "তখন অনেক বেলা ছিল।"

বিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ইচ্ছে ছিল না তাই বল না! আমার ওপরে রাগ, হ'য়েছে—নয়? তুই একটা ভারী পাগল!"

সুধাংশু কোন কথা কহিল না। বিরাজ পুনরপি বলিল, "এ যে তোর অন্যায় রাগ, সুধা! ঘর ক'রতে এমন কত হয়, তাই ব'লে কোন্ গৃহস্থের বউ স্বামী বা শ্বশুরের অপেক্ষা না ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে যায়? বেশ হ'য়েছে—যেমন বুদ্ধি তেমনি হ'য়েছে!"

সুধাংশু তথাপি নীরব। বিরাজ আবার বলিল, "আর হ'য়েছেই বা এমন কি?—বাপের বাড়ী যাবার জন্যেই যে পাগল, তার পক্ষে সেখানে প'ড়ে থাকাটা দণ্ডই নয়—বরং পুরস্কার।"

সুধাংশু একবার বিরাজের দিকে চাহিয়া আবার দূরে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বিরাজ তাহার উদাসীনভাবে ব্যথা পাইয়া তাহাকে আপনার কাছে একটু টানিয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা—আমার ওপরে তোর রাগ কেন—আমি কি ক'রেছি?"

সুধাংশু তথাপি কোন কথা কহিল না, একটা কাঠী কুড়াইয়া লইয়া,

মাটীতে গোটাকতক দাগ কাটিয়া কাটীটাকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বিরাজ। আচ্ছা—তোর কি বিশ্বাস বড় বউঠাক্‌রুণের একার কথাই সত্যি, আর সকলেই মিছে কথা ব'ল্‌ছে? তাই না হয় বিশ্বাস ক'রলুম; কিন্তু সে নিজেও কি নিজের বিরুদ্ধে মিছে ক'রে লিখ্‌বে? তার চিঠি ত তোকে দেখিয়েছি!"

সুধাংশু এইবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিরাজের কথার উত্তরে বলিল, "মিছে ক'রে লিখ্‌বেন কেন, তা ব'ল্‌তে চাই না। তবে সে চিঠীর কথাগুলি যে সত্যি নয় তাতে আমার এক তিলও সংশয় নেই।"

বিরাজ হাসিয়া বলিল, "তার মানে সুধাংশু পাগল বই আর কিছুই নয়! না—সুধা! বুদ্ধির দোষে আর যাই করুক, মিথ্যেটা একেবারেই তার স্বভাবের বিরুদ্ধ।"

সুধাংশু তীব্রস্বরে বলিল, "তা আমিও জানি, দাদা! আপনার জন্যে তিনি মিছে ক'রে কিছু ব'ল্‌তে চান্ না; কিন্তু যে সত্যির ফলে গৃহবিবাদ, মাতা পুত্রে বিচ্ছেদ, সুখের সংসারে অশান্তি, সে সত্যিও যে তাঁর কাছে মিথ্যের চেয়েও অধম তা কি তুমি এত দিনেও বুঝ্‌তে পার নি? এই কয় বৎসর ধ'রে তাঁর মাথার ওপর দিয়ে কত ঝড় ব'য়ে গেছে, সেকথা কে জানে—কে শুনেছে? ঘুণাক্ষরেও কি তিনি সে সব কথা কখনও প্রকাশ ক'রেছিলেন?"

সুধাংশু একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব হইল। বিরাজও উত্তর করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। দুই জনেই নীরবে বসিয়া রহিল। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ চলিয়া গেল।

নীল গগনে এক একটি করিয়া তারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তীর-ভূমিতে প্রদোষের ছায়া নামিয়া আসিল। তীর-বনরাজির মধ্যে রাত্রির

অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। তথাপি কেহ গৃহে ফিরিবার চেষ্টা করিল না—কোন কথাও কহিল না। দুই জনেই গভীর চিন্তায় মগ্ন।

মনের ভাব কেহ অধিকক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে না ; দেহের দূষিত রক্তের মত তাহা কোন না কোন প্রকারে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কথায় ব্যক্ত না হইলেও মনের ভাব অনেক সময়ে মুখের ভাবেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। বিরাজের মুখখানিও আর পূর্ব্বের মত তেমন প্রফুল্ল ছিল না।

ছোট ছেলে ছুটাছুটি করিতে করিতে পড়িয়া গিয়া কাঁদিলে তাহার জননী রাগ করিয়া বলিয়া থাকেন, "বেশ হ'য়েছে—খুব হ'য়েছে—ছুটোছুটী ক'রতে মানা করি যে!" তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে কিন্তু শিশুর পতনব্যথা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক একটা বেদনা প্রচ্ছন্ন থাকে। বিরাজের এই— "বেশ হ'য়েছে—যেমন বুদ্ধি তেমনি হ'য়েছে" ইত্যাদি কথাগুলিও যে সেই রকমের নহে তাহা কে বলিবে?

বিরাজ কখন গঙ্গার সুদূর বক্ষে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "মানবের অদৃষ্ট ঠিক্ ঐ তরঙ্গের মতই চঞ্চল!" কখন বা দূর গগনে চাহিয়া মনে করিতেছিল, "মানুষের সুখ ঠিক এই প্রদোষের নক্ষত্রভাতির মতই অস্থিরপ্রকাশ!" এই তুচ্ছ ব্যাপার কোথায় কতদূরে গিয়া পড়িবে—ইহা হইতে আরও কত কি অনর্থ মাথা তুলিবে, তাহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার মুখের ভাবে সে আকুলতারও একটা ছায়া পড়িয়াছিল।

সুধাংশু যদি বিরাজের কথায় প্রত্যয় না করিয়া তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিত যে, তাহারও

অন্তরে দুঃখের একটা মৃদু স্রোত ফল্গুর প্রচ্ছন্ন পয়ঃপ্রবাহের মত লুকাইয়া বহিতেছিল।

অনেকটা রাত্রিতে দুই জনে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পথেও আর কোন কথা হইল না। ইহার পরদিনেই দুই জনে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

বেলাভূমিতে বসিয়া সাগরের সুদূর বক্ষে চাহিয়া থাকিলে দ্রুতগামী জাহাজগুলিও যেন গতিহীন বলিয়া মনে হয়। অপেক্ষার কাল যাহার নিরবধি দিন রাত্রিগুলিও তাহার পক্ষে সেইরূপ। সময় তাহার পক্ষে বেগবতী গিরিনদীর খরপ্রবাহ নহে—স্থির, অনন্ত সমুদ্র।

শ্রাবণ মাসে কমলা বাপের বাড়ী আসিয়াছে; তাহার পর কত মাস চলিয়া গেল আজিও শ্বশুর বাড়ী হইতে কেহ তাহার উদ্দেশ লইল না। তাহার দিন যেন আর যায় না—দুরন্ত শিশুর বিদ্যালয়াবস্থান-সময়ের ন্যায় অথবা কারারুদ্ধের দণ্ড-কালের ন্যায় যেন ফুরাইতে চাহে না। দিন যদি বা কাজে ও কথায় কোন রকমে চলিয়া যায়, রাত্রি যেন আর যাইতে চাহে না—পীড়িতের নিদ্রাহীন রজনীর ন্যায় প্রভাত হইতে চাহে না।

কমলা আসিয়াই তরঙ্গিণীর উপদেশ মত বিরাজকে একখানা পত্র লিখিয়াছিল, আসিবার কারণটা কিন্তু সত্য লিখিতে পারে নাই। পত্রের উত্তর পাইবার আশায় মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত প্রত্যহই সে স্নানবিমুক্ত কেশদামের জটিলতা মোচনের ছলে পথের দিকের জানালাটি একটু খুলিয়া পথ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার চঞ্চল দৃষ্টি যেন কোন প্রিয়াপেক্ষিণী অদূরগমনশীলা পুরাঙ্গনার ন্যায় জনসঞ্চারশূন্য পথে কিয়দ্দূর ছুটিয়া যায়, তখনই আবার সসঙ্কোচে ফিরিয়া আইসে।

দীর্ঘকাল এইরূপ বৃথা অপেক্ষায় থাকিয়া, শ্রান্ত হইয়া দিবাশেষে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করে।

কমলা এক দিন সেইরূপে পত্রবাহকের পথ চাহিয়া নিজের ঘরটিতে দাঁড়াইয়া ছিল। পার্শ্বের কক্ষে হরকুমার সূর্য্যনারায়ণের নিকটে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার মধ্যে সে কমলার শ্বশুর-শাশুড়ীর আচরণের কথা তুলিয়া বলিল, "এ কাজটায় আপনি ভারী ভুল ক'রে ফেলেছেন—বেশী খোঁজা বাছা ক'রলেই এই রকম হয়।"

সূর্য্য। কেন—বাছাটা কি কিছু মন্দ হ'য়েছিল, হর?

হর। ফলে ত কিছুই ভাল দেখা গেল না।

"সে আর কার দোষ বল—যা দেখা যায় না তার উপরে ত আর কারও হাত নেই" বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

হরকুমার হাসিয়া বলিল, অদৃষ্টই যদি মানেন তবে ততদিন ধ'রে তত খুঁজে বেড়িয়েছিলেন কেন?"

সূর্য্য। খোঁজার উদ্দেশ্য কি আমার সিদ্ধ হয় নি? রূপ, গুণ, কুল, শীল, অর্থ, বিদ্যা, বাপ মা দুই থাকা—এত গুলি একত্র আর কোন পাত্রে খুঁজে পেয়েছিলাম?

হর। সবগুলিই যে পেতে হবে এমন কি কথা আছে, যেগুলির বিশেষ দরকার তা ত না খুঁজেও ঘরে ব'সেই পেয়েছিলেন! সব সময়ে সব কাজ নিজে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। এই জন্যেই এসব কাজ লোকে পাঁচ জনের সঙ্গে যুক্তি ক'রেই ক'রে থাকে। আপনি ত তা করেন নি!

সূর্য্যনারায়ণ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি যে ভুলক্রমে এ কাজটা ক'রে ফেলেছি—কি আমার বিবেচনার কিছু ত্রুটি হ'য়েছে, এমনটা

এক দিনের জন্যেও আমার মনে হয় না। তবে আমার এ অকৃত-কার্য্যতায় কেউ কেউ যে বিশেষ আনন্দিত—সেটা বেশ বুঝ্‌তে পারি। এক জনের চাওয়া জিনিস তাকে না দিয়ে যদি আর এক জনকে দেওয়া হয়, আর তা'তে কোন রকমের একটা কিছু একটু বিঘ্ন ঘটে, তা'তে যে চেয়ে পায় নি তার যেন একটু আহ্লাদ হয়। সে আহ্লাদটা কিন্তু নীচ অন্তঃকরণেরই পরিচয় দেয়—নয় কি ?"

হরকুমারের মুখখানা আকর্ণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে মৃদু হাসিতে সে ভাবটা ঢাকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার কিছু বলিতে যাইতেছিল, সূর্য্যনারায়ণ তাহাকে সে অবসর না দিয়াই একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "থাক্—এ সম্বন্ধে আর কোন কথায় কাজ নেই, হর !—আমি তোমাকে ভালবাসি।"

হরকুমার অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল। কিছুক্ষণ দেনা পাওনা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা কহিয়া সে চলিয়া গেলে, কমলা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল, "হরদাদা দেনা পাওনার কথা কি ব'ল্‌ছিলেন, বাবা ?"

সূর্য্যনারায়ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা আর তোমার শুনে কাজ কি, মা !"

কমলা। তোমার পাওনার কথা হ'লে আমি শুনতে চাইতুম না ; তোমার দেনা ত সব আমার জন্যেই, বাবা! শোধ ক'রতে না পারি শুনতেও কি নেই—কত ? তুমি না বল আমি সব শুনেছি। বাস্তভিটে পর্য্যন্ত নষ্ট করেছ, বাবা ! সত্যি সত্যিই কি শেষদশাটায় তুমি আমার জন্যে পথে ব'স্‌লে ?

কমলার চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নীরবে তাহাকে অশ্রু মার্জ্জন করিতে দেখিয়া সূর্য্যনারায়ণ বলিলেন, "ছিঃ !—চোখের জল

ফেল্‌তে নেই, মা! কেন, তা'তে আর হ'য়েছে কি? এইবার একবার তোমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পার্‌লেই আমি যে ক'টা দিন বাঁচ্‌ব একটা তীর্থে গিয়ে থাক্‌ব। দুঃখ এই যে এত ক'রেও তোমাকে সুখী ক'র্‌তে পারলুন না!"

সূর্য্যনারায়ণ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন। কমলা অশ্রু মুছিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "না—বাবা! দেনা রাখা ভাল নয়; জমীজমা, বাস্তুভিটে সব বেচেও না কুলোয় আমার যে ক'খানা গয়না আছে বেচে তুমি হরদাদার দেনা শোধ কর। কিছু থাকে, নিয়ে চল একটা তীর্থে চ'লে যাই!—তুমি পূজো আহ্নিক নিয়ে থাক্‌বে, আমি তোমার সেবা শুশ্রূষা নিয়ে থাক্‌ব!"

সূর্য্যনারায়ণ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "পাগল মেয়ে! কিছুই ক'রতে হবে না, মা! আমি মনে ক'রেছি একদিন গিয়ে বিরাজের বাপের সঙ্গে দেখা ক'রব—তার সঙ্গে দেখা করা মিছে। পত্র লিখ্‌লাম তার ত কিছু জবাব্‌ই দিলে না!"

কমলা। না—বাবা! তুমি কা'রও কথা সইতে পার না; আমি মিছে জন্মেছিনু, তোমার কিছুই ক'র্‌তে পারলুম না—শুধু তোমার দুঃখের ভারই ভারী ক'রে দিচ্ছি। তা ব'লে যে তুমি আমার জন্যে অপমান হ'তে কোথাও যাবে, তা আমি প্রাণ থাক্‌তে দোব না। আর আমি জানি তা'তে কিছুই হবেও না।

সূর্য্যনারায়ণ—"তোমার সুখ দুঃখের চেয়েও কি আমার মান অপমান বড়, মা"—বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "থাক্—এত দিন গেছে আরও দিনকতক দেখি!"

কমলা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গৃহকর্ম্মে উঠিয়া গেল।

সংসারের খরচ পত্র সে অনেক দিকে অনেক কমাইতে লাগিল। সূর্য্যনারায়ণকে বুঝিতে না দিয়া আহারাদির ব্যবস্থায় যতটুকু ব্যয়সংক্ষেপ সাধিত হইতে পারে তাহা করিল। "আমি যত দিন আছি তত দিন এ খরচটা কেন"—বলিয়া পাচিকাকেও ছাড়াইয়া দিল। হাতে কাজ থাকিলে ভাবনা কম হইবে ভাবিয়া সূর্য্যনারায়ণ তাহাতে আপত্তি করিলেন না। যাহা ঘটিবার আশা অতি অল্প তাহারই অপেক্ষায় পিতা পুত্রীর দিনগুলি দুঃখে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কমলার নির্ব্বাসন হইতেই সুধাংশু যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—সংসারের সর্ব্ববিধ বন্ধনের বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। কাহারও কথা তাহাকে ভাল লাগিত না, কাহারও সঙ্গে সে ভাল করিয়া কথাবার্ত্তাও কহিত না, বাদ্যযন্ত্র সব বিলাইয়া দিয়াছিল, সর্ব্বদাই কেবল 'পালাই' 'পালাই' করিত। কিছুদিন হইল সে একটা চাকরী লইয়া দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে। বিরাজ মানা করিয়াছিল, সে তাহা শুনে নাই। তাহার এই অবাধ্যতাটা যেন একটা কাঁটার মত বিরাজের মনে লাগিয়া আছে।

মধ্যাহ্নে একদিন একটা কিসের ছুটীর দিনে বিরাজ কলিকাতার বাসায় একাকী বসিয়া সুধাংশুর একখানা পত্র পড়িতেছিল। সুধাংশু লিখিয়াছিল,—"দাদা, তোমার পাশে বসিয়া সেই যে আমাদের দেশের গঙ্গার একটুখানি জলে ছোট ছোট ঢেউগুলির রঙ্গ দেখিতাম, সেই ঘর বাড়ী আর গাছের বেড়ার মধ্যে একটুখানি নীল আকাশ দেখিতে পাইতাম, তাহাই কত সুন্দর মনে হইত! এখন অসীম সাগরের অগাধ জলে উত্তাল তরঙ্গমালার উন্মাদ নৃত্য—নীল জলরাশির অনন্ত বিস্তৃতির সঙ্গে

অনন্ত নীল গগনের অবাধ সমাবেশও তেমন সুন্দর মনে হয় না! এখনও সন্ধ্যার রবি তেমনই করিয়া গগনের রাজার মত হইয়াই অস্তে যায়; কিন্তু তাহার বর্ণসম্পদ্ যেন অনেক কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়! তোমার সঙ্গে আমার সুখস্বচ্ছন্দের সম্বন্ধ যে এমন অপরিহার্য্য তাহা আর কখন এতটা বুঝিতে পারি নাই। এখানে এক দণ্ডও সঙ্গীর অভাব হয় না— অনেক বাঙ্গালী যুবক আছে। তাহারা সকলেই বেশ সরল, ভদ্র, সঙ্গ ও আলাপপ্রিয়; কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি একাকী একটা বিশাল মরুভূমিতে পড়িয়া আছি।

কত দিনে বাড়ী ফিরিব জানিতে চাহিয়াছ—শীঘ্রই যদি ফিরিব তবে বাড়ী ছাড়িয়াছি কেন? কত দিনে ফিরিব বা ফিরিব কি না, তাহা এখন বলিতে পারি না। শুধু তোমার জন্যই এক একবার মনটা কেমন করে, আবার তোমার জন্যই ফিরিতেও ইচ্ছা হয় না। তোমার আর আমার স্বভাব ঠিক বিপরীত; তুমি কর্ত্তব্যের খাতিরে নিজের সুখ দুঃখ, ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মারিয়া রাখিতে পার, আমি তা পারি না। তুমি গুরুজনের দোষ দেখিতে চাহ না; আমি কিন্তু দোষ দেখিয়া গুরুজনকে মান্য করিতে পারি না। কোন্ দিন কি অন্যায় করিয়া বসিব তার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল। আর বাড়ীতেই বা আমার কি আছে, দাদা? আমার বাড়ীর সুখ মায়ের সঙ্গেই মরিয়া গিয়াছিল। বউদিদির আসার পর থেকে যেন আবার একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, আবার তাঁহার সঙ্গেই চলিয়াও গিয়াছে। তেমন স্নেহ যত্ন আমাকে আর কে করিবে? তেমন করিয়া কে আর আমার খাওয়ার কাছটিতে বসিয়া ভাল জিনিসটা বেশী করিয়া খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে—সাজা পাণটি খাইতে দিবার আগে খুলিয়া দেখিয়া একটু চূণ মুছিয়া দিবে? গেলাসের ঢাকা দেওয়া জলটুকুও

দেখিয়া, উপর উপর একটু ফেলিয়া দিয়া খাইতে দিবে—ঝাড়া বিছানাটিও শুইতে যাইবার পূর্ব্বে আর একবার আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া দিয়া যাইবে? বাড়ী থেকে যাইবার দিনে কে আর তেমন করিয়া হাতে দেবতার নির্ম্মাল্য ও হৃদয়ে মঙ্গল-কামনা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, প্রণাম করিতে গেলে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে নির্ম্মাল্যটি মাথায় বুলাইয়া দিবে? তাঁহাকে পাইয়া অবধি যে আমি জননীর নষ্ট স্নেহ ফিরিয়া পাইয়াছিলাম—জননীর অভাব ভুলিতেছিলাম, তাহা কি তোমরা বুঝিতে পারিবে? তিনি যদি আবার কখন ফিরিয়া আসেন, তবেই আমিও কখন বাড়ী ফিরিব; নচেৎ বিদেশেই এ অনাবশ্যক জীবনের সমাধি হইবে।—"

পড়িতে পড়িতে বিরাজের চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পত্রখানা ফেলিয়া সে চক্ষু মুছিতেছিল, এমন সময়ে চাকর আর একখানা পত্র আনিয়া দিল। বিরাজ পত্রখানাকে খুলিয়া পড়িয়া দেখিল, নীলকমল সাংসারিক অন্যান্য কথার শেষে লিখিয়াছেন,"—আর বৈশাখের প্রথমেই শ্রীমতী বধূ-মাতাকে আনিবার দিন ধার্য্য করিয়া পাঠাইলাম। তাঁহাকে আর সেখানে ফেলিয়া রাখাটা ভাল হইতেছে না। গ্রামে তাহাতে নিন্দা হইতেছে।—" বিরাজ তখনই দোয়াত কলম পাড়িয়া সুধাংশুকে এই শুভ-সংবাদ লিখিয়া পাঠাইল।

মতভেদটা সমাজে এক প্রকার সাংসিদ্ধিক; কোন একটা বিষয়কে সকলেই ভাল বা মন্দ বলিতে চাহে না, যাহারা যাহা বলে তাহারাও অধিক দিন তাহাই বলিতে পারে না। বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য যাহারা প্রথমে কমলাকেই দোষ দিয়াছিল, তাহারাই আবার পরে বয়স্থা বধূকে স্ত্রীপরিজনশূন্য পিতৃগৃহে ফেলিয়া রাখার জন্য নীলকমলকেই দোষ দিতে

আরম্ভ করিয়াছিল। অগত্যা তিনি "শ্রীমতী বধূমাতা"কে ক্ষমা করিয়া তাহাকে গৃহে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিরাজ এক একটি করিয়া চৈত্রের অবসানদিনগুলি গণনা করিতে লাগিল। অশ্বত্থাদি কোন কোন বৃক্ষের অতীত বর্ষের পুরাতন পত্রাবলীর ন্যায় তাহারও অতীতের সব দুঃখ ও বিষাদ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, এবং হৃদয় শত শত নূতন আশার নবমঞ্জরীতে পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সুধাংশুর আর একখানা পত্র আসিল। কমলার আসিবার কথায় সে লিখিয়াছিল,—"বউদিদিকে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, লিখিয়াছ—ভালই। আমার কিন্তু এ সংবাদে বেশ আনন্দ হইল না। যে আলো বিদ্যুতের মত চঞ্চল, তাহাতে তুমি নির্ভর করিতে পার আমার সে প্রবৃত্তি হয় না। ভগবান্ করুন, আমার আশঙ্কা মিথ্যাই হউক! আমার কিন্তু মনে হইতেছে, তাঁহার এ আসাটা—যদি আসাই ঘটে, অচিরেই আবার চলিয়া যাইবার জন্য। রাগ করিও না—তোমাদের সুখশান্তি যাঁহাদের খেয়ালের উপরে নির্ভর করে, তাঁহাদের অব্যবস্থিত চিত্তের গতি বড়ই অস্থির, তরঙ্গের যে স্থিরতা আছে তাহার তাহাও নাই।"

সুধাংশুর পত্র পড়িয়া বিরাজ বিরক্ত হইয়া তাহার উত্তর পর্য্যন্ত লিখিল না।

৩

কমলাকে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে শুনিতে পাইয়াই কাত্যায়নীর মুখমণ্ডল যেন ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি তখনই নীলকমলকে বাড়ীর ভিতরে ডাকাইয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ—গা!

এ আবার কি শুন্‌তে পাচ্ছি—সেই ছুঁড়ীটাকে না কি আবার বাড়ীতে আন্‌বার ব্যাবস্থা হ'চ্ছে ?"

নীলকমলও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ—তার হ'য়েছে কি ?"

কাত্যায়নী। হ্যাঁ—কি গো ! তুমি ক্ষেপে উঠেছ না কি ?

নীলকমল। তোমরাই যে ক্রমে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে! তোমাদের কি বল না—ঘরের কোণে থাক ! পাঁচ জনের কথা শুন্‌তে হয় যে আমাকে। লোকে কি ব'লছে তা শুনেছ কি ?

কাত্যায়নী আর কথা কহিলেন না, স্তব্ধভাবে একটু দাঁড়াইয়াই সরিয়া গেলেন। তাঁহার সে স্তব্ধতাটা কিন্তু নিবৃত্তি নহে—ঝটিকার পূর্ব্বেও সময়ে সময়ে প্রকৃতিতে সেই রকমের একটা স্তব্ধতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অচিরেই কাত্যায়নীর স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়া প্রবল বেগে নিঃশ্বাস-ঝটিকা বহিতে আরম্ভ করিল, আরক্ত নয়নে বিদ্যুতের মত কুটিল কটাক্ষ ছুটিতে লাগিল, ক্রোধকঠোর কণ্ঠের বজ্রবৎ নিনাদে অন্তঃপুর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ! কত বস্তু যে তাঁহার সরোষপদাঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গৃহচত্বরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল তাহার সংখ্যা হয় না। দাসদাসীরা সকলেই প্রমাদ গণিয়া সরিয়া পড়িল। প্রকৃতির কোপে সাবধান হওয়া সাহসী পুরুষের পক্ষেও কাপুরুষতা নহে বুঝিয়া, নীলকমল বহির্ব্বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সে দুর্দ্দিনে কাত্যায়নীর সান্নিধ্য পরিহার করিল না কেবল মোহিনী। মধ্যাহ্নে তাঁহার শয়নাগার আবার রুদ্ধদ্বার মন্ত্রণাগারে পরিণত হইল। সায়াহ্নে আবার মোহিনী কুম্ভ কক্ষে করিয়া গঙ্গাতীরপথে যাত্রা করিল। সেই ভাঙ্গা ঘাটে গিয়া হীরালালের সঙ্গে সে কি কথা কহিয়া আসিল, তাহার পর দিনেই গ্রামের লোকের সুর ফিরিয়া গেল। নীলকমল বিরাজকে লিখিলেন,—"বধূ-মাতাকে আনিবার

সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেই হইল। গ্রামের লোক সকলেই ইহার বিরোধী; তাহারা বলে, যে বউ একাকিনী একবার পুরীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—আবার রাত্রিতে না কি তাহাকে থানায় আটক রাখিয়াছিল, তাহাকে লইয়া সংসার করিলে তাহারা কেহই আমার সঙ্গে আহার ব্যবহার রাখিবে না। ইচ্ছা করিলেই যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য দুর্লভ সমাজ-মর্য্যাদা নষ্ট করা যায় না। তুমি তাহাদের সঙ্গে এতাবৎ যে বিচ্ছিন্নভাব রক্ষা করিয়া আসিতেছ তাহা সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। আমি সুপাত্রীর সন্ধান করিতেছি।" বিরাজ এই পত্র পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল।—"ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি"!

বিরাজ প্রতিবাদ করিয়া পিতাকে কোন পত্র লিখিল না, সুধাংশুকেও কোন কথা লিখিল না—ভাবিল, নীলকমলের মন আবার ফিরিয়া যাইতে পারে, সমাজও যাহাদের লইয়া গঠিত তাহাদেরই মত অব্যবস্থিত—আজ যাহাকে দণ্ড দিতে ব্যগ্র কাল তাহারই দণ্ডে কাতর, আজ যাহাকে পদদলিত করে কাল আবার তাহাকেই মাথায় তুলিয়া লয়।

দুই তিন মাস চলিয়া গেল, বিরাজ যাহা ভাবিয়াছিল তাহা হইল না। অনেক অভাবনীয় দুর্ঘটনা আসিয়া অনেকের আসন্ন সুখ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; কিন্তু কোন দুর্ঘটনায় বাধা দিয়া তাহা ফিরাইয়া দিবার মত কোন ঘটনা বড় ঘটিতে দেখা যায় না। নীলকমলের তৃতীয় পত্রে বিরাজ জানিল, পাত্রী স্থির হইয়াছে—তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে—শীঘ্রই আবার বিবাহ!

নীলকমল এবার ভারী একটা সুবিধাজনক সম্বন্ধে হাত লাগাইয়াছেন। পাত্রী তাদৃশ রূপবতী নহে, কিন্তু তাহার পিতা গৌরীনাথ কন্যার গৌরবর্ণের অভাবটা সুবর্ণে পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়াছেন এবং সেই

কন্যাই আবার তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। কাত্যায়নী একবার পুত্রবধূর রূপ খুঁজিয়া ঠেকিয়াছেন, এবার তিনি আর 'কালো কুচ্ছিত' বলিয়া আপত্তি করেন নাই। কথাবার্ত্তা সবই স্থির হইয়া গিয়াছে, বাকী শুধু পাকা দেখা।

বিরাজ বাড়ী আসিয়াই তাহাদের পুরাতন ও প্রাচীন কর্ম্মচারী রায় মহাশয়ের দ্বারা পিতাকে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে নিজের অনিচ্ছা জানাইল। নীলকমল সে কথা শুনিয়াই বিরাজকে ডাকাইয়া রোষবিস্ফারিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, তুমি না কি আর বিবাহ ক'রবে না ব'লেছ?"

বিরাজ কোন উত্তর করিতে পারিল না, অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নীলকমল বলিলেন, "তা বেশ, তুমি সেই প্রবাদদুষ্টা পত্নীকে নিয়েই সংসার কর! আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখ্‌বার দরকার নেই। লেখা পড়া শিখেছ—মানুষ হ'য়েছ, এখন আর বাপ মাকে দরকার কি?"

বিরাজ বিনয়বচনে পিতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিল। নীলকমল সে সব কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তীব্রস্বরে বলিলেন, "যাও! যাও! যুক্তি তর্ক আদালতে দেখাও গে! ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি—যদি আমাদের চাও, সে স্বেচ্ছাচারিণীকে ত্যাগ ক'রে আবার বে কর! নচেৎ আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যাও!—অবাধ্য পুত্রের মুখ দেখ্‌তে চাই না।"

তিনি রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেলেন। বিরাজ কাষ্ঠবৎ হইয়া সেই স্থানে অধোমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার কর্ত্তব্য কি—ধর্ম্মপত্নীকেই অকারণে ত্যাগ করিবে, অথবা পত্নীর প্রতি স্বামীর ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য পিতা মাতার প্রতি সন্তানের

কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিবে! এই বিষম দ্বৈধীভাবে তাহার কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হৃদয় আন্দোলিত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল।

নীলকমল কমলাকে লইয়া যাইবার দিন স্থির করিয়া পত্র দিবার পর সূর্য্যনারায়ণের নিরানন্দ সংসারে একবার একটু প্রফুল্লভাব দেখা দিয়াছিল। এইবার কমলাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া তিনি তীর্থবাসী হইবেন এই অভিপ্রায়ে হরকুমারের সঙ্গে দেনা পাওনার হিসাব করিতে লাগিলেন। কমলাও যেন ঘনান্ধকারে পথ চলিতে চলিতে অদূর পুরোভাগে একটা ক্ষীণ আলোক দেখিতেছিল। কিন্তু প্রথম বৈশাখের সে নির্দ্ধারিত শুভদিন আসিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল, নীলকমলের গৃহ হইতে কোন লোক বা পত্রাদি আসিল না। তাহার পরও দুই তিন দিন আশা, অপেক্ষা ও উদ্বেগে চলিয়া গেল। তাহার পরেই সূর্য্যনারায়ণ আপনার তীর্থবাসের দিন আসন্ন নহে বুঝিয়া শয্যা লইলেন এবং কমলাও দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বামিগৃহগমনের আশা পরিত্যাগ করিল।

সন্ধ্যার পর একদিন কমলা ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়া, গৃহ-প্রাঙ্গণস্থ তুলসীমঞ্চে দীপ দান করিয়া দেবতা প্রণাম করিতেছিল; উঠিয়াই দেখিল, তাহার সম্মুখে বিরাজমোহন! উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল! কমলার দৃষ্টি যেন কি একটা বেদনায় অভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, আর বিরাজের দৃষ্টি অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া আসিল—কিন্তু তখনই আবার সেই দিকেই ধাবিত হইল। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মুষ্টিমেয় অন্নে নিবারিত হয় না—মরুপিপাসা বিন্দুমাত্র বারিতে উপশান্ত হয় না। বিরাজের বহুদিনের অদর্শনজনিত দর্শন-পিপাসারও বোধ হয়

সেই নিমেষের দেখায় তৃপ্তি হইল না। কিন্তু পুনর্ব্বার চাহিয়া সে তৃপ্তির পরিবর্ত্তে একটা ব্যথা পাইল—কমলা মাথার কাপড় টানিয়া নামাইয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

সূর্য্যনারায়ণ জামাতাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, নিকটে বসাইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অভিমানের যত কথা তাঁহার মনে সঞ্চিত ছিল, সব গভীর আনন্দে তলাইয়া গেল। এখন তাঁহার মুখে যত কথা সব আনন্দের আর আশীর্ব্বাদের।

অনঙ্গ আহ্লাদে আটখানার দ্বিগুণ হইয়া কোথায় কাহার বাড়ীতে দুধ, কোন্ দোকানে ভাল সন্দেশ, কাহার গাছে কি ফল পাকিয়াছে, তাহারই সন্ধান করিয়া ঘুরিতে লাগিল। কমলার মনটা কিন্তু বিরাজকে স্বেচ্ছাগত দেখিয়াও ঘনদর্শনপুলকিত ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করিতেছিল না। তাহার বিষাদ-সিন্ধু আজ যেন ইন্দুসন্দর্শনাকুল জলধির ন্যায় উথলিয়া উঠিতেছিল। কোনরূপে নয়নের উৎস নিরুদ্ধ করিয়া গৃহকর্ম্ম শেষ করিতে লাগিল।

অনঙ্গ আসিয়া যেমন শুনিল, বিরাজের অসুখ—সে কিছুই খাইবে না, কে যেন লাঠী মারিয়া তাহার পা দুইটিকে ভাঙ্গিয়া দিল—সে আর উঠিতে চাহিল না। সূর্য্যনারায়ণকে খাওয়াইয়া কমলা অনঙ্গকে ভাত বাড়িয়া দিল। অনঙ্গ আজ তাহা লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কমলা বিরাজের জন্য একটু দুধ ও সামান্য কিছু মিষ্ট লইয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে উপাধানে মুখ লুকাইয়া শয়ান রহিয়াছে। যাহা যাহা আনিয়াছিল নিঃশব্দে মেজেতে নামাইয়া রাখিয়া, সে ধীরে ধীরে বিরাজের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রু মুছিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বিরাজ শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এখন আর মিছে কাঁদলে কি হবে, কমলা! আপনার কপালে যে তুমি আপনি

লাঠী মেরেছ ! কেন তুমি রাত্রিতে একা চ'লে এসেছিলে—একটা রাত অপেক্ষা ক'রতে পার্‌লে না ?"

কমলা চোখ দুটিকে ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া, গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া বিরাজের কথা শুনিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইলে, ম্লানমুখে একটু হাসিয়া বলিল—"তুমিও কি তাই বিশ্বাস ক'রেছ ?"

বিরাজ। কেন—রাত্রিতে তুমি একা চ'লে আস নি ?

কমলা কোন উত্তর করিল না, একটু হাসিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিরাজ। তবে কি বড় বউঠাক্‌রুণ যা বলেন তাই সত্যি ?—কিন্তু আর কেউ তা বলে না কেন ?

কমলা। অন্যে কে কি বলে না বলে জানি না; তোমার বিশ্বাসের জন্যে এই অবধি ব'ল্‌তে পারি যে, আমি একা চ'লে আসি নি—পাল্কী ক'রে এসেছিনু, সঙ্গে একজন মেয়েনোক ছেল, তখন রাতও নয়।—আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞেসা ক'রো না !

অনেকক্ষণ চলিয়া গেল তবু বিরাজ আর কোন কথা কহিল না। কমলা বলিল,—"সে ত যা হ'বার হ'য়ে গেছে—এখন দুধটুকুও যে জুড়িয়ে যায় ! জল অবধি মুখে দাও নি কেন ?—একটু অসুখ হ'লে কি আর মানুষ একেবারে কিছুই খায় না ?"

বিরাজ তথাপি কোন কথা কহিল না। কমলার কথায় তাহার মনই ছিল না। নীলকমল যেদিন কমলার পিত্রালয়ে থাকিবার ব্যবস্থা করেন, সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গাতীরে বসিয়া সুধাংশু যাহা যাহা বলিয়াছিল, সেই—"যে সত্যির ফলে গৃহবিবাদ, মাতা পুত্রে বিচ্ছেদ, সুখের সংসারে অশান্তি, সে সত্যিও যে তাঁর কাছে মিথ্যের চেয়েও অধম" এবং "এই কয়

বৎসর ধ'রে তাঁর মাথার ওপর দিয়ে কত ঝড় ব'য়ে গেছে"—ইত্যাদি কথাগুলি যেন আলোকের অক্ষরে আসিয়া বিরাজের চক্ষের সমক্ষে দাড়াইয়াছিল। তাহার অতীত ও বর্ত্তমান ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়া ঘন কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন দূরস্থিত অশ্বথের ন্যায়—সুদূর জনতার অব্যক্ত কোলাহলের ন্যায়,তাহার মনে একটা প্রকাণ্ড অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সে নিতান্তই কিংকর্ত্তব্য—কিংবক্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে কমলা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "এমন চুপ্ ক'রে রইলে যে ?"

বিরাজ ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি ত তা হ'লে ভারী অন্যায় ক'রে ফেলেছি !"

কমলা আশঙ্কা ও উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে বিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আবার কি অন্যায় ক'রেছ !"

বিরাজ। তোমার এখানে চ'লে আসা নিয়ে গ্রামের দু'চার জন দুষ্ট লোকে বুঝি কি একটা মিছে কথা র'টিয়েছে—বাবাও তাইতে বিশ্বাস ক'রেছেন। তোমাকে নিয়ে তিনি সংসার ক'রতে চা'ন্ না। তোমাকে ত্যাগ ক'রে আবার বে করবার জন্যে আমাকে পেড়াপীড়ি করেন—"

কমলা তাহার কথায় বাধা দিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি তাতে অরাজী হ'য়েছ না কি ?"

বিরাজ। প্রথমে তাই হ'য়েছিনু ; কিন্তু শেষটায় তাঁদের জেদাজিদি দেখে, তাঁদের মনস্তুষ্টির জন্যে আপনার হৃৎপিণ্ডকে ছিন্ন ক'রে তাঁদের চরণে বলি দিতে প্রস্তুত হ'য়েছি—তাঁদের রাগের শান্তির জন্যে আপনার চিরজীবনের সুখশান্তি তাইতে আহুতি দিতে সম্মত হ'য়েছি। বিয়ের ত দিন পর্য্যন্ত স্থির হ'য়ে গেছে—তারও আর বড় দেরি নেই।"

কমলা শ্বাসরোধ করিয়া বিরাজের কথা শুনিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইলে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই অন্যায় ?—তাই ভাল—আমি বলি আর কিছু! তা—এ আর অন্যায় কি ?—এ ত তোমার উপযুক্তই ক'রেছ! যাদের ক্ষুদ্র মন তারাই আপনাদের তুচ্ছ সুখ দুঃখ নিয়ে গুরুজনের অবাধ্য হয়—তাঁদের কথা অমান্য করে। তুমিও যদি তাই ক'রবে তবে কেন আমি জন্মে জন্মে তোমার দাসী হবার জন্যে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি ? অভাগীর সঙ্গে বে দিয়ে তাঁদের কোন সাধ-আহ্লাদই মেটে নি—তুমিও সুখী হ'তে পার নি। বে কর! কিন্তু আমি এমন কি ক'রেছি যে আমাকে একেবারে ত্যাগ ক'র্‌তেই হ'বে ? এখন যতদিন বাবা আছেন আমি কিছুই চাইব না—তাঁর অবর্ত্তমানে তোমাদের বাড়ীতে কেবল একটু ঠাঁই দিও! তাতে আর দোষ কি হবে ? এই যে কত ছোট জাতের মেয়ে কত বড় বড় ভদ্রলোকের বাড়ীতে দাসী থাকে! আমিও তেমনি থাক্‌ব! তা'তেও যদি সমাজের আপত্তি হয়—দশজনের কাছে তোমাদের মাথা হেঁট্ হয়, তবে তাও চাই না; কিন্তু আমারও যে আর কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই নেই!"

কমলা চুপ করিল। অন্তরস্থ বিষাদের একটা ম্লান ছায়া গগনসঞ্চারী বিহঙ্গের ছায়ার ন্যায় তাহার মুখের উপর দিয়া সরিয়া গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষঃস্থলকে ঈষৎ একটু স্ফীত করিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নির্গত হইল। সেই সামান্য নিঃশ্বাসবায়ুতেই বিরাজের হৃদয়টা যেন প্রবলবাত্যাহত ক্ষুব্ধ জলধির ন্যায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিয়া অধোমুখে ভাবিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্বের সেই সংশয়, বিতর্ক, জনক-জননী ও সহধর্ম্মিণীর

প্রতি সন্তান ও স্বামীর বিভিন্ন কর্ত্তব্যের সেই বিপ্রতিষেধ—সেই উভয়-সঙ্কট আবার নূতন হইয়া ফিরিয়া আসিল। বিবাহের সঙ্কল্পটাও যেন তাহাতে ভাঙ্গ ভাঙ্গ হইয়া পড়িল। অতীতের শত স্মৃতি শত আশীবিষের ন্যায় তাহার মর্ম্মে দংশন করিতে লাগিল। নবোঢ়া কমলার সেই লজ্জামৌন মুখ—সেই ব্রীড়াবনত নেত্রের চঞ্চল অপাঙ্গদৃষ্টি—নবানুরাগের সেই সব আনন্দালাপ, অভিমান, সোহাগ, অনিমিত্ত কলহ এবং কলহের অবসানে সেই মধুর মিলন—সব একে একে পুঞ্জে পুঞ্জে আসিয়া তাহার হৃদয়কে অবরুদ্ধ ও আকুল করিয়া তুলিল।

অনেকক্ষণ সেইভাবে বসিয়া চিন্তা করিয়া, বিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"সে সব কথা এখন কেন, কমলা? যে জন্যে এসেছি এখন শোন!—তুমি যে গয়নাগুলি প'রে এসেছিলে, মা আমাকে সেইগুলি নিয়ে যাবার জন্যে পাঠিয়েছেন। তোমার যদি আপত্তি না থাকে সেইগুলি আমাকে এনে দাও! তবে আমার এই অনুরোধ যে তোমার বাবা যেন এখন এ সকল কথা না জানতে পারেন!"

বিরাজ বিবাহে সম্মত হইলে পর নীলকমল যখন গৌরীনাথকে সংবাদ পাঠাইয়া বিবাহের উদ্যোগ লইয়াই ব্যস্ত, কাত্যায়নী সেই সময়ে মোহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, বিবাহের পূর্ব্বেই বিরাজের দ্বারা এই কার্য্যটা সারিয়া লইবার চেষ্টায় ছিলেন। বিরাজকে এই কার্য্যে প্রেরণ করায় মোহিনীর সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল না। কাত্যায়নীও নিঃশঙ্কচিত্তে এই "ডাইনের হাতে পো সমর্পণ"এর ব্যাপারে রাজী হন নাই। তবে "ভারী ভারী গয়না ক'খানা যে ছুঁড়ীটার বাপ এক একখানা ক'রে বেচ্‌তে থাক্‌বে আর বাপে ঝিয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাবে"—এ চিন্তাটাও তাঁহার একেবারেই অসহ্য। পূর্ব্বসাবধানকল্পে তিনি মাথার দিব্য

দিয়া বিরাজকে এ গৃহে রাত্রি যাপন করিতে অথবা পাণটি পর্য্যন্ত মুখে দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। আহারাদির অনুরোধ হইতে অব্যাহতির জন্যই বিরাজের এই অসুস্থতার ভান।

বিরাজের কথা শুনিয়া কমলা একটু হাসিয়া বলিল,—"তোমাদের গয়না তোমাকে দিতে আমার আবার আপত্তি কিসের? আমি চোরের ভয়ে এই গুলি বেচে বাবার দেনায় দেবার চেষ্টায় ছিনু—ভাগ্যে তিনি রাজী হ'ন নি!—তা সে ত আর এখনই নয়? এখন অসুখটা কি রকমের বল না! ঘরে ঘি ময়দা আছে, শুজি চিনিও আছে—"

বিরাজ বাধা দিয়া বলিল, "না—কমলা! আমি কিছুই খাব না। রাত্রি বাড়ছে—আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে।"

কমলা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"এখনই!—এই রাত্রে!—কেন?"

বিরাজ অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিল—"মা ব'লে দিয়েছেন!"

কমলা। "ও—কিছু খেতেও বুঝি তবে তিনি মানা ক'রে দিয়েছেন?"

বিরাজ এ কথার কোন উত্তর করিল না। কমলা বিষণ্ণমুখে বলিল, "কেন—আমাদের ছোঁয়া খেলেও কি জাত যাবে?"—তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া—"তা বেশ"—বলিয়া, সে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল এবং সূর্য্যনারায়ণের কক্ষদ্বারে আসিয়া অনতি-উচ্চস্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল,—"বাবা! ঘুমিয়েছ কি গা?"

সূর্য্যনারায়ণ তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা, মা!—বিরাজের অসুখ কিছু বাড়ে নি ত?"

কমলা ঘরের ভিতরে আসিয়া বলিল, "লোহার সিন্দুকের চাবিটা কোথা আছে, বাবা?"

সূর্য্যনারায়ণ প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলেন। এত রাত্রিতে লোহার সন্দুকে কি! কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে পড়িল, কমলার অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই। তিনি যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "এই যে আমি বার ক'রে দিচ্ছি, মা!"

কমলা, দুঃখের উপরে লজ্জা পাইয়া গহনার বাক্সটি আনিয়া, নীরবে বিরাজের সম্মুখে ধরিয়া দিল। বিরাজ মাতৃদত্ত ফর্দ্দের সঙ্গে মিলাইয়া গহনাগুলি রুমালে বাঁধিয়া লইয়া, চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কমলা তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই রাত্রিতে অসুখ নিয়ে মাঠের পথে কি না গেলেই নয়?"

বিরাজ। না গেলে যে মা রাগ ক'র্‌বেন, কমলা!

"তবে আর কি ব'ল্‌ব"—বলিয়া, কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বাষ্পাকুলনেত্রে বিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা—আস্‌তেই না হয় দোষ, পত্র লিখ্‌তে কি দোষ?—এমনি কি অপরাধ! সবার সব দোষের ক্ষমা আছে, আমার এ তুচ্ছ অপরাধের ক্ষমা নেই? নাই থাক্—তুমি ব'লে যাও যে, আমার ওপরে রাগ কর নি,—আমাকে ভুলে যাবে না—যেমন ভাল বাস্‌তে তেমনি বাস্‌বে!"

অনেক সময়ে দেখা যায় আকাশে জলে ভরা মেঘ জমিয়া আছে, কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি হইতেছে না; সেই সময়ে যেমন দুই একটা বিদ্যুৎ উঠিয়া থাকে অমনি তড় তড় করিয়া বৃষ্টি নামিতে থাকে। বিরাজের হৃদয়েও অনেকক্ষণ হইতেই একখানা অশ্রুভরা মেঘ উঠিয়া বর্ষণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। নিজের দুর্ব্বলতাটুকু ঢাকিয়া লইয়া পলাইবার ইচ্ছায় সে এতক্ষণ এদিকে ওদিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিল, কিন্তু শেষরক্ষা করিতে

পারিল না। কমলার অশ্রুগর্ভ নেত্রের সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন বিদ্যুতের কাজ করিয়া দিল। সহসাই গোটাকতক বড় বড় অবাধ্য অশ্রুবিন্দু শরতের তড় তড়ে বৃষ্টির মত বিরাজের চক্ষু হইতে তাহার জামার উপরে ঝরিয়া পড়িল। প্রসারিত বাহুদ্বয়ে কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, তাহার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বিরাজ আবেগভরে অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কমলাও বিরাজের বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। আর কাহারও মুখেই কথা সরিল না। উভয়ের চক্ষু হইতে ঝরিতে লাগিল কেবল অশ্রু—অবিরল—অবিশ্রান্ত!

কতক্ষণ সেইভাবে অতিবাহিত হইল, কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। কতক্ষণ চলিয়া গেল তথাপি কেহ মুখও তুলিল না। সে যেন কি একটা রোদনের উৎসব—যেন কি একটা সুখের স্বর্গ! কেহই তাহা ছাড়িতে চাহিল না। জগতে বিরুদ্ধধর্ম্মান্বিত পদার্থের সমাবেশ বা পরস্পরের অন্তর্বর্ত্তিতার অসদ্ভাব নাই। আমরা যে জল, যে আগুন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহা না কি তন্মাত্র নহে! দার্শনিকেরা ঐ সকলের আণবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া থাকেন, জলে আগুনের অংশ আছে, আবার আগুনেও জলের অংশ আছে! তেমনি দুঃখের মধ্যেও যেন একটা সুখ আছে বলিয়া বোধ হয়। তবে সে সুখ বুঝিবার মত হৃদয় বোধ হয় সবারই থাকে না। আনন্দ-মিলনের যে সুখ, তাহা তরল, তীব্র ও উন্মাদকর—সে সুখ সবাই বুঝিতে পারে; কিন্তু ব্যথিত হৃদয়যুগলের বিষাদ-মিলনের যে সুখ, তাহা যে উপভোগ করে নাই সে বুঝিতে পারিবে না। অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া রোদনের সুখ কত গভীর—বেদনাকুল হৃদয়কে সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ের উপরে চাপিয়া ধরিয়া মৌন অবস্থানের যে কি প্রগাঢ় নির্ভর, কি স্নিগ্ধ তৃপ্তি, কত মধুর শান্তি ও

সান্ত্বনা তাহা বর্ণনার নহে, অনুভূতির। বিরাজ ও কমলা পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে এই দুঃখের সুখই উপভোগ করিতেছিল। সম্মুখে যাহাদের প্রচণ্ডরৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ মরুপথ, তাহারা যেমন ক্ষণকালের জন্যও শীতল ছায়া পাইলে তাহা ছাড়িতে চাহে না, ইহারাও তেমনি অচিরভাবী দীর্ঘবিরহের আশঙ্কায় এই ক্ষণিক মিলনের সুখও ছাড়িতে চাহিতেছিল না। দালানের ঘড়িটা টং টং করিয়া অনেক বার বাজিয়া তাহাদের এ সুখ সম্ভোগেও অন্তরায় হইল।

কমলাই প্রথমে মুখ তুলিল এবং ধীরে ধীরে আপনাকে বিরাজের বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল,—"কেঁদো না! শান্ত হও! ছি! তুমি বিদ্বান্, তুমি ধীর, তুমি পুরুষ; তুমি যদি এমন অধীর হও, আমি কি ক'রে ধৈর্য্য ধরি?"

বিরাজ চক্ষু মুছিতে মুছিতে গহনার পুটলি শয্যার উপরে ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "না, আর কাঁদ্‌ব না, কমলা!—অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি;—আজ তার শেষ। পত্র লিখ্‌তে কি লুকিয়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে কে আমাকে মানা ক'রে রাখ্‌বে? কিন্তু, সে লুকোচুরি কেন? বাবা যদি তোমাকে নিয়ে সংসার না করেন, তবে আমাকেও ত্যাগ করুন! স্বামীর কর্ত্তব্য পালনে যদি অপুণ্য হয়, ধর্ম্মপত্নীকে অকারণে ত্যাগ না কর্‌'লে যদি অধর্ম্ম হয়, তবে পুণ্যে ও ধর্ম্মে আমার প্রয়োজন নেই। যে বাড়ীর লোক সন্তানের মুখ চায় না, যে সমাজ পরের দুঃখ বোঝে না, সে বাড়ীতে সে সমাজে আমাদের থাক্‌বার দরকার কি?—চল আমরা কোন অজানা দূর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধি!

স্বামিস্ত্রীর এ পুণ্য সম্বন্ধ লোকের কথায় ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মরার মত বেঁচে থাক্‌তে হ’বে না।”

কমলা নতমুখে দাঁড়াইয়া বিরাজের কথা শুনিতেছিল, তাহার কথা শেষ হইবার পরেও কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইয়া যেন কি ভাবিতে লাগিল; পরে বিরাজের মুখের দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া বলিল, “আমার জন্যে তুমি মাবাপ্‌কে ছেড়ে, তাঁদের মনে দুঃখ দিয়ে, দেশত্যাগী হ’বে?—কেন? আমি তোমার দাসী; কিন্তু তাঁরা যে তোমার দেবতা! পায়ে আর মাথায় সমান মনে ক’রো না!—আর তাই বা কেন? তোমার ভালবাসার স্মৃতি নিয়ে আমি সব দুঃখ সইতে পারব। তুমি বে ক’রে তাঁদের সুখী কর! আমি জানি তুমি আমারই থাক্‌বে।”

বিরাজ অধোমুখে দাঁড়াইয়া নীরবে কমলার কথা শুনিতেছিল। কমলা একটু থামিয়া আবার বলিল,—“স্বামিস্ত্রীর এ পুণ্য সম্বন্ধ জলের দাগ নয়, লোকের কথায় মুছে যাবার নয়, জোর ক’রেও ছিঁড়ে ফেল্‌বার নয়, এ যে বিধাতার বাঁধন, কর্ম্মের বাঁধন! জন্মান্তরের কর্ম্মফলে যদি এ জীবনে সুখ নাই ঘটে, তা’তেই বা দুঃখ কি? কর্ম্মের বশে যদি তুমি দূরে চ’লে যাও, ঘটনার স্রোত যদি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়,—এ জীবনে যদি আর না দেখা হয়,”—বাষ্পাবেগে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, একটু থামিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—“আমাকে মনে রেখো!—এখানে না হয়, জীবনের পরপারে গিয়ে আবার আমরা দু’জনে মিলিত হব!”

কমলা নত হইয়া বিরাজের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল এবং সেই সময়ে বিরাজকে লুকাইয়া আর একবার চক্ষুদুটিকে বেশ করিয়া অঞ্চলে

মুছিয়া লইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইলে বিরাজ দেখিল, তাহার ভাবে আর কিছুমাত্র চঞ্চলতা নাই। গভীর রাত্রিতে বৃষ্টির পর জ্যোৎস্না উঠিলে প্রকৃতিতে যেমন একটা মধুর ও গম্ভীরে মিশ্রিত প্রশান্ত-সুন্দর অথবা স্নিগ্ধরমণীয় ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতেও তেমনি একটা ভাব লক্ষিত হইতেছে। তাহার প্রাংশু দেহখানি যেন মর্ম্মর প্রতিমার মত স্থির! অশ্রুদিগ্ধ মুখখানি যেন শিশিরসিক্ত পদ্মের ন্যায় সুন্দর! বিরাজ তাহার সে ধীর ভাব দেখিয়া নিজের অধীরতার জন্য লজ্জিত হইল এবং আর কোন কথা না কহিয়া গহনার পুটলি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বিদায় লইল।

কমলা বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া বিরাজ যতক্ষণ না অন্ধকারে মিশাইয়া গেল ততক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরেও কিছুক্ষণ তিমিরাবৃত শূন্য পথে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়া যেমন নিজ শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল, অমনি মুক্তার হার সহসা ছিঁড়িয়া গেলে মুক্তাগুলি যেমন ঝরিয়া পড়ে সেইভাবে গোটাকতক বড় বড় অশ্রুবিন্দু ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার বক্ষোবসনের উপরে ঝরিয়া পড়িল। দীপ জ্বলিতে লাগিল। সে যদৃচ্ছাক্রমে শয্যায় পড়িয়া উপাধানে মুখ লুকাইল।

প্রভাতে অনঙ্গ আসিয়া দেখিল কমলার কক্ষদ্বার রুদ্ধ। সে তাহাকে না ডাকিয়াই বাসিপাট আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার ঝাঁটার খর্ খর্ ও বাসনের ঝম্ ঝম্ শব্দে কমলা উঠিয়া দেখিল জানালার

ঝাঁক দিয়া সূর্য্যের কিরণ ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া থাকে, এমন কি অনুদয়েই তাহার স্নান হইয়া যায়। বেলা হইয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া অনঙ্গের নিকটে আসিয়া তাহাকে নিম্নস্বরে বলিল, "এতটা বেলা হ'য়ে গেছে, মাসী, আমাকে ডাক্‌তে নেই?"

অনঙ্গ দাসী হইলেও কমলা তাহাকে "মাসী" বলিয়াই ডাকে। সে যখন মা-মরা ছোট মেয়েটি, তখন এই অনঙ্গই তাহাকে মায়ের অভাব বুঝিতে দেয় নাই। বৃদ্ধার স্তন্যহীন শুষ্ক স্তনদুইটিকেও শিশু কমলার অনেক অত্যাচার সহিতে হইত। এখন সে বড় হইয়াছে বলিয়া অনঙ্গ তাহার চক্ষে একটুও ছোট হইয়া যায় নাই।

অনঙ্গ ঝাঁটার খর্‌খরানিটা একবার থামাইয়া কমলার দিকে চাহিয়া বলিল,—"হাঁ গা! তোর চোখদুটো অমন ফুলো ফুলো কেন, মুখখানা অমন ভারী ভারী কেন?—জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছিস না কি?—কি হ'য়েছে বল্ দেখি?"

কমলা মুখটা ভারী করিয়া বলিল, "তোর মাথা হ'য়েছে, মুণ্ডু হ'য়েছে, মুখে আগুন, বাবার ঘুম ভাঙ্গাতে গেলি আমাকে ডাক্‌তে কি হ'য়েছিল?"

অনঙ্গ শুধু একটা "হুঁঃ!" করিয়া ঝাঁটা চালাইতে আরম্ভ করিল, এবং ঝাঁটাইতে ঝাঁটাইতে খুব স্পষ্ট করিয়া হাঁকিয়া বলিল, "তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে হয় নি গো, হয় নি!—আমার আস্‌বার আগেই তিনি উঠে বেড়াতে বেরিয়েছেন।"

সূর্য্যনারায়ণ যে তাহার বেলায় উঠাটা জানিতে পারেন নাই তাহা শুনিয়া যেন কমলার রাগটা নিভিয়া গেল। বহুদিনের পর তিনি যে

আজ আবার বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন ইহাতে তাহার ম্লান মুখখানি একটা হর্ষের ভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার রোগ ও দুশ্চিন্তায় জীর্ণ ক্ষীণ দেহে এ নবশক্তি সঞ্চারের হেতু কি, তাহা মনে হইয়াই তাহার মুখখানি আবার ম্লান হইয়া গেল। সে গামছা-খানা টানিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিয়া পুকুরঘাটে চলিয়া গেল।

সূর্য্যনারায়ণ বেড়াইয়া আসিয়া শুনিলেন, বিরাজ চলিয়া গিয়াছে। অসুস্থ শরীরেই চলিয়া গেল, তাঁহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করিয়াও গেল না! তাঁহার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। ক্রমে যখন সব কথা শুনিলেন তিনি আবার শয্যা লইলেন।

অনেক দিন ধরিয়া রোগে ভুগিয়া ডাক্তার কবিরাজের উপরে তিনি একবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভারী অসুখেও আর তাহা-দের সাহায্য খুঁজিতেন না; কিন্তু এবার যখন কমলা অনঙ্গকে ডাক্তার ডাকিতে বলিল, তিনি কিছু আপত্তি করিলেন না, ঔষধটুকুও বেশ আগ্রহের সহিত পান করিতে লাগিলেন। কমলার একটা কিছু ব্যবস্থা না করিয়া যেন তিনি সংসার ছাড়িতে চাহেন না; কিন্তু মৃত্যু কি কাহারও অবসর বুঝিয়া আইসে? দিনে দিনে তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িল।

জীবন যে কাহারও ধরিয়া রাখিবার নহে, মানুষকে লোহার বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিলেও যে তাহার প্রাণ ছায়ার মত ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়ে, আত্মীয়ের মন তাহা বুঝিতে চাহে না; তাই মুমূর্ষুকেও তাহারা স্নেহের শিকলে বাঁধিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। সূর্য্যনারায়ণ যে তাহাকে ছাড়িয়া কোন সুদূর অজ্ঞাত তীর্থে চলিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া, কমলা চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বলে

তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিয়ত সে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকে, দিন রাত্রির মধ্যে একবারও অধিকক্ষণের জন্য তাঁহার কাছ-ছাড়া হয় না। সূর্য্যনারায়ণ যদি বুঝাইয়া তাহাকে খাইতে পাঠাইয়া দেন, সে ভাতে হাত দিয়াই চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া পড়ে। শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ঘুমে ঢলিতে দেখিয়া যদি তিনি তাহাকে শুইতে বলেন, সে তাঁহার পায়ের কাছটিতে মাথা রাখিয়া একটু শুইয়াই তখনি উঠিয়া বসে। সদা সর্ব্বদাই তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিধানের চেষ্টা লইয়া থাকে, ঔষধটুকু ঠিক দাগমত ঢালিয়া স্বহস্তে তাঁহার মুখে ঢালিয়া দেয়, সবটুকু মুখে পড়িল কি না দেখে, আর স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু আছে সব বেচিয়া কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য প্রাচীন প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুক্তি করে। সূর্য্য-নারায়ণ তাহাতে বাধা দিয়া তাহা করিতে দেন না।

মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্ব যেন কি একটা পবিত্র সুরক্ষিত তীর্থ! সেখানে কাহারও লজ্জাসরম থাকে না। কমলা পূর্ব্বে যাহাদের সমক্ষে বাহির হইতে চাহিত না, এখন তাহারা আসিলেও সে আপনার স্থানটি ছাড়িয়া উঠিয়া যায় না, মাথায় কাপড়টি একটু টানিয়া দিয়া নতমুখে বসিয়া থাকে, যে যাহা বলে কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতে থাকে, আর সকলে চলিয়া গেলে সূর্য্যনারায়ণকে লুকাইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করে।

উকীল মোক্তারেরা যেমন মোকদ্দমার কোন অবস্থাতেই হার হইবে এ কথা মক্কেলকে জানিতে দেয় না, অনেক ডাক্তার কবিরাজেও তেমনি রোগীর আসন্ন মৃত্যুকালেও তাহার প্রকৃত অবস্থা গৃহস্থকে বুঝিতে দেয় না। কিন্তু রোগেরই এমন একটা অবস্থা আছে যখন ডাক্তার বা কবিরাজ না বলিলেও রোগী এবং তাহার আত্মীয়গণ বুঝিতে পারে যে, পরস্পরের চিরবিরহ অবশ্যম্ভাবী ও অচিরভাবী। সূর্য্যনারায়ণ রোগের সেই অবস্থায়

উপনীত হইলেন। দেখিবার, শুনিবার ও বুঝিবার শক্তি ছাড়িবার পূর্ব্বেই কথা কহিবার শক্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। কমলা এখন পিতার ম্লান ও বিশীর্ণ মুখখানির নিকটে নিজের বিষণ্ণ মুখখানি আনিয়া ধূলিম্লান দুঃখক্লিষ্ট ধরণীর উপরে প্রভাতের ম্লান শুকতারার মত চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকে; আর তিনি আপনার শীর্ণ হাতখানি তাহার মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে বুলাইয়া আনেন। দুই জনেরই চক্ষে অবিরল অশ্রু বহিতে থাকে।

মধ্যাহ্নে একদিন পিতা ও পুত্রী সেইভাবে অবস্থান করিতেছে, এমন সময়ে কতকগুলি কাগজপত্র হাতে করিয়া হরকুমার সেই কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। মুমূর্ষুর নিকটে পাওনার খতিয়ান লইয়া উত্তমর্ণের আগমন বোধ হয় তাহার দুষ্কৃতের তালিকা ও আয়ুর হিসাব-বহি হস্তে চিত্রগুপ্তের আবির্ভাব অপেক্ষাও অধিক উদ্বেগজনক! সূর্য্যনারায়ণ সেই যে অনিমেষ-কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর তাঁহার চক্ষে পলক পড়িল না। কমলা তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কেন আপনি এখন এখানে এলেন?—বাবাকে আমার একটু শান্তিতে ম'রতেও দিলেন না?"

৬

শোকে যে মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে পারে, তাহার শোকটা যেন শীঘ্রই লঘু হইয়া পড়ে। যে তাহা পারে না, তাহার অশ্রুশূন্য নিরুচ্ছ্বাস শোক বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ। সে যেন কি একটা পুটপাক অথবা কুম্ভকারপনের অন্তর্দাহ,—উপরে উপরে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মর্ম্মের স্তরে স্তরে পাঁজার আগুনের মত যেন কি একটা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতে আর থাকিয়া থাকিয়া যখন এক একটা দীর্ঘশ্বাস নামিয়া যায়,

যেন তাহার সঙ্গে দগ্ধহৃদয়ের কিয়দংশও ছাই হইয়া উড়িয়া গেল, দেহের শিরাগ্রন্থিসমূহ খুলিয়া গেল, পঞ্জরের অস্থিসমূহ পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িল !

কমলা পিতার শোকে একবারও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে পারে নাই, কেহ তাহার চক্ষে অশ্রু পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই। শোক-চিহ্নের মধ্যে অন্যে দেখিতে পায়, সে হাসে না, কাহারও সঙ্গে কথা কহে না ; আর অনঙ্গ দেখিতে পায়, সে নিত্য রাঁধে না, নিত্য খায় না, যে দিন খায় খাইতে বসে মাত্র। রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিলেই অনঙ্গ দেখিতে পায় কমলা জাগিয়া আছে। দিবসেও সে সর্ব্বদাই শূন্য দৃষ্টি আকাশে ন্যস্ত করিয়া শূন্য মনে বসিয়া থাকে। তাহার সেই অশ্রুসম্পাতশূন্য অনিমেষ নেত্রের উদাস দৃষ্টি দেখিয়া যাহাদের চক্ষে অশ্রু বিগলিত হয় না, তাহাদিগকেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

অনঙ্গ প্রভুর শোকে প্রত্যহ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া মৃত্যুর কথা মনে তুলিয়া দিয়া সকলের শান্তি ভাঙ্গিয়া দেয় বলিয়া সকলেই বিরক্ত। কমলা তাহা করে না, তাহাতেও কাহারও মনে শান্তি নাই। প্রতিবেশিনীরা পুকুর-ঘাটে বাসন মাজিতে মাজিতে, স্নান করিতে করিতে এবং জলপূর্ণ কুম্ভকক্ষে ডাহিনে হেলিয়া পথে চলিতে চলিতে পরের ভাল মন্দের সমালোচনার মধ্যে কমলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন,—"মেয়েটার কি পাথুরে প্রাণ লো !—আহা, অমন বাপ ম'রে গেল, তা দুমাস চুলোয় যাক্ দুদিন চোখের জল ফেল্‌লে না গা !" প্রতিবেশীদের মধ্যেও কেহ কেহ [illegible] থাকেন,—"কলির ধর্ম্ম দেখ ! মেয়ের জন্যেই লোকটা ধনে প্রাণে [illegible] সেই মেয়ে বাপের শোকে একফোঁটা চোখের জল অবধি [illegible]না !"

সূর্য্যনারায়ণ মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া প্রতিবেশীদের হাতে ধরিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন,"কমলাকে তোমরা দেখো! বেশী আর কি ব'লে যাব, তোমাদেরও মেয়ে আছে।" প্রতিবেশীরা তাঁহার শ্রাদ্ধের দিনে সেই কথা মনে করিয়া আসিয়া লুচিমোণ্ডার ভাগটা কিছু বেশী করিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেলেন, তাহার পর আর কেহ একদিনও উঁকি দিলেন না। হরকুমার কেবল তাহা করিল না; সে প্রত্যহ দুইবেলা আসিয়া কমলার তত্ত্বাবধান করিয়া যায়। তাহার অতিমাত্র তত্ত্বাবধানে ক্রমে কমলার মনে একটা আশঙ্কা জাগাইয়া দিল। এখন সে আসিলেই কমলা বলিয়া থাকে,—"কেন এসেছেন? এখন যান! দরকার হ'লেই ডেকে পাঠাব।" সে কিছু দিয়া পাঠাইলেও কমলা তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠায়—"এ কেন? দরকার নেই,—হ'লে তখন চেয়ে পাঠাব।"

যে কাগজপত্র লইয়া হরকুমার সূর্য্যনারায়ণের মৃত্যু সময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তকে অশান্তিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, সেইগুলি লইয়া সে একদিন কমলার নিকটে উপস্থিত হইল।

কমলা তখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি?"

হর। মেন্যার বাপ আমার কাছে যত টাকা ধার ক'রেছিলেন তারই লেখাপড়া। অক

কমলা তাহ সব আমার কাছে এনেছেন কেন?

হর। া, মিনাকে দিয়ে যাব ব'লে।

কমল—"তাকে মি নিয়ে কি ক'রব?

হর াই না, খিরাবে।—তাঁর সাক্ষেতেই সে দিন পোড়াতে এনেছিনু. তিনি আ ক'রবে ভবেছিলেন।

কমলা। পোড়াতে হয় আপনিই পোড়ান্ গে ;—সব বেচে নিয়েও আপনার যদি কিছু পাওনা হয়, ব'ল্‌বেন্।

হরকুমার হাসিয়া বলিল, "কেন, তুমি দেবে না কি ?"

কমলা ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া উত্তর করিল, "যেই দেক, আপনার টাকা পাবেন। আপনার টাকা শোধ না ক'রলে যে বাবার আত্মার শান্তি হবে না।"

হর। তোমাদের ঘরবাড়ী বেচে নিতে হবে আমার এমন অভাব এখনও হয় নি কমলা! অন্য কা'রও কাছে বাঁধা রেখে পাছে সব নষ্ট করেন এই ভয়েই আমি আট্‌কে রেখেছিনু। আমি স্বচ্ছন্দ মনে তাঁকে আমার ঋণ থেকে মুক্ত ক'রে দিলুম।

এই কথা বলিয়া হরকুমার কাগজপত্রগুলি কমলার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কমলা সেইগুলিকে একটা বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিল।

সূর্য্যনারায়ণের মৃত্যুর পরেই অনঙ্গ কমলার শ্বশুরবাড়ীতে খবর দিতে চাহিয়াছিল ; "মরার খবর বাতাসে ব'য়ে নিয়ে যায় মাসী! আমাদের দিতে হবে না"—বলিয়া কমলা তাহা করিতে দেয় নাই। অনঙ্গ আবার একদিন বিরাজকে পত্র দিবার কথা বলিলে,সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না মাসী! যদি নাই শুনে থাকেন, তাঁকে এখন শুনিয়ে কা[illegible] নি।—তাঁর বে হবার কথা আছে।"

৭

জলপূর্ণ কুম্ভের উপর দিয়া নদী বহিয়া গেলেও[illegible] আর তাহাতে বিন্দুমাত্রও প্রবেশ করিতে পারে না ; কিন্তু নূতন [illegible]প পুরাতনের ভারটাকে আরও ভারী করিয়া তুলে। পিতার [illegible] কমলার
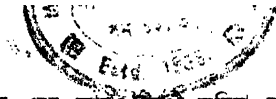
পূর্ব্বের দুঃখরাশিকে যেন আরও ভারী করিয়া তুলিতেছিল। সেই অলঙ্কার হরণের পর বিরাজ আর কোন পত্রাদি দেয় নাই। তরঙ্গিণী নিজে লিখিতে বা পড়িতে জানে না। জানাজানি হইলে পাছে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটে এই ভয়ে কমলাও তাহাকে পত্র দেয় না। সময়ে সময়ে বিরাজকে একখানা পত্র লিখিবে বলিয়া সে দোয়াৎ, কলম, কাগজ লইয়া লিখিতে বসে; কিন্তু লেখা হয় না, কি ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে সব তুলিয়া রাখে।

একদিন অনঙ্গের মত বাসি ভাত ছিল বলিয়া কমলা উনন জ্বালে নাই; মধ্যাহ্নে ঘরের মেজেতে পড়িয়া অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের নানা কথা মনে মনে তোলা পাড়া করিতেছিল, এমন সময়ে অনঙ্গ একখানা পত্র আনিয়া তাহাকে দিয়া চলিয়া গেল। কমলা উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বিরাজ পত্র লিখিয়াছে:—

"আসিয়া অবধি তোমাকে পত্র দিতে পারি নাই বলিয়া যদি মনে করিয়া থাক, নূতন পাইয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি, তবে ভারী ভুল করিয়াছ। বাবাকে আমি স্পষ্টই বলিয়াছি, বিবাহ করিব না। তুমি বলিবে অন্যায় করিয়াছি। হয় ত তাহাই ঠিক; মাবাপের অবাধ্য হওয়া যে অন্যায় তাহা আমিও বুঝি; কিন্তু মাবাপের অনুরোধে ধর্ম্মপত্নীকে অকারণে ত্যাগ করিয়া আবার একটা বিবাহ করাও যে পুণ্যকাজ তাহাই বা কি করিয়া মনে করি? তাঁহারা যুক্তির কথায় কাণ দেন না, মিনতিও শুনিতে চাহেন না। আমি তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি,—"তাকে না ক্ষমা করেন, আমাকে করুন! তাকে নিয়ে ঘরসংসার ক'রতে চাই না, কিন্তু আবার একটা বিয়ে ক'রতে ব'লে আমাকে অবাধ্য হ'তে বাধ্য ক'রবেন না!'—তাতেও নিষ্কৃতি নাই। তোমার ও আমার সুখ-

দুঃখের কথা ছাড়িয়া দিলাম ; কিন্তু আর একটা বালিকার চিরজীবনের সুখ দুঃখের কথাও ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন ? বিবাহ করিলেও কি আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিব ? অসম্ভব কমলা ! তুমি যদি আপনার দুঃখ ভাবিয়া আমাকে মাতা ও পিতার বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতে, জীবনব্যাপী বিরহ-বিষাদকে সহাস্যমুখে আলিঙ্গন করিয়া জীবনের পরপারে মিলনের সাধ পূর্ণ করিতে না চাহিতে, তাহা হইলেও হয়ত তাহা কখন সম্ভব হইত। যে হৃদয়ে তোমার স্থান হইয়াছে তাহাতে আর এ জীবনে কাহারও স্থান হইবে না।

তুমি না দিলেও তোমার বিপদের সংবাদ এখানে আসিয়াছে। মনে করিও না আর সকলের মত আমিও তোমার অসহায় অবস্থার দুঃখে উদাসীন। সুধাকে সেই দেশে একখানা বাড়ী ঠিক করিয়া পত্র দিতে লিখিয়াছি। তাহার উত্তর পাইলেই গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব। তুমি প্রস্তুত থাকিও !

দেশ ছাড়া ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতে পাই না। এ দেশ, এ সমাজ, তোমাকে আমাকে এ জীবনে কখন মিলিতে দিবে না। তুমি কি চিরজীবন এমনি অসহায় অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিবে, আর আমিও কি এমনি করিয়া স্রোতের আবর্জ্জনার মত ভাসিয়া ভাসিয়াই বেড়াইব ? না কমলা ! তুমি যেন আর ইহাতে অন্যমত করিও না ; আমার ইচ্ছায় বাধা দিও না !"

কমলা পত্রখানা পড়িয়া গালে হাত দিয়া ভাবিল,—"এমন ক'রে দেশ ছেড়ে চ'লে যাওয়াটা কি তাঁর ভাল হ'বে ?—সে বিচারে আমার দরকার কি ? তিনি যাতে সুখী হ'ন তাই করাই আমার কর্ত্তব্য। তিনি কি এ'তেই সুখী হ'বেন ?—কেন হবেন না ? হলই বা বিদেশ,

সেখানে তাঁর প্রাণের সুধাংশু আছে;—আর যদি আমি যাই,—আমরা দুজনে মিলেও কি তাঁর প্রবাসকে সুখের ক'রে রাখ্‌তে পারব না?—কর্ম্মে শ্রান্ত হ'য়ে বাসায় ফিরে এসে যখন দেখ্‌বেন, আমি তাঁর পরিচর্য্যা কর্‌বার জন্যে তাঁর পথ চেয়ে ব'সে আছি, তিনি কি সুখী হবেন না?—কিন্তু সে সুখ কি চিরদিন তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারবে? আমি শুধু তাঁকে পেলেই অনন্ত জীবন সুখে কাটীয়ে দিতে পারি। তিনিই আমার সব;—আমার সংসার, সমাজ, সুহৃদ্, সঙ্গী, গুরু,দেবতা, আনন্দ, সুখ, ইহকাল, পরকাল; কিন্তু তাঁর জীবন ত আমার মত এমন সঙ্কীর্ণ নয়,—শুধু বাড়ীটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়! তাঁর জীবনের যে আরও অনেক মহৎ উদ্দেশ্য আছে, আরও অনেক গুরুতর কর্ত্তব্য আছে! আমার কর্ত্তব্য সেই সকলে তাঁকে উৎসাহ দেওয়া। শুধু সুখে দুঃখে নয়;—ধর্ম্মে, উচ্চ জীবনের আনুষঙ্গিক বিপদে তাঁর সঙ্গিনী হওয়া, তাঁর দুঃখে বুক পেতে দেওয়া! তা না ক'রে আমি তাঁকে শুধু নিজের সুখটুকু নিয়ে থাক্‌তে উৎসাহ দে'ব?"—কমলা বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল; অস্থির পদে কিয়ৎক্ষণ কক্ষতলে বিচরণ করিয়া বাতায়ন সন্নিধানে আসিয়া দূর আকাশে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শয্যার উপরে আসিয়া বসিল। বিরাজের পত্রখানা উপাধানতলে রাখিয়া দিয়া আবার উঠিয়া এ-ধার ও-ধার করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কি ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ সেইভাবে বেড়াইয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল,—"আমার ওপরে এতটা ভালবাসা থাক্‌তে তিনি কর্ত্তব্যের পথে মনকে স্থির ক'রতে পারবেন্ না।—নিজের তুচ্ছ সুখের জন্তে একটা সংসারের সুখ নষ্ট ক'রে দে'ব?—না"—এই বলিয়া সে কাগজ কলম লইয়া বিরাজকে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিল। স্বার্থপরতার জন্য লজ্জা দিয়া অনেক কথা লিখিয়া শেষে

লিখিল,—"তুমি বিদ্বান্, আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, বারম্বার আর তোমাকে কি বলিব ? তুমি যদি মাবাপের অবাধ্য হও, তবে নিশ্চয় বলিতেছি আমিও তোমার অবাধ্য হইব। তুমি যদি তাঁহাদের লুকাইয়া আমাকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া যাইতে চাও, তবে নিশ্চয় জানিও আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।"

পত্রখানা লিখিয়া কমলা পড়িল, পড়িয়া আবার মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সঙ্গিহারা ও পথহারা হইয়া জনহীন মরুমধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা তরুচ্ছায়াময় সরোবরতটে সঙ্গীর দেখা পাইলে, অথবা পোতমগ্ন হইয়া বিজনদ্বীপে বহুদিন বাস করিতে করিতে নিকটে স্বদেশ-গামী জাহাজ আসিয়া লাগিতে দেখিলে মনটা যেমন প্রফুল্ল হয়, বিরাজের পত্র পাইবার পর হইতে কমলার মনটাও সেইরূপ হইয়াছে। তাহার সব দুঃখ, শোক, বিষাদ ও আশঙ্কা যেন সূর্য্যের উদয়ে বিগতা তমস্বিনীর অন্ধকারের ন্যায় কোথায় সরিয়া গিয়াছে।

মধ্যাহ্নে একদিন অনঙ্গ কোথায় হাটে বাটে গিয়াছে। কমলা বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে একটা কাজ লইয়া ব্যস্ত আছে। কাজ আর কিছুই নহে, তাহাদের ঘরে যত গুলি ঘরসাজান জিনিষ ছিল, তাহার মধ্যে বিরাজ যেগুলিকে বড় পছন্দ করিত সেইগুলিকে নামাইয়া ধূলা ঝাড়িয়া সে এক ধারে গুছাইয়া রাখিতেছিল। ইচ্ছাটা, বিদেশে গিয়া তাহারা যে নূতন সংসার পাতিবে এইগুলিকে সেইস্থানে লইয়া গিয়া সেই ঘরখানিকে মনোমত করিয়া সাজাইয়া লইবে। সে যখন এই প্রীতির

পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্তদেহ হইয়া গায়ে মাথায় ধূলা ও ঝুল মাখিয়া তাহা লইয়াই বিব্রত আছে, সেই সময়ে কে বাহিরের দরজা ঠেলিয়া তাহাকে ডাকিল।

কমলা শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

উত্তর হইল, "আমি গো মা! দ্বারটা একবার খুলে দাও ত!"

কমলা কণ্ঠস্বরে বুঝিল, আগন্তুক তাহার পিতার গুরুপুত্র কেনারাম চূড়ামণি। সে আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া বাঁধিয়া কাজ করিতেছিল; তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া মাথায় একটু তুলিয়া দিয়া, আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং চূড়ামণি ভিতরে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন পাতিয়া দিল।

চূড়ামণি বলিলেন, "এখন আর বসা হবে না মা! তোমাকেও এখনি একবার আমার সঙ্গে যেতে হ'চ্ছে।—তোমার শ্বশুর তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন; কি বিশেষ কথা আছে।"

এ অভাবনীয় সংবাদে কমলা যেন উচ্চ আকাশ হইতে একেবারে পাতালে পড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় তিনি?"

চূড়ামণি। এই যে এই পঞ্চানন তলায়।

কমলার ভ্রূদেশ কুঞ্চিত হইল। একটু ভাবিয়া বলিল,—"তা সেথা কেন? আমাদের বাড়ীতে এলেও কি তাঁকে একঘোরে হ'তে হবে?"

চূড়ামণি হাসিয়া বলিলেন, "তা নয়, তা নয়;—কি জান, যাওয়া আসা ত বড় নেই, তাই একবারে বাড়ীতে আস্‌তে পারছেন না।—আর লোকটা মানী, কে কি ব'ল্‌বে তাও বটে।" দেবতার স্থানে আর কারু কোন কথা বলবার নেই।"

কমলা। তা তিনি বড়লোক ব'লে না হয় তাঁর মানের ভয় বড় বেশী, গরীব দুঃখী হ'লেও সে ভয় ত আমারও কিছু আছে? এতটা পথ যাব, লোকে দেখে আমাকেও কিছু ব'ল্‌তে পারে না?

চূড়ামণি। ইশ্‌! অমনি ব'ল্‌লেই হ'ল আর কি!—এই ত পঞ্চানন-তলা গা! তোমাদের বাগানের ভেতর দিয়ে পথ। দিনের বেলা আমার সঙ্গে দেবতার স্থানে যাবে, কার বাপের সাধ্যি কোন কথা বলে?—এস!

গুরুজনের আহ্বান। পিতার গুরুপুত্র ব্রাহ্মণ স্বয়ং দৌত্য স্বীকার করিয়া এতটা আসিয়াছেন। মনে যাহাই থাক কমলা মুখে আর কিছু প্রতিবাদ করিল না। গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া, ঘরে বাহিরে কুলুপ দিয়া, বাহির হইল; এবং শ্বশুরের এমন হঠাৎ এতদূর আসিবার অভিপ্রায় কি হইতে পারে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চূড়ামণির পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

সূর্য্যনারায়ণের বাড়ীর অনতিদূরে বনবেষ্টিত এক ভগ্ন মন্দিরে পঞ্চানন দেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই দেবতা না কি এক সময়ে ভারী জাগ্রত ছিলেন। তাঁহার নিকটে আসিয়া যে যাহা মানস করিত, তাহাই সিদ্ধ হইত; আর তিনিও খুব পূজা পাইতেন। এখন কিন্তু হয় তিনি প্রগাঢ় নিদ্রিত, অথবা মানুষের মত যদি দেবতারও সুসময় দুঃসময় থাকে তবে তাঁহার ভারী দুঃসময়। কারণ, এখন আর তাঁহার মন্দির-প্রাঙ্গণ ছাগ-শোণিতে রঞ্জিত হয় না, মন্দিরের অভ্যন্তরও পূজার উপহার অথবা পুষ্প-সম্ভারে শোভিত হয় না। কদাচিৎ কোন রুগ্ন পল্লীবালকের জটিল রুক্ষ কেশ ভিন্ন তিনি আর অন্য উপহার পান না। তাঁহার সে স্থানটুকু কিন্তু বড় মনোরম, নির্জ্জন, নিভৃত ও ঘনচ্ছায়াময়। সেই স্থানে আসিলেই মনে কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়। কেহ বলে তাহা দেবতারই মাহাত্ম্য,

কেহ বলে উপদেবতার প্রভাব, আবার কেহ বা বলিয়া থাকে, নিভৃত প্রদেশের স্বভাব। নীলকমল এই দেবস্থানে বসিয়া কমলার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অচিরেই দেখিতে পাইলেন অদূরে চূড়ামণির পশ্চাতে বনপথ আলো করিয়া তাঁহার পুত্রবধূ আসিতেছে।

বিরাজ প্রবাসযাত্রার সঙ্কল্প করিয়া যে পত্র দিয়াছিল, সেখানিকে কমলা উপাধানতলেই রাখিয়া দিয়াছিল ; মাঝে মাঝে সে সেইখানি পড়িয়া দেখিত, আবার সেই স্থানেই রাখিয়া দিত। দুর্দৈববশে বিছানা ঝাড়িতে গিয়া একদিন তাহাতে অনঙ্গের চক্ষু পড়িল। যে কাগজের বিনিময়ে টাকা পাওয়া যায় তাহা ছাড়া অন্য কিছু কাগজপত্র রাখিবার যে কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিতে পারে অনঙ্গ তাহার দীর্ঘজীবনেও সে-কথা বুঝিতে শিখে নাই। সে ঘর ঝাঁটাইয়া ধূলা ও জঞ্জালগুলি তাহাতে তুলিয়া পথে ফেলিয়া দিল। সেই পত্র কোন প্রকারে নীলকমলের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। তাহারই ফলে তাঁহার এই শুভাগমন ও পুত্রবধূকে আহ্বান।

হৃদয়ে যাহাদের ভক্তি আছে তাহারা স্বর্ণচূড় মন্দিরের কাঞ্চন প্রতিমায় যে দেবত্বের মহিমা অনুভব করে, ভগ্নচূড় মন্দিরের গঠনপারিপাট্যশূন্য উপলখণ্ডেও তাহাই করিয়া থাকে। কমলা আসিয়াই প্রথমে ভক্তিভরে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিল, পরে শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আহ্বানের কারণ শুনিবার প্রতীক্ষায় একটি ধারে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলকমল আশীর্ব্বাদ করিয়া পুত্রবধূকে বসিতে বলিলেন। কমলা বসিলে, তিনি এতদিন যে কারণে তাহার উদ্দেশ লইতে পারেন নাই সংক্ষেপে তাহা বলিয়া, উপস্থিত যাহা বক্তব্য তাহারই অবতারণা করিয়া

বলিলেন, "আমার ত বড়ই সঙ্কট, মা! বিরাজকে ত কিছুতেই বিবাহে সম্মত ক'রতে পারছি না।—"

চূড়ামণি তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন,—"এখন তোমার শ্বশুরের বংশটা যাতে থাকে, পিতৃপুরুষেরা এক গণ্ডূষ জল পান, তার ত একটা উপায় ক'রতে হবে!"

কমলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি কি ক'রলে তা হয় বলুন্!"

নীলকমল। তুমি এতটা কাছে থাকলে, আর তোমার সঙ্গে পত্র লেখালেখি থাকলে, বিরাজ কিছুতেই মন স্থির ক'রতে পারবে না! আমি বলি কি তুমি এখন দিনকতক কোথাও একটু দূরে গিয়ে লুকিয়ে থাক। তারপর সমাজ তোমাকে ক্ষমা করে, আমার না হয় তুই পুত্রবধূ হবে!

চূড়ামণি। আর তোমারও এমন নিঃসহায় হ'য়ে থাকাটা ভাল নয়;—বুঝে দেখ, এতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

বিরাজের পত্র পাইবার পর হইতে কমলার ভবিষ্যৎগগন যে সব আশার অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন ইন্দ্রধনুর মত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল!—এই কয়েকদিন ধরিয়া সে নিজের মানসপটে যে সকল সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, সব সন্ধ্যাগগনের স্বর্ণপয়োদচিত্রের ন্যায় নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল!—একটি একটি করিয়া আশার উপল কুড়াইয়া সে মনে মনে যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা যেন তাসের ঘরের মত এক নিঃশ্বাসে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এক একগাছি করিয়া কল্পনার সূক্ষ্ম সূত্র টানাইয়া সে যে শান্তির বিস্তৃত বিতান বয়ন করিতেছিল, তাহাও যেন প্রবল

ঝঞ্ঝাছিন্ন ঊর্ণাজালের ন্যায় পলকে ছিঁড়িয়া উড়িয়া গেল! নিজের সুখ-দুঃখের কথা দূরে যাউক, এখন নিজের কর্ত্তব্য কি সে তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বিরাজের কথামত কাজ করিতে হইলে শ্বশুরের কথা অমান্য করিতে হয়, আবার শ্বশুরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইলেও স্বামীর অবাধ্য হইতে হয়। সে কি করিবে?

কমলা অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া সেই পরিত্যক্ত প্রাঙ্গণের অনেকগুলি তৃণ উৎপাটিত করিয়া একত্র করিল; শেষে নত মুখ আরও নত করিয়া বলিল, "আমি আপনাদের অবাধ্য হ'তে চাই না; কিন্তু এছাড়া কি আর কোন উপায়ই নেই?"

আর কোন উপায় আছে কি না নীলকমল তাহা ভাবিয়া আসেন নাই; থাকিলেও তিনি তাহাতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কিছু বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চূড়ামণি তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আর কি উপায় আছে তুমিই বল না বাছা! তোমার শ্বশুরবাড়ীর পথ ত একবারেই রুদ্ধ, কোন মুক্ত হয় এমন আশাও দেখি না।"

কমলা। কেন, আমার অপরাধ?

চূড়ামণি। যাই হ'ক, আর কিছু নাই হ'ক, দশ জনে যা ব মেনে চ'ল্‌তেই হবে?

কমলা। দশ জনে যদি একটা ভুল বুঝে থাকে, সেট একবার বুঝিয়ে ব'লে দিতে হবে?

চূড়ামণি। তাতে তোমার শ্বশুরকেই দশ জনের ক হবে।

কমলা। সেই একটু ছোট হবার ভয়ে তিনি কি

ব'লে মেনে নেবেন ?—তিনি যদি নিজের সংসারের হিতের জন্যে সে অপমানটুকুও স্বীকার ক'রতে না চান, তবে আমি কিসের জন্যে দুঃখের ওপরে দুর্নাম কুড়ুতে যাব ? কি জন্যে কোথা গেছি তা কেউ জান্‌বে না, তাতে আমার কলঙ্কের ভয় নেই ?

চূড়ামণি। তুমি যদি দেশেই না থাক তবে আর সে কলঙ্কে তোমার ভয় কি ?—তোমার শ্বশুরেরই বরং সে ভয় বেশী। যে যা বলে বলুক না, আমরা ত জেনে রইলুম তুমি কি জন্যে কোথা যাচ্ছ।

কমলা দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, "আপনাদের জানা না জানাতে আমার কিছুই আসে যায় না ; আমার স্বামী ত তা জান্‌বেন না। এখন তিনি জা্‌নেন আমার অপরাধ কিছুই নয়,—তিনি আমাকে আশ্রয় দিতে সম্মত আছেন ; কিন্তু যদি তাঁকে কিছু না বলে চ'লে যাই, আমি তাঁর কাছে অপরাধিনী হ'ব। আমি তা ইচ্ছে করি না।

চূড়ামণিও এইবার নিরুত্তর হইলেন। কমলাকে ইহাতে রাজী পারিলে নীলকমল তাঁহাকে খুসী করিবেন আশা দিয়াছেন। নিরাশ হইয়া তিনিও বিমর্ষভাবে বসিয়া শিখার গ্রন্থিমোচন করিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"প্রাপ্তিস্তু লালাটিকী !"—আমার ই, নইলে তেমন মেয়ের মতিগতি এমন হবে কেন ?"

ই নীরব। তিন জনেই নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। কিছু স্থানের স্বাভাবিক নিস্তব্ধ ভাবটা অভগ্ন রহিল। অবশেষে ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি যা বল্‌ছ তা সবই মাদের অনুরোধে তোমাকে এ কাজটা ক'রতেই হবে। র একার একটু দুঃখ ; অন্যদিকে কত জনের কত দুঃখ থি !—আমার সংসারটা ত একবারেই উৎসন্নে যেতে

ব'সেছে ;—এক পুত্র, না গৃহী না উদাসীন। ভাইপো ত অনেক দিন থেকেই বাড়ী ছেড়ে গেছে। তোমার শাশুড়ী একেই ত সে কেমন একতর, তা'তে আবার বিরাজের এই রকম ভাবে সে যেন একবারে ক্ষ্যাপা হ'য়ে উঠেছে। স্বর্গে পিতৃপুরুষেরাও পিণ্ড লোপের আশঙ্কায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। আর কটি বলি বল!"

কমলা ছল ছল চক্ষে নিম্নে চাহিয়া ঈষৎ একটু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমিই যদি আপনাদের সবার সব দুঃখের মূল হ'য়ে থাকি তবে যাতে আমার মরণ হয় এমন কিছু বিহিত করুন! আমি আত্মঘাতিনী না হ'য়ে ম'রতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু যাতে দুর্নাম, যাতে জন্মের মত স্বামীর মনের বা'র হ'য়ে যেতে হবে, আমাকে তেমন কিছু ক'রতে আজ্ঞা ক'রবেন না!"

চূড়ামণি যেভাবে নীলকমলের দিকে চাহিলেন, তাহার অভিপ্রায় যেন সেই রকমেই কিছু একটা করা হয়। যে নীলকমল এক রাত্রির মধ্যে মানুষের বহুদিনের বাস তুলিয়া দিয়া তাহার উপরে পুকুর কাটাইয়া বাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন এবং বিবাদী পুকুর রাত্রির মধ্যে বুজাইয়া তাহার উপরে কলার বাগান বসাইয়া পুলিশের তদন্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, একটা অসহায় অবলার অস্তিত্ববিলোপ করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর কিছুই নহে। তাঁহার বোধ হয় সেরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ বাছা! জোর জবরদস্তির কথা নয়,—তোমার ইচ্ছে! তোমার স্বামীর আর স্বামিকুলের হিতের জন্যেই আমি একথা বলছি; আমার আর কি? তুমি যদি সে হিত না চাও, বল, ফিরে যাই ;—আর কি ক'রব।"

কমলা স্তব্ধভাবে বসিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, "এতেই যদি তিনি সুখী হ'ন, আপনাদের সবার মঙ্গল হয়, তবে আমি তাই ক'রব ; কিন্তু আমার ত আর কোথাও গিয়ে থাক্‌বার মত ঠাঁই নেই ।"

চূড়ামণির ম্লান ও মৌন মুখখানি এতক্ষণে প্রফুল্ল ও বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। তিনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "সে বন্দোবস্ত কি তোমার শ্বশুর না ক'রে দেবেন গা ? তোমার বাসের জন্যে যে স্থান ঠিক করা হ'য়েছে, অল্প পুণ্য নিয়ে সেথা কেউ যেতেই পারে না। হিন্দুর যা প্রধান তীর্থ, বিশ্বেশ্বরের সেই আনন্দ-কাননে, ব্রহ্মাবিনির্ম্মিত বারাণসী ধামে তোমার বাসস্থান ঠিক করা হ'য়েছে। আহা ! কাশী কি যে সে স্থান মা !— 'কাশী কল্পলতা সমস্ত ফলদা কাশীব কাশীপুরী !'—কাশীর তুলনাই নেই, যেমন, 'গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ !'—"

চূড়ামণি কিঞ্চিৎ লাভের আনন্দে অধীর হইয়া শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অন্তঃসারশূন্য প্রগল্‌ভ ব্রাহ্মণের শুষ্ক বাক্যের আড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া, ঈষৎ বক্রভাবে একবার চকিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কমলা বলিল, "কাশী তীর্থ হ'ক, আর অতীর্থই হ'ক, আমার তাতে কি দরকার ঠাকুর ? সধবার তীর্থ স্বামিগৃহ, দেবতা স্বামী ; এ দুই-ই যাকে ছেড়ে যেতে হ'বে, কাশী তার চক্ষে আনন্দ-কানন নয়,— মহাশ্মশান। জানেন যদি ত বলুন সে স্থান নিরাপদ কি না, কুলবধূর বাস করবার উপযুক্ত কি না।"

নীলকমল। আমি তা না জেনেই কি তোমাকে কোথাও পাঠাব মা ? সে বাড়ীতে আর কেউ নেই, তোমারই বাপের এক গুরুকন্যা বাস করেন; আর ইনি নিজে গিয়ে তোমাকে তাঁর কাছে রেখে আস্‌বেন। আমি মাসে মাসে তোমার সব খরচপত্র পাঠিয়ে দেব। তোমার কোন রকম কিছু

অসুবিধে হবে না। কিন্তু দেখো মা! মনে থাকে যেন ইনি ব্রাহ্মণ,—তোমার বাপের গুরুপুত্র; আর আমি তোমার গুরুজন! আমাদের কাছে, এই দেবতার স্থানে ব'সে যা ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'লে যেন তার অন্যথা ক'রো না! আমরা যে তোমাকে পাঠাচ্ছি একথা যেন কোন রকমে প্রকাশ না হয়।

কমলা ম্লানমুখে একটু হাসিল; তৎপরে ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যেতে হবে?"

চূড়ামণি। শুভস্য শীঘ্রং।

নীলকমল। আজই রাত্রিতে তুমি গিয়ে চূড়ামণিঠাকুরের বাড়ীতে থাক! প্রভাতের পূর্ব্বেই ইনি তোমাকে নিয়ে যাত্রা ক'রবেন। খরচপত্র সব এখনই আমি এঁরই হাতে দিয়ে যাব।

কমলার মুখ একটু বিষণ্ন হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা নীচু করিয়া মাটীতে দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল,—"তাঁকে আমার কিছু ব'লে যাবার আছে; আমি যদি তাঁকে একখানা পত্র লিখে দিয়ে যাই তা'তে কি আপনার কিছু আপত্তি হবে?—আপনি সে পত্র দেখ্‌তে পারেন। আপনাদেরই হাতে দিয়ে যাব?"

চূড়ামণি চক্ষুদুটিকে বড় বড় করিয়া নীলকমলের দিকে চাহিলেন। নীলকমল একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তাকে তুমি কি ব'লে যেতে চাও তা না শুনে কি ক'রে বলি আপত্তি আছে কি নেই?"

কমলা। বাবা আমার বের সময়ে আমাদের গ্রামের জমীদার বাবুর কাছে বিষয় বন্দক রেখে কিছু টাকা ধার ক'রেছেলেন, সে সব কাগজপত্তর আমারই কাছে আছে। বিষয়গুলি বেচে তাঁর টাকা শোধের একটা ব্যাবস্থা ক'রতে হবে, দেনা হয় কিছু টাকা দিতেও হবে। এই কথাগুলি

তাঁকে ব'লে যাব; আর আমি যে জন্মের মত সংসার ছেড়ে যাচ্ছি সে কথাটারও একটু আভাস দিয়ে যাব। ম'রে গেছি শুন্‌লে আর তিনি অন্য রকম কিছু মনে ক'রতে পারবেন না।"

নীলকমল। এই কথা!—তা তার জন্যে আর তাকে লেখ্‌বার দরকার কি?—তুমি সে সব কাগজপত্র চূড়ামণির হাতে দিয়ে এখনই আমাকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে। আমি সে সব বন্দোবস্তের ভার নিচ্ছি, যা দিতে হয় দেব। আর তোমার অকস্মাৎ মৃত্যুর কথাও আমি কালই দেশময় প্রচার করাব। তা হ'লে হবে ত?

কমলা ঘাড় একটু হেলাইয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। বিদায়ের সময়ে পুনর্ব্বার দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সজলনেত্রে মনে মনে বলিল, শঙ্কর! তুমি জেনে রইলে আমি ইচ্ছে ক'রে তাঁর অবাধ্য হচ্ছি না!—মঙ্গলময়! এতেই যেন সবার মঙ্গল হয়!—তিনি সুখী হ'তে পারেন!"

* * * *

মধ্যাহ্নে কমলা স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, অপরাহ্নে তাহাকে স্বামিসঙ্গের আশা ত্যাগ করিয়া প্রবাসে বন্দিনী হইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। ইহাতে সঙ্গে লইয়া যাইবার মত কিছুই দেখিতে পাইল না। যে জিনিষগুলিকে তত পরিশ্রম করিয়া তত যত্নে গুছাইতেছিল, সেইগুলির দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল এবং তোরঙ্গ খুলিয়া মোটা দেখিয়া দুইখানি পরণের কাপড় বাছিয়া লইয়া নিজের গামছাতে বাঁধিয়া এক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া দিল।

কমলার একটি শুকপক্ষী ছিল তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেটি তাহার শৈশবের সঙ্গী। তির্য্যক্‌চিত্তের প্রীতিপ্রবণতা কত তাহা বলা যায় না; কিন্তু স্বাধীন পক্ষীকেও এই পরাধীনতাটা এতই ভাল

লাগিয়াছিল যে, পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত পাইলেও সে কখন পলাইবার চেষ্টা করিত না। দুধ দিতে বা ছোলা দিতে বেলা হইয়াছে বলিয়া অনঙ্গের উপরে রাগ করিয়া কমলাই কতদিন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, সে তবু উড়িয়া যায় নাই; কিন্তু আজ যখন কমলা সজলনেত্রে পিঞ্জরের বাহিরে আনিয়া নিজ বিম্বাধরে শুকের কিংশুকাস্য চুম্বন করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিল, সে আর একবারও কোথাও বসিল না! একেবারে উধাও হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল! অতঃপর যে আর কমলার করকমলপ্রদত্ত আহার্য্যের আশা নাই, শুকও কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল?

বেলা থাকিতে থাকিতেই কমলা অনঙ্গকে খাওয়াইয়া দিল। সন্ধ্যার পরেই অনঙ্গ নিজ মলিন শয্যাটি বিছাইয়া শয়ন করিল এবং অনতিবিলম্বেই নিদ্রিত হইল। কমলা চূড়ামণির আগমন চাহিয়া বাতায়নতলে বসিয়া রহিল। সেই স্থানে বসিয়া সে অতীত ও ভবিষ্যতের কত কথাই ভাবিতে লাগিল। যখন মনে করিল "চূড়ামণিঠাকুরের আগেই যদি তিনি এসে পড়েন—কি ব'লে তাঁকে ফিরিয়ে দেবো!" তাহার বোধ হইল যেন কে ভোঁতা ছুরী দিয়া তাহার মর্ম্মের শিরাগুলিকে কাটিয়া দিতেছে। যখন ভাবিল, "তিনি যখন এসে দেখ্‌বেন আমি বাড়ীতে নেই, কোথায় গেছি কেউ জানে না, তখন তিনি কি মনে ক'রবেন?"—তাহার দুই চক্ষে যেন শ্রাবণের ধারা বহিতে লাগিল।

৯

নীলকমল কমলাকে সত্যের বন্ধনে বাঁধিয়া প্রবাসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন বিরাজ বাড়ী আসিয়াছে। সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়াই বাহিরে চলিয়া গেল, কোন কথা

কহিল না। নীলকমল দেখিলেন, অনেক দিনের পরে সে আজ ভাল কাপড় পরিয়াছে, ভাল জামা গায়ে দিয়াছে, তাহার মুখখানিও আজ বেশ প্রফুল্ল।

বিরাজ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একাকী গঙ্গাতীরের দিকে চলিল এবং তীরে আসিয়া বেশ একটু নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া লইয়া বসিল। সুধাংশু বাড়ী স্থির করিয়া পত্র দিয়াছে। বিরাজ আজই রাত্রিযোগে কমলাকে লইয়া যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়া গৃহ হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছে। তাহার মনটা আজ সত্য সত্যই বেশ প্রফুল্ল। সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া সে সহর্ষমনে গঙ্গার তীরশোভা দেখিতে লাগিল।

শরতের রবি অস্ত যাইতেছিল। বর্ষাধৌত তীরতরুরাজির স্নিগ্ধ নীলিমার উপরে অস্তমান সূর্য্যের হৈম রশ্মি পতিত হইয়া উজ্জ্বল ও মধুরের একটা মনোহর সমাবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। কর্ম্মশ্রান্ত ধরণীর জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই যেন কেমন একটা মধুর ও সুন্দর অবসাদের ভাব লক্ষিত হইতেছিল। সায়াহ্নের শীকরবাহী মৃদু সমীরণ যেন কোন প্রাণায়ামনিরত মহাযোগীর রেচক-শ্বাসের ন্যায় অতি ধীরে ও একভাবে বহিতেছিল। কোথাও একটু চঞ্চলতা নাই; কেবল নাগরাভিসারিণী সুবর্ণালঙ্কৃতা সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা পূর্ণযৌবনার ন্যায় সাগরাভি-সারিণী স্বর্ণরবিকরমণ্ডিতা পূর্ণসলিলা ভাগীরথীর তরঙ্গস্ফীত বক্ষে ঈষৎ চঞ্চলতা লক্ষিত হইতেছিল।

ক্রমে, সন্ধ্যা হইল। দিবালোক নির্ব্বোধ চিরক্রিয়ের কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া তাহার আর এক দিনের আয়ু হরণ করিয়া প্রদোষের ছায়ায় মিশাইয়া গেল। প্রতীচীদিগ্‌বধূ সায়াহ্নের সিন্দূরশোভা তিমিরাবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া দিল। নক্ষত্ররাজি নীল আকাশে ফুটিয়া উঠিল। তীর-বনালী

রাত্রির অন্ধকারে অঙ্গ মিশাইয়া দিল। প্রদোষমাত্রতিমিরা রজনীর পূর্ব্ব গগন দেখিতে দেখিতে চন্দ্রের উদয়ে আলোকিত হইয়া উঠিল। বিরাজও ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রাম ছাড়াইয়া প্রান্তর-পথে আসিয়া পড়িল।

প্রান্তর-পথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যনারায়ণের বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বিরাজ দেখিল, বাহিরের দরজাটা খোলা রহিয়াছে! বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরের দরজাও সেইরূপ! ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মেজেতে পড়িয়া কে ঘুমাইতেছে। অনুচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "কমলা"! উত্তর নাই। আরও একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "মাসী!—" অনঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

অনঙ্গ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দীপটা জ্বালিল এবং এঘর সেঘর করিয়া কমলাকে ডাকিতে ডাকিতে খুঁজিতে লাগিল। কোন ঘরেই যখন দেখিতে পাইল না তখন বাড়ীর বাহিরে গিয়া বাগান, পুকুর-ঘাট, নিকট নিকট দুই একটা প্রতিবেশীর গৃহ খুঁজিয়া ফিরিয়া আসিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল।

বিরাজ দীপ লইয়া দেখিল, ঘরের মেজেতে অনেক জিনিষ ছড়ান রহিয়াছে; সংশয়জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে কেউ এসেছিল মাসী,—কেউ আসা যাওয়া ক'রত?" অনঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল সব বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারিল যে, কেবল হরকুমার মাঝে মাঝে আসিত, আর কেহই আসে নাই, আসিতও না।

বিরাজ স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দ্রুতপদে বাড়ীর বাহিরে কোথায় চলিয়া গেল।

* * *

গ্রামের আর এক প্রান্তে মাটীর প্রাচীরে ঘেরা মাটীর দেয়াল আর

খড়ে ছাওয়া দুইখানি বড় ঘর, আর একখানি রান্নাঘর। একখানি ঘরে চূড়ামণি ঘুমাইতেছেন; আর একখানিতে দুইটি স্ত্রীলোক এক শয্যাতে শয়ন করিয়া আছে। দুইজনের মধ্যে বর্ষীয়সী ও বিপুলাঙ্গী যিনি প্রথম বর্ষার ভেকধ্বনিবৎ নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘুমাইতেছেন তিনি চূড়ামণির সহধর্ম্মিণী; আর যে যুবতী জাগিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল সে কমলা।

অকস্মাৎ বহির্দ্বারে করাঘাতের শব্দে চূড়ামণির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ডাকাডাকির বড় একটা ঘটা নাই;—শুধু থাকিয়া থাকিয়া কপাটে ধাক্কা, কখন ধীরে, কখন বা একটু জোরে, আর মাঝে মাঝে কড়া ও শিকল নাড়ার খুট্ খাট্ ঝুন্ ঝান্ শব্দ। চূড়ামণি জাগিয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়া সেই সব শব্দভঙ্গী শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলেন,—ব্যাপারটা কি! সম্প্রতি যে কিছু টাকা আসিয়া তাঁহার সিন্দুকে উঠিয়াছে, দুষ্ট লোকে কি তাহারই সন্ধান পাইয়াছে? কিন্তু চুরি করিতে আসিয়া কে কোথায় গৃহস্থকে জাগাইয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বলে? ডাকাতেও সে অপেক্ষা করে না। এতটা রাত্রিতে কেহ যে দিন দেখাইতে বা ব্যবস্থা লইতে আসিবে তাহাও সম্ভব নহে। তবে এ কি?—তিনি মনে মনে এইরূপ নানা প্রকার তর্ক করিতেছিলেন এবং আমকাঠের ঘুণধরা জীর্ণ কপাটের বাধাপ্রদায়িকা শক্তির উপরে নির্ভর করিয়া আরও কিছুক্ষণ উদাসীন থাকিবেন কি না ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার কক্ষদ্বারে মৃদুমন্দ করাঘাতের শব্দ হইল। তিনি হাতে পৈতা জড়াইয়া মধুসূদন নাম জপ করিতে লাগিলেন। অধিকক্ষণ কিন্তু তাঁহাকে সেভাবে কাটাইতে হইল না; পরক্ষণেই শুনিতে পাইলেন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বলি জেগেছ গা, না ঘুমিয়ে আছ?"

রাত্রিবাসটুকু চূড়ামণির কটিতট হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সেটুকুকে কোমরে জড়াইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ভেতরে এস আগে দ্বারটা বন্ধ করি।"

ব্রাহ্মণী একটু বিলম্ব করিতেছিলেন; চূড়ামণি তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতরে টানিয়া লইয়া দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিতে করিতে নিম্নস্বরে বলিলেন, "তুমি যদি সাড়া দিতে আর একটুও দেরী ক'রতে, তা হ'লে বিছানা মাদুর সব অশুচি হ'য়ে যেত!"

ব্রাহ্মণী। তা হয় নি ত?

চূড়া। বিছানাটা ত হয় নি বোধ হ'চ্ছে, তবে কাপড়টার কথা এখন ঠিক্ বল্‌তে পারছি না। সে যা হ'ক এখন ব্যাপারটা কি বল্‌তে পার?

ব্রাহ্মণী। এ আর বুঝ্‌তে পার নি? মনে ক'রেছে মিন্‌সে বাড়ীতে নেই, মাগীটার মুখে কাপড় জড়িয়ে ঘটুটে বাটুটে যা আছে নিয়ে যাবে আর কি।

ব্রাহ্মণীর কথাগুলি কিছু স্ফুট হইয়া পড়িতেছিল। চূড়ামণি তাঁহার মুখে হাতটা চাপা দিয়া বলিলেন, "চুপ্! চুপ্! কর কি?"—তিনি যে ভাবে কথা কহিতেছিলেন তাহা দেয়ালের কাণ থাকিলেও বোধ হয় শুনিতে পাইত না।

ব্রাহ্মণী মুখ হইতে তাঁহার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "চুপ্ কি বল!—তুমি যে পুরুষমানুষ?"

চূড়ামণি। না নপুংসক;—তুমি মেয়েমানুষ আস্তে কথা কইতে পার না?

ব্রাহ্মণী। তুমিও চুপ্ কর, আর আমিও চুপ্ করি, ওদিকে দরজাটা ভেঙ্গে পড়ুক!

চূড়ামণি। পড়ে তার কি হবে, কাল তখন ছুতোর ডেকে আঁটিয়ে নিও!

ব্রাহ্মণী। বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি! ওরা বুঝি কেবল দোর ভাঙ্গ্‌তেই এসেছে, তাই ক'রে ফিরে যাবে?—

সেই সময়ে বাহিরের দ্বারে ধাক্কাগুলো খুব ঘন ঘন আর জোরে জোরে পড়িতেছিল। চূড়ামণিসিমন্তিনী স্বামীর ভীরুতায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জ্বালা! হ্যাঁ গা সাড়া দাও না!—জানুক্ যে বাড়ীতে ব্যাটাছেলে আছে।"

চূড়ামণি ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "উঁহু,—কিছুতেই না;—ডেকে ডেকে ফিরে যাবে এখন।"

"যা জান কর,—আমি শুইগে" বলিয়া ব্রাহ্মণী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, চূড়ামণি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলিলেন, "একটু দাঁড়াও না, দৌড়টাই দেখি।—আমার বোধ হ'চ্চে এই সম্বন্ধে একটা কিছু ঘ'টেছে।"

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁ এই সন্ধ্যের পরে এসেছে, কাগে বগেও টের পায় নি, এরি মধ্যে অমনি কি একটা ঘ'টেছে!

এই সময়ে বহির্দ্বারে খুব জোরে জোরে আবার গোটাকতক ধাক্কা পাড়ল। দরজাটা যেন তাহাতে পড় পড় হইয়া উঠিল। চূড়ামণিরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি সশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কে রে হারামজাদা ব্যাটা! দ্বারটা যে ভেঙ্গে প'ড়বে সে হুঁস্ নেই?"

বাহির হইতে উত্তর হইল,—"আজ্ঞে আমি, বিরাজমোহন;—একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ কথা আছে।"

চড়ামণির মুখখানা একবারে ম্লান হইয়া গেল। ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে আসিয়া মুখবিকৃতি করিয়া ব্রাহ্মণীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "এখন বুঝ্‌লে, আমি পুরুষমানুষ কি মেয়েমানুষ?—শুধু ম'রব কবে তাই জানি নি।"

ব্রাহ্মণী কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তার আর এতই ভয়টা প'ড়ে গেছে কিসের?—মানুষের বাড়ীতে মানুষকে এমন আস্‌তে নেই? তা'তে একটা সম্পর্ক র'য়েছে। বেরিয়ে শোনই না কি বলে।"

চূড়ামণি ব্যঙ্গস্বরে খুব বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এখন শোনই না কি বলে!—এতেই বলে "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।"

ব্রাহ্মণী। ওগো শোলোক সিদ্ধান্ত পরে ক'রো এখন, দোর খুলে বেরিয়ে পড়, দেরী ক'রলে যে আরো সন্দেহ বাড়বে!

চূড়ামণি রাগে গস্‌ গস্‌ করিতে করিতে আসিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! বিরাজমোহন বাবু!—এত রাত্রে কেন বাপু?"

বিরাজ। কমলা আপনার বাড়ীতে এসেছে?

চূড়ামণির বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকি পড়িতেছে কি দুইদশটা কামারশালা বসিয়া গিয়াছে—এমনি রকম দুপ্‌দাপ্‌ ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব্দ হইতে লাগিল। অন্তরের সে ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া বলিলেন,—"কমলা!"

বিরাজ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার পিতার শিষ্যকন্যা।

চূড়ামণি। আহা বেশ! তা আর আমি জানি না?—বলি ব্যাপারটা কি আগে খুলে বল দেখি!

বিরাজ। সে বাড়ীতে নেই; কোথা গেছে অনঙ্গও বল্‌তে পারে না।—আপনি কিছু জানেন?

চূড়ামণি একটু জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "সংশয়"—প্রকাশ্যে বলিলেন,—"তা কি ক'রে জানব বল, যাওয়া আসা ত এখন আর তেমন নেই বাপু!"

বিরাজ চূড়ামণির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কেন, আজ দুপুরবেলা আপনি তাদের বাড়ীতে যান নি?"

আশ্বিন মাস হইলেও রাত্রিটা বেশ একটু শীতের আমেজ লইয়া আসিয়াছিল, তথাপি চূড়ামণির ললাটে একটু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি যে মাটীর উপরে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন তাহা যেন সরিয়া গিয়াছে, আর তিনি শূন্যে রহিয়াছেন। খুব পিপাসার সময়ে মুখে একমুখ ছাতু পূরিলে কি খুব খাসা সন্দেশ গিলিতে গেলে যেমন দম বন্ধ হইয়া আইসে তাঁহারও তেমনি হইতেছিল। সুবিধার মধ্যে জ্যোৎস্নাটা তাঁহার মুখের উপরে পড়ে নাই। অতি কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া মুখে একটু রস আনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "একটা পূজা ছিল, বাপু! তাই পঞ্চাননতলায় যাবার আজ একবার দরকার হ'য়েছিল বটে; তাইতেই তোমাকে কেউ ব'লে থাকবে বোধ হয়;—তা—তা—সে যাই হ'ক, এখন তা হ'লে তুমি কোথা আর যাবে, বাড়ী যাও, কাল তখন সন্ধান ক'রো!

বিরাজ যে স্থানে দাঁড়াইয়া চূড়ামণির সহিত কথা কহিতেছিল তাহার নিকটের ঘরেই কমলা! সে সমস্ত কথাই শুনিতে পাইতেছিল। তাহার একদিকে স্বামী ও পুত্রকন্যাপূর্ণ সংসারসুখের আশা, আর একদিকে অজ্ঞাতবিপদপূর্ণ অজ্ঞাতবাসের দুঃখের আশঙ্কা! এই উভয়ের মধ্যে

একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার;—সে দ্বারের অর্গলও তাহারই হাতের নিকটে। সেই দ্বারটি খুলিয়া বাহির হইতে পারিলেই আবার সবই হইতে পারে; কিন্তু সে যে দেবস্থানে বসিয়া পিতার গুরুপুত্র দেবতুল্য ব্রাহ্মণের নিকটে ও তাহার গুরুর গুরু শ্বশুরের নিকটে আত্মসঙ্গোপন করিতে সত্য করিয়া আসিয়াছে! তাহার মনে হইতেছিল,—যেন সে কোন পার্ব্বত্য নদীর খরস্রোতে পড়িয়া সাগরসঙ্গমে ভাসিয়া চলিয়াছে,—উভয় পার্শ্বের শ্যাম তটরেখা প্রতি-পলে সুদূর পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে,—অদূর পুরোভাগে আবর্ত্তময় অগাধ লবণাম্বুর উত্তালতরঙ্গমালা ধূমাভ দিগন্তে মিশাইয়া যাইতেছে,—যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল জল,—ফেনিল শুভ্র জলরাশি ধু ধু করিতেছে,—উপরে নীল অনন্ত শূন্য, নিম্নে অতল জল, কোনদিকে কোথাও কোন অবলম্বন নাই, কেবল হাতের নিকটেই একমাত্র একটা তটতরুর একটি সলিলবিলম্বিনী শাখা,—তটের সহিত, ধরণীর সহিত, সেই শেষ সম্বন্ধ,—সেই একমাত্র অবলম্বন, সে যেন তাহাও ধরিতে পারিতেছে না,—তাহার বাহুদ্বয় মুক্ত হইলেও যেন কি মন্ত্রের কুহকে অবশ! সে অশ্রুসিক্ত উপাধানে মুখ লুকাইয়া যে ভাবে শয্যায় পড়িয়া ছিল, তাহা শয়ন নহে, উপবেশনও নহে; তাহার সে অবস্থা স্বপ্ন নহে, জাগ্রতও নহে, মৃত্যু বা মূর্চ্ছাও নহে, অথচ সংজ্ঞাও বলা যায় না।

বিষ মিশ্রিত জল যদি অমার্জ্জিত ও অপরিচ্ছন্ন পাত্রে থাকে, তাহা পান করিতে পিপাসিতেরও অপ্রবৃত্তি হয়; কিন্তু পরিষ্কৃত পাত্রে থাকিলে আর কাহারও তাহা হয় না। ধর্ম্মযাজী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চরিত্রে মিথ্যা কপটতা প্রভৃতি খুব অল্প বলিয়াই বিরাজের ধারণা ছিল; সে চূড়ামণির মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত হইয়া ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিল।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। স্ফুটচন্দ্রিকাধৌত নীলাম্বরে অসংখ্য তারকা যেন

নীহারগর্ভে প্রচ্ছন্ন কোন অনন্তমহিম অব্যক্ত পুরুষের অসংখ্য অনিমেষ উজ্জ্বল নয়নের মত মিথ্যাপ্রতারণাপূর্ণ ধরণীর উপরে চাহিয়া দুর্ব্বিনীত জগতের অনন্ত দুর্নয় পরিদর্শনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শশাঙ্কবিম্বের নিম্নে দুই একটা ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণ বিহঙ্গম অঙ্গনার বিলোলকটাক্ষসঞ্চালিত নয়ন কনীনিকার ন্যায় এ দিক ওদিক করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী সে মধুর যামিনী আজ বিরাজের চক্ষে যেন ঘনঘটাময়ী নিবিড়তমস্বিনী। ফিরিবার সময়ে সে আর একবার কমলাদের বাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; গৃহে প্রবেশ করিতে হইল না,—সুপ্ত পল্লীর নিশীথনিস্তব্ধতার মধ্যে অনঙ্গের অস্পষ্ট রোদন-গুঞ্জন উত্থিত হইয়া তাহাকে জানাইল যে, কমলা গৃহে ফিরিয়া আইসে নাই। উদ্যানপরিবেষ্টিত যে জীর্ণ গৃহখানি একদিন যেন নন্দনবেষ্টিত অমরার মত তাহার মনে হইত, আজ সেই গৃহ যেন অন্ধতমোময় নরকের পাতকিপিঞ্জর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। কেমন একটা সংশয়ের কালো মেঘ অন্তরের নিম্নস্তর হইতে উঠিয়া তাহার সমগ্র হৃদয়কে ছাইয়া ফেলিতেছিল। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় স্খলিতপদে টলিতে টলিতে সে প্রান্তর-পথে আসিয়া পড়িল। পথে চলিতে চলিতে এক একবার তাহার মনে হইতেছিল,—"এতদিন তবে কি সবই ভুল বুঝে এসেছি!"—কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে আপনাকে আপনি বলিতেছিল,—"ছিঃ! আমার মন বড় ক্ষুদ্র,—আমি ভারী নীচ।"

১০

প্রভাতে বিরাজমোহন একখানা সংবাদপত্র সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতেছিল, গত রাত্রির ব্যাপার কি স্বপ্ন,—না মায়া,—না চিত্তবিভ্রম? অনঙ্গের ও চূড়ামণির কথা মনে হইলে ভাবিল,—না, সমস্তই তাহার

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের কল্পনা নহে; কমলা যে বাড়ীতে নাই তাহা সত্য, কোথাও গিয়াছে,—কিন্তু কোথায়?—কাহার সঙ্গে?—কি অভিপ্রায়ে?—তাহাকে বলিয়া গেল না কেন?—এই প্রকারের চিন্তায় পূর্ব্বাহ্ন অতিবাহিত হইল।

মধ্যাহ্নে যেমন মনে হইল,—কমলা যদি নিকটেই কোথাও গিয়া থাকে তাহা হইলে হয় ত এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখনই বাহির হইয়া সে তাহাদের বাড়ী ছুটিল। এবারেও তাহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইল না; দূর হইতেই দেখিতে পাইল, বহির্দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, আর সেই মুক্তদ্বারের একটি পার্শ্বে নতমুখে বসিয়া অনঙ্গ মলিন বসনাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিতেছে! সেই স্থান হইতেই ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার সময়ে গৃহে ফিরিবার পথে বিরাজ দেখিতে পাইল, তাহার অদূরে যামিনী, নলিনী ও হীরালাল প্রভৃতি বয়স্যাবৃন্দ হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে দেখা করা তাহার ইচ্ছা নহে; সে পথ হইতে একটু দূরে একটা ঝোপের আড়ালে আসিয়া তাহাদের চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের সব কথা শুনিতে না পাইলেও যে দুই চারিটা কথা তাহার কর্ণগোচর হইল তাহা এই প্রকার:—

যামিনী। My prophetic soul!—কেমন, রাম না হ'তেই আমি রামায়ণ গেয়ে রাখি নি?—লোকটা কে কিছু শুনেছেন্?

হীরালাল। শুন্‌ছি না কি হরকুমার।

যামিনী। সে, Parisকে out—Paris ক'রেছে বাবা!

নলিনী। যাও!—এসব কথা নিয়েও পরিহাস?—ছিঃ!—আচ্ছা, বিরাজ এসব কথা শুনেছে?

হীরালাল। গ্রামময় হৈ হৈ আর সে শোনে নি ?—তবে বলাও যায় না, আপনার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথা মানুষ সবার শেষেই শুন্‌তে পায়।—আজ যদি না শুনে থাকে ত কাল শুন্‌বে।

তাহারা দূরে চলিয়া যাইবার পরও বহুক্ষণ বিরাজ সেই গুল্মরাজির পার্শ্বে স্থানুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

রাত্রিতে বিরাজ আহারে বসিল মাত্র ; ভাত ভাঙ্গিয়া মাখিল, একগ্রাসও মুখে তুলিল না ; দুধের বাটীটা মুখে ঠেকাইয়াই নামাইয়া রাখিয়া একটু জল খাইয়া উঠিয়া পড়িল। শয়নকক্ষে আসিয়া একটা পাণ মুখে দিয়া চিবাইয়া ফেলিয়া দিল, তারপর দ্বার রুদ্ধ করিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। কিছুক্ষণ পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া বই বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল,—বিধাতা কি স্বতন্ত্র উপাদানে পুরুষের আর স্ত্রীর হৃদয় সৃষ্টি করেন ? তারা ত ভালবাসাকে এমন নেওয়া-দেওয়া বা কেনা-বেচার ব্যাপার মনে করে না !—অনেক স্ত্রী ত স্বামীকে অন্যাসক্ত জেনেও তারই পায়ে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি ঢেলে দিতে পারে ! কিন্তু কোন পুরুষ কি কখন কোন দেশে স্ত্রীর অন্যানুরাগ মার্জ্জনা করা দূরে থাক, তাতে উপেক্ষাও ক'রতে পেরেছে ?—কৈ, সত্যের সংসারে ত তেমন শোনা যায় না ! কাব্যেই বা তেমন ক'টা ?—এক "এনক্" ছাড়া আর কে অন্যনিরতা স্ত্রীর সুখের কণ্টক হবার আশঙ্কায় আপনার অস্তিত্ব লুকিয়ে রেখে গুপ্তভাবে জীবনের অবসান ক'রেছে ?—পুরুষ নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারে না।—আমরা চাই তা'রা সারাজীবনটা কায়মনে কেবল আমাদের কেনা সম্পত্তির মত হ'য়ে থাক্‌বে। তাদের চোখ ভুলেও আর কারু দিকে চাইবে না, মন আর কারু কথা স্বপ্নেও

ভাব্‌বে না, মুখ কথায় ছলেও আর কারু নাম উচ্চারণ ক'রবে না।—এ রকম ভালবাসাতে আর বর্ব্বরজাতীয় প্রভুর ক্রীতদাসীর প্রতি ভালবাসাতে ভেদ কি?—না, আমি তার এ স্খলন,—যদি তাই হয়, মার্জ্জনা ক'রে তাকে ভালবাসতে না পারি, ঘৃণা করি কেন? সে যদি এতেই সুখী হয়ে থাকে হ'ক; আমার তাতে ঘৃণা, রাগ, দুঃখ বা অভিমান করবার কি আছে? তার মনের ওপরে ত আর আমার জোর নেই?

বিরাজ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কক্ষতলে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। দেয়ালের গায়ে সুন্দর "ফ্রেমে" বাঁধান কমলার একখানি আলোকচিত্র ঝুলান ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সে একবার থামিয়া সেই ছবিখানার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যে তোর জন্যে দেশ, ঘর-বাড়ী, মা-বাপ, আত্মীয়-বন্ধু, সব ছেড়ে মানুষের ধর্ম্ম ও সন্তানের কর্ত্তব্য ত্যাগ ক'রে দেশত্যাগী হ'তে প্রস্তুত হ'য়েছিলুম!"—এই কথা বলিয়াই উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছবিখানাকে পাড়িয়া মেজেতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দুই পায়ে তাহার উপরে দাঁড়াইয়া সেই-খানাকে দলিত ও চূর্ণ করিয়া ফেলিল। একটা দেরাজের ভিতরে সবুজ রঙের রেশমী ফিতায় বাঁধা এক গোছা পুরাতন চিঠি ছিল, সেইগুলিকে বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া জড় করিয়া তাহাতে দেশালাই জ্বালিয়া দিল। তাহার দুই চারিখানি বইএর পাতায় কমলা নিজের নাম লিখিয়াছিল, সে ছুরীর ডগে করিয়া সেই সব স্থানগুলিকে কাটিয়া তুলিয়া ফেলিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, কমলার স্মৃতিটাকে পর্য্যন্ত তেমনি করিয়া ঘৃণাফলকের দ্বারা নিজের মন হইতে কাটিয়া তুলিয়া ফেলে। ঘরের যে যে বস্তুতে কমলার কিছু সংস্রব ছিল, সেইগুলিকে সে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ এইভাবে ধ্বংসকার্য্য-পরিচালন করিয়া মেজেতে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল,

আর কিসে কিসে কমলার সম্বন্ধ আছে, আর কি কি ধ্বংস করিতে হইবে। ভাল করিয়া দেখিয়া যখন বুঝিল যে, সে-ঘর হইতে কমলার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই, তাহার প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক বস্তুর বিন্যাসে পর্য্যন্ত কমলার কিছু না-কিছু সংস্রব আছে,—সে-ঘর কমলাময়, তখন সে ঘৃণায় তাহা ছাড়িয়া বৈঠকখানায় আসিয়া শয়ন করিল।

জাগরণ ও চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত হইল। উষার আলোকরেখা দেখিতে পাইয়াই বিরাজ শয্যা ত্যাগ করিল। বিবরে অগ্নি প্রদত্ত হইলে সর্প যেমন বেগে বাহিরে পলাইয়া যায়, সেও সেই :ভাবে ঘর ছাড়িয়া প্রভাতের শীতল মুক্ত বায়ুতে অন্তস্তাপ জুড়াইবার ইচ্ছায় গঙ্গাতীরাভিমুখে ধাবিত হইল। আগুন যাহার ঘরে, সে বাহিরে গিয়া জুড়াইতে পারে; কিন্তু আগুন যাহার অন্তরে, সে কোথায় গিয়া নির্বৃতি লাভ করিবে? পুরাঙ্গনারা স্নান করিতে চলিয়াছে, কেহ কেহ স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। বিরাজকে দেখিয়াই ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহারা পরস্পরে নিম্নস্বরে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। বিরাজ মনে করিল, তাহারা কমলার পলায়নের কথাই কহিয়া গেল। কোন দুই জন বা তিন জনকে একত্র দাঁড়াইয়া কথা কহিতে দেখিলেই তাহার মনে হয়, তাহারা সেই কথারই জল্পনা করিতেছে। পথে যদি কেহ শুধু তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, অমনি তাহার মনে হয় যে, তাহার সে দৃষ্টিতে একটা পরিহাস ও ব্যঙ্গ জড়িত রহিয়াছে। অধিক দূর আর তাহার যাওয়া ঘটিল না, অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আবার ঘরের কোণেই আশ্রয় লইল।

পূর্ব্বাহ্নে একজন চাকর একখানা পত্র হাতে করিয়া বিরাজের দিকে আসিতেছিল, তাহার মনে হইল যে, চাকরটা বড় ধীরে ধী

আসিতেছে ; সে নিজেই দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়া সেখানা চাকরের হাত হইতে ছিনিয়া লইল এবং খামখানা ছিঁড়িয়া খুলিয়া পড়িয়া দেখিল, সুধাংশু লিখিয়াছে। অজানা বিদেশে গিয়া পাছে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধায় পড়িতে হয় এই আশঙ্কায় সে তাহাদের যাইবার সম্ভাবিত দিনটা জানিতে চাহিয়াছে। বিরাজ পত্রখানা আধপড়া করিয়াই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মধ্যাহ্নে পুত্রকে খাওয়াইতে বসাইয়া কাত্যায়নী বলিলেন,—"কার জন্যে দুঃখু পাস্ বিরাজ?—কেন আমাদের মনে দুঃখু দিস্ বল দেখি?—বিয়ে হ'য়েও আজো তোর বুদ্ধি হ'ল না ধন!" আজ আর তাঁহার কথাগুলি নিতান্তই বাতাসে উড়িয়া গেল না। বিরাজ তিন গ্রাসে খাওয়া শেষ করিয়া, উঠিয়া যাইবার সময়ে বলিয়া গেল,—"বে ক'রলেই যদি তোমরা সুখী হও মা, তাই ক'রব, দুদিন যেতে দাও!" কাত্যায়নীর জীবনে কখন যাহা ঘটে নাই আজ তাহাই ঘটিল, তিনি একবারে একমুখ হাসিয়া ফেলিলেন এবং নিজের কৃতকার্য্যতায় প্রীত হইয়া মোহিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওষুদ্ ধ'রেছে লো!—তোর বরাতে একছড়া গিনিসোণার হার ব'লেছি!" —মোহিনীর দাঁতগুলি সব বাহির হইয়া পড়িল।

নীলকমল কমলাকে অজ্ঞাতবাসে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলে তাঁহার প্রফুল্লভাবেই কাত্যায়নী বুঝিয়াছিলেন, 'কত্তা' সুবিধাজনক একটা কিছুতে হাত লাগাইয়াছেন। যখন সমস্ত কথা শুনিলেন, তখন তিনি বেশ খুসী হইতে পারিলেন না; ভাবিলেন,—"কত্তা এই বুদ্ধি নিয়ে যে এতটা বিষয় ক'রেছেন, সে কেবল আমারই কপালের জোরে।—এ কি হ'য়েছে?—বিরাজ কি ছুঁড়ীর এমন হঠাৎ মরণে বিশ্বাস ক'রবে, না সে ছুঁড়ীই বেশী দিন লুকিয়ে থাক্‌তে পারবে?—তাকে বিরাজের মন থেকে একবারে

জন্মের মত বার ক'রে দিতে না পার্‌লে কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না। তা করবারও কিন্তু এই মাহিন্দির—(মাহেন্দ্র) যোগ।"—এই রকম ভাবিয়া তিনি মোহিনীকে ডাকিয়া কি গুজ্‌গুজ্‌ ফিস্‌ফাস্‌ করিলেন। মোহিনী ঘড়া লইয়া গঙ্গাজল আনিতে গেল। সেই রাত্রির প্রভাতেই জাগিয়া নীলকমল শুনিলেন, কমলা গৃহ ছাড়িতে না ছাড়িতেই তাহার সম্বন্ধে একটা কুৎসিত অপবাদ দেশময় প্রচার হইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড

—o—

স্থির জলে আঘাত করিলে সমস্ত জলটাই একবারে চঞ্চল হইয়া উঠে না বটে, কিন্তু আহত স্থানে প্রথমেই যে একটা বৃত্তাকার ক্ষুদ্র তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে, তাহাই ক্রমে প্রসারিত হইয়া সংশ্লিষ্ট সমগ্র জলরাশিকেই পরে পরে চঞ্চল করিয়া তুলে। কাহারও সুখের শান্তভাব ভাঙ্গিয়া দিলেও যেন সেই রকমের একটা প্রসারণশীল চঞ্চলতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহাতেও অনেক সময়ে একটি আহত হৃদয়ের বেদনা ও আকুলতা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া তাহার সহিত মিত্র অথবা শত্রুভাবেও যাহারা সংশ্লিষ্ট তাহাদিগকে একে একে চঞ্চল করিয়া থাকে।

হীরালালের বৈরশোধ সম্পূর্ণ হইল। নীলকমলের সংসার শ্রীভ্রষ্ট, ভ্রাতুষ্পুত্র গৃহসংত্যক্ত, পুত্রবধূ প্রবাদকলঙ্কিতা,—অজ্ঞাতবাসে চির-নির্ব্বাসিতা, পুত্র, উদ্‌ভ্রান্ত,—কোন কার্য্যে মন স্থির করিতে পারে না, কোথাও দুই দিন স্থির থাকিতে পারে না,—আজ গৃহে, কাল কলিকাতায়, পরশ্ব ভিন্ন স্থানে। কর্ত্তা ও গৃহিণীতেও মনের মিল নাই। আর সংসারে আছে কি? অর্থ? যে অর্থ সুখ দান করিতে পারে না তাহার সার্থকতা কি? বৈরশোধের তৃপ্তিটা কিন্তু হীরালালকে অধিক দিন আনন্দ দিতে পারিল না। পরকে দুঃখ দিয়া সে যেটুকু তৃপ্তি পাইল, তাহা অচিরেই তাহার মনে শুধু একটা বেদনা রাখিয়া চলিয়া গেল।

হীরালাল প্রথম যেদিন কাত্যায়নী ও মোহিনীর ষড়যন্ত্রে [illegible]ান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রসুপ্ত বিবেক একবার জাগিয়া তাহাকে বলিয়াছিল,—"বিরাজ বা কমলা তোমার কোন অপকার করে নাই, তবে নীলকমলের দোষে তাহাদের দুঃখ দিবার জন্য তোমার এ অধ্যবসায় কেন?" মানুষের ঘটে সুমতি ও কুমতি দুই আছে। কুমতি বলিল,— "বাঃ! অন্যে কে দুঃখ পাইবে কি না পাইবে সে ভাবনা তোমার কেন?— তাহাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই কি নীলকমলের সুখ-দুঃখ জড়িত নয়?" হীরালাল কুমতির কথা শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষীণ বিবেককে বিরুদ্ধ যুক্তির বলে নিরস্ত করিল; তখন বুঝিল না যে দুষ্কর্ম্মের পদচিহ্ন ধরিয়া অনুতাপ ও সহস্রবিধ অমঙ্গল আসিয়া তাহার সব সুখ ও আনন্দকে নষ্ট করিয়া দিবে। এখন অনেক সময়ে তাহার মনে হয়,—পরের অনিষ্ট ত যথেষ্ট করিয়াছি, আপনি তাহাতে কি ইষ্ট লাভ করিলাম? নীলুকাকার ঘর হইতে সুখের বাস উঠাইয়া দিয়াছি; কিন্তু আপনার কিছু বাড়াইতে পারিয়াছি কৈ?— শুধু তাহাই নহে, তাহার মনটাও যেন ইদানীং কেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, প্রত্যক্ষ-বাদের অনেক কথার উপরে একটা কেমন সংশয় ও অবিশ্বাস আসিয়া পড়িতেছিল। পূর্ব্বে যে সকল কথাকে কুসংস্কার বলিয়া সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত, এখন সেই সব কথাই জোর করিয়া তাহার মনে উঠিয়া পড়ে। তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছায় সে সর্ব্বদা আনন্দের সঙ্গী খুঁজিয়া বেড়ায়; কিন্তু সকলেই তাহার মত নিষ্কর্ম্মা নহে। সঙ্গী, কর্ম্ম ও আনন্দের অভাবে তাহার জীবনটা যেন দিনে দিনে বড়ই দুর্ভর হইয়া উঠিতে লাগিল। একটা কার্য্যে কেবল সে এখন একটু আনন্দ অনুভব করে,—সুরাপান! কিন্তু অজস্র সে আনন্দ কিনিবার মত অর্থ কোথায়? স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু ছিল, হীরালাল একে একে

সব বিক্রয় করিয়া সেই আনন্দ কিনিতে লাগিল। পত্নীর অঙ্গের দুই একখানি অলঙ্কার পর্য্যন্ত তাহার পানাসক্তির ইন্ধন হইয়া পুড়িয়া উড়িয়া গেল। তরঙ্গিণী কাড়াকাড়ি করিয়া ছেলেদের একখানি ভোজনপাত্র ও একটি পানপাত্র রাখিয়াছিল; হীরালাল তাহাও একদিন বেচিয়া আসিল।

সংসার চালাইবার ভার তরঙ্গিণীর উপরে। সে সুরাসক্ত স্বামীর ভাব দেখিয়া নিজের যে দুই চারিখানি অলঙ্কার অবশিষ্ট ছিল, চুরি গিয়াছে বলিয়া তাহা একদিন লুকাইয়া ফেলিল। তাহাই তাহার সর্ব্বস্ব। এক একখানি করিয়া সেই গহনা লুকাইয়া বিক্রয় করে এবং আপনি অর্দ্ধাশনে থাকিয়া কোন প্রকারে সংসার চালাইয়া দেয়। ক্রমে তাহাতেও হীরালালের দৃষ্টি পড়িল। পয়সা চাহিলে তরঙ্গিণী যদি বলে,—"কোথা পাব, আমার হাতে কিছু এনে দিচ্ছ কি?"—হীরালাল রাগ করিয়া বলিয়া থাকে,—"কেন তোমাদের পিণ্ডির যোগাড়টি ত ঠিক হয়, একটি দিনও বাদ যায় না; আমার বেলাই থাকে না?"—অগত্যা সেই অলঙ্কার-বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তাহাকেও আনন্দ কিনিবার জন্য কিছু কিছু দিতে হয়। একদিন যদি হাতে পয়সা না থাকে, অথবা দিতে একটু বিলম্ব হয়, অমনি বাড়ীতে যেন চণ্ডের আবির্ভাব হয়;—হাঁড়ী কলসী সব গড়াগড়ি যায়, সরা মালসা সব ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে, আর তরঙ্গিণীর পৃষ্ঠে যেন কীলের শিলাবৃষ্টি হয়। নিরপরাধ বালক বালিকারাও অব্যাহতি পায় না; রাক্ষসীর গর্ভজাত ক্ষুদ্র রাক্ষস তাহারা, তাহারাই ত হীরালালের সর্ব্বস্ব খাইয়া ফেলিতেছে, নচেৎ আজ তাহার আনন্দ কিনিবার অর্থ নাই কেন? লাথী কীল খাইয়াও তরঙ্গিণী যে দিন স্বামীর পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, এ পাপ নেশা ছাড়! সবই ত

গেছে, তুমিও যে যেতে ব'সেছ"—হীরালাল তাহার পর দুই চারি দিন আর বাড়ীতেই আসে না।

মধ্যাহ্নে একদিন তরঙ্গিণী শাক অন্ন প্রস্তুত করিয়া মেয়ে ছেলেদের পাতে ঢালিয়া দিয়াছে, এমন সময়ে হীরালাল উপস্থিত হইল। তাহার পয়সা চাই। তরঙ্গিণীর হাতে সেদিন একটিও পয়সা ছিল না। হীরালাল তাহা শুনিল না, রাগ করিয়া জুতা পরা পায়ের লাথীতে ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দিল। হাঁড়ীতে ভাত নাই দেখিয়া বুভুক্ষিত পুত্রকন্যার পাতের ভাতগুলিকেই পা দিয়া ছড়াইয়া ও মাড়াইয়া এমন করিয়া দিল যে, কেহ কুড়াইয়াও খাইতে না পারে; তৎপরে গৃহিণীকেও মাটীতে ফেলিয়া দুই পায়ে দলিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলেই তরঙ্গিণী গায়ের ধূলার সঙ্গে হৃদয়ের রাগ অভিমান ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিল এবং ভিজা কাঠ চোখের জলে ভিজাইয়া ধূম ও বিষাদজনিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকন্যার জন্য আবার নূতন করিয়া রাঁধিতে বসিল।

২

হীরালাল সেই যে রাগ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার পর আর দুই দশ দিন বাড়ীতে আসিল না। তরঙ্গিণীর সঞ্চয় শেষ হইয়াছিল। সে ধার করিয়া, গোপনে ভিক্ষা করিয়া, নিজে অর্দ্ধাশনে ও অনশনে থাকিয়া, কোন রকমে কয়েকদিন সংসার চালাইল; কিন্তু ধারের উপরে প্রত্যহ কে ধার দেয়? মানের ভিক্ষায় কত দিন চলে? শেষে এমন একদিন আসিল, যেদিন আর কোন উপায়ই হইল না, কোথাও কিছু মিলিল না,—না ধার না ভিক্ষা! সে মুখটি শুকাইয়া পা ঘসিয়া ঘসিয়া কাত্যায়নীর

নিকটে আসিয়া সেই বেলার মত দুটি চাউল ধার চাহিল। তি'ন কপাল কুঞ্চিত করিয়া সুর টানিয়া টানিয়া বলিলেন,—"কালই যদি দিয়ে যেতে পার ত নিয়ে যাও,—ধার দিয়ে ফেলে রাখবার মত আমার নেই বাছা!"

তরঙ্গিণী বলিল, "দেব যে তা বল্‌তে পারি কাকী-মা! কিন্তু কালই যে পারব তা বল্‌তে পারি না।" কাত্যায়নী তাহাতে রাজী হইলেন না; সুতরাং তরঙ্গিণীকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, তরঙ্গিণী ততই যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। বেলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েদের পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তরঙ্গিণী উনন জ্বালিবার কোন উপায়ই করিতে পারিল না। বালকটি অবোধ, সে 'ভাত' 'ভাত' করিয়া মাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল এবং শেষে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তরঙ্গিণী রাগ করিয়া তাহার পিঠে দুইটা চাপড় মারিয়া বলিল, "হাভাতের ঘরে এসে জন্মেছিস্ ভাত কোথা পাবি?—ভাত ভাত ক'রে যেন পাগল ক'রে তুলেছে!—তোরা আগে মর, তাহ'লে আমিও ম'রে জুড়ুতে পাই।" চাপড় খাইয়া বালকের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইল না, ভর্ৎসনাতেও তাহার কান্না বন্ধ হইল না, পেটের জ্বালার সঙ্গে পিঠের জ্বালা মিলিয়া তাহার কান্নার সুরটাকে শুধু বাড়াইয়া তুলিল। তরঙ্গিণীও মাটীতে পড়িয়া চোখের জলে মেজের ধূলা ভিজাইতে আরম্ভ করিল।

মেয়েটির নাম পারুল। বয়স তাহার এই আট বৎসর। শুধু নামে নয়, রূপেও যেন সে ঐ নামের ফুলটির মত। খাওয়া হইবে না বুঝিয়া সে বইখানি লইয়া একপাশে বসিয়া ছিল। প্রত্যহ সে সরযূর সঙ্গে খেলা করিতে যায়, আজ কি ভাবিয়া গেল না। আহারের বেলা

অতীত হইবার পর আর সে কিন্তু থাকিতেও পারিল না, বইখানি তুলিয়া রাখিয়া খেলিতে ছুটিল।

সংসারখেলায় যাহাদের যে খেলা খেলিতে হইবে, তাহারা যেন শিশুকাল হইতেই তাহার অভ্যাস করিতে থাকে। বালকেরা খেলার মধ্যেও জয়, পরাজয়, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করিয়া অচির-ভাবী সংসারসংগ্রামের জন্যই যেন প্রস্তুত হইতে থাকে। বালিকারাও খেলার সংসার পাতিয়া, চীরখণ্ডসজ্জিত পুত্তলিকাকে পুত্রকন্যা সাজাইয়া, ধূলার অন্ন ধূলার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া তাহাদের মুখে তুলিয়া দিয়া তৃপ্তি লাভ করে; পুত্তলিকার বিবাহ দিয়া তাহাদের বরবধূ সাজাইয়া আপনারা গৃহিণীপণার অভিনয় ও অভ্যাস করিয়া থাকে। পারুল ও সরযূর খেলা-ঘরে নিত্যই ধূলার ভাত, কাদা গোলা ডাল, খোলামের মাছ, ঘাস পাতার তরকারী রান্না হয়,—তাহার মধ্যে দুইচারিটা কাদার বড়ীও দেখা যায়। আজ সরযূ তাহার মায়ের কাছে কতকগুলি পোকায় খাওয়া ভাঙ্গা চাল বা 'খুদ্' চাহিয়া পাইয়াছিল, তাহারই ভাত হইয়াছে। দুইজনে খেলার খাওয়া খাইতে বসিয়াছে। কি মনে হইয়া বলা যায় না, সহসা পারুলের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়া গেল। সরযূ তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি ভাই! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন পারুল?—তোমার মা কি আজ ব'কেছেন?" পারুল তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি মাছে আজ বড় ঝাল দিয়েছ ভাই।" পারুলের অন্তরে কি বিষাদের মেঘ উঠিয়া দুই বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিয়া গেল, সুখলালিতা সরযূ তাহা বুঝিতে পারিল না; খেলাঘরের কাদা-বাটনার ঝাল যে সহচরীর চক্ষে সত্যের জল বাহির করিতে পারিয়াছে ইহাতে খুসী হইয়া সে ভারী হাসিতে আরম্ভ করিল। পারুলও তাহার সঙ্গে হাসিল। খেলাটা কিন্তু

আজ তেমন বেশ জমিল না, শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়ী ফিরিবার সময় পারুল সরযূকে বলিল, "আমার ভাগের ভাতগুলি আমাকে দেবে ভাই ?" সরযূ নিজেরগুলিও পারুলের আঁচলে ঢালিয়া দিল। লোকে মহামূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইলে যেমন বক্ষের ভিতরে লুকাইয়া ফেলিতে চাহে, পারুলও সেইরূপ যত্নে গৃহস্থের পরিত্যক্ত সেই কীটভুক্ত মুষ্টিমেয় তণ্ডুলকণা বক্ষের নিকটে লুকাইয়া লইয়া বাড়ীর পথে ছুটিল।

ক্ষুধাক্লান্ত রোদনশ্রান্ত বালক মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। তরঙ্গিণী শূন্যনেত্রের উদাসদৃষ্টিতে দূর আকাশে চাহিয়া বসিয়া ছিল, আর মধ্যে মধ্যে মলিন বসনাঞ্চলে অশ্রুধারা মুছিয়া ফেলিতেছিল। সেই সময়ে পারুল ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"মা, আমি চারটি চাল পেয়েছি, খোকার মতও ভাত হবে না ?"—এই বলিয়া সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া আঁচল এলাইয়া দেখে, চাল নাই! ছেঁড়া কাপড়ের ছেঁদা দিয়া সেগুলি কখন পথে পড়িয়া গিয়াছিল, সে তাহা জানিতে পারে নাই। কাঁদ কাঁদ হইয়া যেভাবে সেগুলি পাইয়াছিল তাহা বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। তরঙ্গিণী প্রথমে একটু হাসিল, তারপর উঠিয়া আড়ালে গিয়া কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতে চারিদিক খুঁজিতে লাগিল, খুঁজিতে খুঁজিতে কোন দেবতার মানসিক করিয়া তুলিয়া রাখা কাগজে মোড়া একটা পয়সা দেখিতে পাইল ; দেবতার নিকট হইতে সেইটি ধার চাহিয়া লইয়া পারুলকে মুড়ি কিনিতে দিল এবং তাহারই অর্দ্ধেকগুলি জলে ভিজাইয়া ভাত বলিয়া ছেলেটিকে খাওয়াইয়া দিল।

দিন গেল, সন্ধ্যা আসিল; কিন্তু নূতন উপায় কিছুই আসিল না। ছেলেমেয়ে-দুটির পেটে ক্ষুধা থাকিলেও, মনে তাহাদের ভাবনা ছিল না ; তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। তরঙ্গিণী বসিয়া তৈলহীন দীপের ক্ষীণ

আলোকে মলিন ছিন্ন শয্যায় নিদ্রিত পুত্রকন্যার ক্ষুৎক্ষাম দুইখানি মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—"যাদের ভাত নেই তাদের আবার মান-সম্ভ্রমই বা কি আর লজ্জাসরমই বা কি ? রাতটে পোহালে আমি এদের হাত ধ'রে ভিন্ন গ্রামে গিয়ে ভিক্ষে ক'রব। এরা যে আমার চোখের সাম্‌নে খেতে না পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে ম'রবে, তা কি ক'রে দেখ্‌ব ? দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষ খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরে শুনেছি ; তাতে এত দুঃখ হয় কি ? দেশে সবার ঘরেই তাই। এ ত তা নয় !—সবার বাড়ীতেই মরাইভরা ধান, জালাভরা চাল, হাঁড়ীভরা ভাত, হাসিমাখা মুখ ! শুধু আমাদের এই একখানি বাড়ীতেই দুর্ভিক্ষ ! এ দুর্ভিক্ষ ত অজন্মার জন্যে আসে নি ; এ যে তিনি ইচ্ছে ক'রে আপনি ডেকে এনেছেন্ ! ভগবান্ ! কতদিনে তাঁর চোখ ফুটবে ?" আবার তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে অশ্রুপূর্ণনেত্রে উপরে চাহিয়া বাষ্পজড়িত কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"আর যাদের কোন গতি নেই, কেউ দেখ্‌বার নেই, তুমি যে তাদের দেখ ? অগতির গতি !—অনাথের নাথ !—দুঃখীর সহায় ! কোথায় তুমি ? তুমিও কি আমাদের দিকে ফিরে চাইবে না ?"—তাহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, শুধু অনিমেষ নয়নপ্রান্ত হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

তরঙ্গিণী প্রভাতে ভিক্ষায় বাহির হইবার সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া উপবাস-ক্লিষ্টদেহে শয়ন করিয়াছে মাত্র, এমন সময়ে দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কে ডাকিল,—"বড় বউঠাক্রুণ !" কণ্ঠস্বরে তরঙ্গিণী বুঝিল, বিরাজ ডাকিতেছে। মানুষ পরের কাছে গিয়া ভিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু আপনার জনের নিকটে অভাব জানাইতে লজ্জায় মরিয়া যায় কেন ? তরঙ্গিণীর ভাবনা হইল—বিরাজ কি তাহাদের উপোষের কথা শুনিয়া

আসিয়াছে? সে ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ দীপটাকে একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল।

তরঙ্গিণী নীরব। বিরাজও যেন কি কথা কহিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। একটু পরে তরঙ্গিণীই ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কখন এসেছ?"

তাহার মুখে এত অল্প কথা বিরাজ আর কখন শুনে নাই; হাতে একটা কি ছিল তাহা দ্বারের নিকটে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আমি তোমার বুদ্ধিবিবেচনা ভাল ব'লেই জান্তুম্ বউঠাক্‌রুণ! আজ থেকে বুঝ্‌লুম স্ত্রীলোকের সে সব হয় না।"

তরঙ্গিণী। কেন ঠাকুরপো?

বিরাজ। সন্ধ্যের একটু আগে বাড়ী এসে জল খেতে ব'সে শুন্‌তে পেলুম মোহিনী মায়ের কাছে বল্‌ছে, আজ পয়সার অভাবে তোমাদের রান্নাখাওয়া হয় নি।—সত্যি কি?

তরঙ্গিণী নিঃশব্দে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। তাহার মৌনভাবেই নিজ প্রশ্নের উত্তর পাইয়া বিরাজ বলিল, "আমিই না হয় নিজের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে বেড়াচ্ছি, তোমাদের খোঁজ্‌খবর নিতে পারি নি; তুমি ত আমাকে অভাবের কথা ব'ল্‌তে পারতে!"

"আমার দুঃখ বারমাস; রোজ রোজ কি আর ব'ল্‌ব ঠাকুরপো"—বলিয়া তরঙ্গিণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

বিরাজ। যাক্, হীরুদা কোথা?

"কি ক'রে জান্‌ব বল!"—এই কথা বলিয়া, যে প্রকারে হীরালাল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তরঙ্গিণী তাহা প্রকাশ করিল।

বিরাজ। আচ্ছা, আমি তাঁর সন্ধান ক'রছি। তুমি এখন এক কাজ কর!—এত রাত্রে রান্না আর কি ক'রে কি হ'বে, কিছু খাবার এনেছি ছেলেদের ডেকে দাও!—আর তুমিও উপোষ ক'রে থেক না, তুমি ম'লে এদের দশা কি হ'বে?

তরঙ্গিণী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ম'লে ত আমার হাড় জুড়োয়, ঠাকুরপো! ঐ দুটোর জন্যেই কেবল ম'রতে ইচ্ছে হয় না। অনেক পাপ ক'রলে যেমন বাঁচায় সুখ থাকে না, আবার মরণেও ভয় হয়, আমার ঠিক তেমনি হ'য়েছে!—তুমি যে আজ এমন হঠাৎ এলে?—সে হতভাগীর কোন সন্ধান পেয়েছ?"

বিরাজ রুক্ষস্বরে—"তার কথা আমাকে আর বল কেন"—বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, তরঙ্গিণী তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল,—"দ্যাখ তুমি মুখ্যু নও, অজ্ঞান নও,—

বিরাজ তরঙ্গিণীর কথায় বাধা দিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "আমি মূর্খ নয় ত মূর্খ কে বউঠাকরুণ!—অজ্ঞান না হ'লে কে কোথা কালসাপকে ফুলের মালা ব'লে গলায় পরে?"

তরঙ্গিণী। এইতে ত আমারও ব'লতে ইচ্ছে হয়, তুমি লেখাপড়া শিখেও মুখ্যু! কে কি রীতের মানুষ আজও চিনতে পারলে না?—তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি না থাকে তবে আমার কথা শোন! আমি নিশ্চয় ব'লছি সে কোন বিপদে প'ড়েছে, তোমাদের কোন শত্রু তার নামে এই অপবাদ তুলেছে।—তার খোঁজ কর!

বিরাজ উপেক্ষার হাসি হাসিয়া ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য সহকারে বলিল,—"আবার খোঁজ?—সে আর এ জীবনে নয়!"—তারপর একটু থামিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে এক দিন ছিল, বউঠাকরুণ, যখন

তার জন্যে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল খুঁজে বেড়াতে চাইতুম!—সে দিন জন্মের মত চ'লে গেছে।"—এই কথা বলিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তরঙ্গিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সেইস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, এমন সময়ে বিরাজ যে খাবারের চেঙ্গড়াটা রাখিয়া গিয়াছিল সেইটা তাহার পায়ে ঠেকিয়া খড়মড় করিয়া উঠিল। তরঙ্গিণী সেটাকে ঘরে আনিয়া দেখিল, বিরাজ তাহাদের এক বেলার বা এক দিনের খাবার দিয়া যায় নাই, সেই সঙ্গে কয়েকখানি নোটে মোড়া অনেকগুলি টাকাও দিয়া গিয়াছে।

তরঙ্গিণী কৃতজ্ঞতার অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে সেগুলি অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিল, ভাবিল খরচের মত কিছু রাখিয়া বাকী টাকা ফিরাইয়া দিবে; কিন্তু প্রভাতেই অনুসন্ধান করিয়া জানিল, বিরাজ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় কোন একটা থিয়েটারে প্রসিদ্ধ একখানি নাটকের অভিনয় হইবে। দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে পথে পথে হাতে হাতে ও ট্রাম-গাড়ীতে ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণে ছাপা বিজ্ঞাপন বিলি হইয়া আসিতেছে। টক্ ঘোলকে ক্ষীর ও বোদা আমড়াকে আঙ্গুর বলিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা যেমন ব্যবসার অঙ্গ, মোশাকে হাতী বলিয়া জানাইবার চেষ্টাও তেমনি বোধ হয় বিজ্ঞাপনের ধর্ম্ম। থিয়েটারের এ বিজ্ঞাপনেও তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; অধিকন্তু আছে, অভিনয়দর্শনার্থী কাহাকেও যাহাতে স্থানাভাবে নিরাশ হইয়া ফিরিতে না হয় এই অভিপ্রায়ে নিরপেক্ষ অধ্যক্ষের সবিশেষ অনুরোধ, আর আছে, সর্ব্বোপরি "শেষ রজনী"

এই সতর্কবাক্য। 'শেষ' এই বিশেষণটা যদিও অশেষবার প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে তথাপি এই শেষটাই পাছে শেষ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই থিয়েটারপ্রিয় যুবকগণ ও নিরঙ্কুশ ছাত্রবালকবৃন্দ আসিয়া প্রবেশদ্বারের সম্মুখে জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে দলবদ্ধ হইয়া ফুটপাথের উপরে বেড়াইতেছে। পাণ ও সিগারেটের দোকানের সম্মুখেও জনতা অল্প নহে।

এই সকল চঞ্চল বাঙ্ময় ও হাস্যময় যুবকদলের কিয়দ্দূরে একটি গ্যাস-পোষ্টের পাশে একজন যুবা দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় না যে, সে থিয়েটার দেখিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অথবা সে এই সকল চঞ্চল আবর্ত্তময় জনসঙ্ঘের উদাসীন পরিদর্শক। সে যেন এই ভিড়ের ভিতরে কাহাকেও খুঁজিতেছিল।

যথাসময়ে রঙ্গালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইল। স্রোতোদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত হইলেই রুদ্ধজলরাশি যেমন সবেগে ও সশব্দে তাহার মধ্য দিয়া ছুটিতে থাকে, দীর্ঘ অপেক্ষায় শ্রান্ত ও অধৈর্য্য এই সকল যুবকেরাও তেমনি কল কল শব্দে ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। নিমেষে জনতা ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু যুবা সেই একস্থানে একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিবিধ বাদ্যযন্ত্র একতানে বাজিয়া অভিনয়-রঙ্গের অবিলম্ব সূচিত করিয়া দিল। সেই সময়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ী সবেগে আসিয়া রঙ্গালয়ের সম্মুখে থামিল। তাহা হইতে যামিনী, নলিনী ও হীরালালকে নামিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া যুবা সেই দিকে ধাবিত হইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই এক কামিনীকেও নামিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথমাঙ্কের অভিনয়শেষে একবার কতকগুলি লোক বাহিরে আসিল। হীরালালও সেই সময়ে বাহিরে আসিয়া বরফ দেওয়া লেমনেড্ পান করিল, পকেট হইতে রেশমী রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল এবং একদোনা পাণ কিনিয়া একটা পাণ মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে পকেট হইতে একটা সিগারেট্ বাহির করিয়া ধরাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়ে পূর্ব্বকথিত সেই যুবা আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এই যে হীরুদা!"

তাহাকে দেখিয়াই হীরালালের মুখটা যেন কিছু অপ্রসন্ন হইল। সে কোন কথা না কহিয়া একমুখ ধোঁয়া টানিয়া একটু একটু করিয়া সেই-টুকু নিঃশেষে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "বিরাজ, তুমিও তা'হলে আজকাল থিয়েটার টিয়েটার দেখ্ছ!—বেশ বেশ!"

বিরাজ অবাক্ হইয়া হীরালালের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল; তাহার কথার উত্তরে বলিল, "না হীরুদা! আমি সেজন্যে আসি নি; ক'দিন ধ'রে আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি যে যামিনীর বাসায় আছ তা সন্ধান ক'রেছি; কিন্তু সেখানে যখনই গেছি তখনই তুমি নেই শুনে ফিরে এসেছি। সেথা তোমাকে ধ'রতে পারব না বুঝে পথে পথে তোমাকে ধরবার চেষ্টায় বেড়াচ্ছি। যেখানে যেখানে তোমার দেখা পাওয়া সম্ভব তা ত জানি!—সে যা হ'ক বাড়ী ছেড়ে ত অনেক দিন এসেছ, কাজকর্ম্মের কিছু সুবিধে করতে পেরেছ, না শুধুই এই রকম আমোদ ক'রে দিন কাটাচ্ছ?"

হীরালাল ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "পারি বা না পারি সে আমি বুঝ্‌ব, তোমার এসব অনধিকারচর্চ্চা কেন?—আমার এ আমোদটুকুও বুঝি তোমার সহ্য হ'চ্চে না?"

বিরাজ একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার আমোদ দেখে আমার ঈর্ষা

হয় নি হীরুদা! একটু আগে,—তোমরা তখন আস নি, আমার মনে হ’চ্ছিল বটে যে, সংসারটা নিতান্তই আমার হৃদয়ের মত নীরস মরুভূমি নয়, এখানে কারো কারো সুখও আছে;—অন্ততঃ যারা থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছে এদের অন্তর আমার মত এমন বিষাদের জাঁতায় দিনরাত পেষাই হয় না। এখন তোমাকে এখানে দেখে মনে হ’চ্ছে যে, এই সব লম্বশাট-কোটাবৃত আনন্দ-মধুব্রত যুবকদের মধ্যে খোঁজ্‌ ক’রলে তোমার মত দুদশজন মেলে। এমন আমোদের চেয়ে আমার এ বিষাদও ভাল।—যাক্‌,বাড়ী ছেড়ে এসে ত বেশ আমোদেই র’য়েছ, বাড়ীর কিছু খবর রেখেছ?”

হীরালাল খুব বিরক্তির সহিত বলিল, “না,—কেন?—কেউ ম’রেছে না আর কিছু?—”

বিরাজ অবাক্‌ হইয়া কিছুক্ষণ হীরালালের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “অধঃপাতে অনেকেই যায় হীরুদা, কিন্তু তোমার মত এমন একেবারে যেতে আর কারুকে দেখি নি! এখনও যে তারা কেউ মরে নি সে কেবল তাদের প্রাণ খুব কঠিন বলে;—তুমি তাদের বেঁচে থাক্‌বার মত কি ব্যবস্থা ক’রে এসেছ ভাই?”

“ভিক্ষে,—আর কি ব্যবস্থা ক’রে আসব?”—বলিয়া হীরালাল মুখ ভারী করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, বিরাজ তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া বলিল, “একটু দাঁড়াও, আমার সব কথা এখনও বলা হয় নি;—তারা ভিক্ষে ক’রবে আর তুমি এই রকম আমোদ নিয়ে থাক্‌বে?”

হীরালাল। কি ক’রব?—কোথা কার চুরি কর’ব না কেড়ে নিতে যাব?—কেন আজ তাদের ভাত নেই?—কে আমার বাড়ীতে দরিদ্রতা এনে দিয়েছে?

বিরাজ। তুমি স্বয়ং, আবার কে হিরুদা? তুমি অলস, বিলাসী, পরিশ্রমকাতর, কর্ম্মবিমুখ, তাই তোমার বাড়ীতে দরিদ্রতা এসেছে;—তুমি চেষ্টা ক'রলে কি পরিবারদের দুটি ভাতও দিতে পার না?

হীরালাল। কি চেষ্টা ক'রব? কেনই বা আজ আমাকে সে চেষ্টা ক'রতে হবে? আমার পৈতৃক সম্পত্তি কি কিছুই ছিল না?

বিরাজ। বেশ ছিল,—কোথা গেল, কেন গেল?

হীরালাল। তোমার বাপ্‌কে সেকথা জিজ্ঞাসা কর গে। এখন হাত ছাড়!

বিরাজ। জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে কেন হীরুদা?—আমি সবই জানি। তোমার ধারণা বাবাই তোমার সব কেড়ে নিয়েছেন। যেমন ক'রেই হ'ক তোমাদের কিছু সম্পত্তি তাঁর হাতে এসেছে বটে; কিন্তু তাই কি তোমার সর্ব্বস্ব?—বাকী সব কি হল ভাই? ধ'রে নিলুম, বাবাই তোমার সব সম্পত্তি আত্মসাৎ ক'রেছেন; কিন্তু তাই ব'লে তুমি কেন চোরের ওপরে রাগ ক'রে উপোষ ক'রে থাক? তুমি কি ইচ্ছে ক'রলে কিছুই উপার্জ্জন ক'রতে পার না?—এই যে এতদিন এখানে এসে র'য়েছ, সে চেষ্টা কিছু ক'রেছ কি?—শুধু পরের এঁটো পাত কুড়ন আমোদের প্রত্যাশায় তার অন্নদাস হ'য়ে র'য়েছ!—ছিঃ! ঘরে যার ভাত নেই, তার জন্যে এসব নয় হীরুদা! ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-পরিবার যার উপোষ ক'রে থাকে, তার এ সঙ্গ এ আমোদ সাজে না! যামিনীর কি? তাকে ত ভাতের ভাবনা ভাবতে হয় না! তার সঙ্গে মিশে তুমি কেন অধঃপাতে যাও,—পরিবারকে দুঃখ দাও?—

হীরালাল গম্ভীর ভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি কি আমাকে বন্ধুত্ব অবধি ছাড়তে বল না কি?"

বিরাজ। বন্ধুত্ব হ'লে ছাড়তে ব'লতুম না!—একজন যে আর একজনের সুখেদুঃখে সুখদুঃখ বোধ করে, বিপদে দুর্দ্দিনে সাহায্য করে, কাছে থেকে সাহস, সান্ত্বনা ও সৎপরামর্শ দেয়, দূরে থেকেও মনে ক'রে খবর নেয়,—এ দুঃখের সংসারে তেমন সুখের আর কি আছে? কিন্তু তোমাদের এ কি তাই?—আর সব যাই হ'ক, বন্ধুত্ব আর ভালবাসাটা এ সংসারে তত সুলভ নয় হীরুদা! আমাদের এ অভিশপ্ত গ্রহের জল-বাতাসে কি বিষ মিশান আছে বলা যায় না, এখানে ঐ দু'এর বীজ প্রায়ই অঙ্কুরিত, হয় না—হ'লেও অনেক সময়ে অঙ্কুরেই শুকিয়ে যায়, না শুকলেও তার ফলে যা পাওয়া যায় তা অমৃত নয়,—বিষ!

হীরালাল সিগারেট্‌টার ছাই ঝাড়িয়া টানিতে লাগিল। বিরাজ একটু থামিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, "বন্ধুত্ব যে এ সংসারে একেবারেই নেই, তাও বলি না; তবে সেটা সমানে সমানে ভিন্ন হয় না।—ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু পণ্ডিতে আর মূর্খে হয় না।—হিন্দু ও মুসলমানেও হ'তে পারে, কিন্তু সরলে আর কুটিলে হয় না।—সুন্দর ও কুৎসিতে বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু ধনী আর দরিদ্রে কখন তা হতেই পারে না। ছোট আর বড় এমন দুজনের গলা ধরাধরি ক'রে চলা হয় কি?—যে বড় সে ছোট হ'য়ে চ'ল্‌তে পারে না; ছোট যদি লাফিয়ে বড়র গলা ধ'রে চ'ল্‌তে যায়, তবে চলাটা অনেক সময়ে গড়াগড়িতেই দাঁড়ায়। যামিনীর ওপরে তোমার এ ভালবাসাটা ঠিক ছায়াতরুর প্রতি রৌদ্রকাতর পথিকের প্রীতির মত কি না ভেবে দেখ দেখি!—আর তোমার ওপরে তার যদি কিছু ভালবাসা থাকে, তবে সেটা কেবল নিরন্ন আশ্রিতের ওপরে বড়-লোকের বখা ছেলের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ অনুগ্রহ ক'দিন?

এযে মেঘের ছায়া,—বালিপথের জল, হীরুদা! যে ক'দিন তার মনের মত হয়ে চ'ল্‌তে পারবে,—সে যা বল্‌বে ভালমন্দ বিচার না ক'রে তখনই তাই ক'রতে পারবে, আপনার স্বাধীন মতের সমাধি ক'রে তার ছন্দোনুবর্ত্তন ক'রতে পারবে,—তত দিন, তারপর আর তা দেখ্‌তে পাবে না।"

হীরালাল। বাঃ খুব বক্তৃতা ক'রেছ!—যাও না, যে যেমন সুহৃদ্ তা আর আমার জান্‌তে বাকী নেই। এই মেঘের ছায়া আর বালির পথ পেয়েছি তাই আজও দাঁড়িয়ে আছি।—এখন সব বলা হ'য়েছে ত, এইবার হাতটা ছাড়লেই ভাল হয় না?

বিরাজ বিরক্তি সহকারে হীরালালের হাতটা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, মোসাহেবী ক'রে নিজের পেট চালান কি পুরুষের দাঁড়িয়ে থাকা হীরুদা? একথা বল্‌তে তোমার একটু লজ্জাও হ'ল না?—ধিক্!—শত ধিক! যাও! আর আমি তোমাকে ধ'রে রাখ্‌তে চাই না, রোজ রোজ আমি তোমার আমোদে বাধা দিতেও আস্‌ব না। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, ভালমন্দ সবই এই আমোদের সঙ্গে সমান ভেবে তুমি সব ছেড়ে এই রকম আমোদের পথ বেছে নিয়েছ। এপথ যে ভাল নয় সেকথা এখন তোমাকে কেউ বোঝাতে পারবে না। তুমি নিজেই একদিন তা বুঝ্‌তে পারবে। এখন এপথ তোমার চক্ষে ফুলে ঢাকা, কিন্তু কিছুদিন পরে বুঝ্‌তে পারবে, এ ফুলের তলায় কি বিষম কাঁটা! যে দিন পরের এই অনুগ্রহটুকু হারা'বে, এই অসার ঘৃণ্য আনন্দ, তৃপ্তি ও শান্তির পরিবর্ত্তে শ্রান্তি ও অবসাদ এনে দেবে, শ্রান্ত ও অনুতপ্ত প্রাণ বিরামস্থানের জন্যে আকুল হ'য়ে বাড়ীর পানে ছুট্‌বে, সেই দিন নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারবে,—সেই দিন বুঝ্‌বে, নিজের ঘর-বাড়ী কি, স্ত্রী-পরিবার কি, ধর্ম্মের পথে কত সুখ, সে পথে দুঃখ ও দরিদ্রতাতেও কত শান্তি!"

হীরালাল নিরুত্তর,—অধোবদন! বিরাজ পুনরায় বলিল, "যাও! আমোদআহ্লাদ দেদার কর, কিন্তু বাড়ীর আর নিজের অবস্থাটাও মাঝে মাঝে মনে ক'রো!—আর যদি ইচ্ছে হয়, তবে এই পুরণ বন্ধুর পুরণ কথাগুলিও এক একবার ভেবে দেখো! আজই ছুদিন না হয় তুমি নূতন বন্ধু পেয়েছ, আমরা পুরণ হয়ে গেছি; কিন্তু নূতন সবই ভাল নয়, হীরুদা!—চাল, চাকর, কাঠ, আর যা খেয়ে তুমি সর্ব্বস্ব উড়িয়েছ সেই জিনিষটার মত বন্ধুত্বও পুরণই ভাল।"

বিরাজ চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ হীরালাল সেই একস্থানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাতের সিগারেট নিভিয়া গেল, সেটাকে আর সে না ধরাইয়া, পাকাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল; পুনর্ব্বার রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু অভিনয় তাহাকে সেদিন আর মোটেই ভাল লাগিল না। "বড় মাথা ধ'রেছে, আমি একটু ফাঁকে যাই" বলিয়া হীরালাল বাহিরে চলিয়া আসিল। বাহিরে এধার ওধার করিয়া একটু বেড়াইয়া একখানা গাড়ী ডাকিয়া সে যামিনীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল এবং দেরাজ খুলিয়া একটা বোতল বাহির করিয়া চিত্তের বিষণ্ণতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে সুরাদেবীর সেবায় প্রবৃত্ত হইল।

বিরাজের সহিত হীরালালের দেখা হইবার পর দুই মাসও অতীত হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই যেন তাহার ও যামিনীর বন্ধুত্বভাবে ভাঁটা পড়িয়া আসিয়াছিল। বিরাজের কথাগুলি সবই পদ্মপত্রের জলের মত হীরালালের মন হইতে ঝরিয়া পড়ে নাই। হীরালাল অজস্র সুরাসিঞ্চন

করিয়াও তাহার সেদিনকার সেই ভাবটাকে মন হইতে ধুইয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহাকে যামিনীর কথামত অনেক কাজ করিতে হয়; পূর্ব্বেও হইত, কিন্তু পূর্ব্বে যেগুলি অনুরোধ মনে হইত, এখন সেগুলি 'হুকুম' মনে হয়। যামিনীর কোন বড়লোক বন্ধু আসিলে হীরালাল সেখানে আসন পায় না। অনেক সময়ে যামিনীর অনেক কথায় ও ব্যবহারে বিরাজের কথাগুলি হীরালালের মনে পড়ে; কিন্তু পাছে সেই কথাগুলিই সত্য হইয়া দাঁড়ায় এই আশঙ্কাতেই যেন সে সব সহ্য করিয়া থাকে।

পৌষমাসের বর্ষা। সমস্ত দিন টিপি টিপি বৃষ্টি হইয়াছে। পথে কাদা। আকাশে মেঘ। সন্ধ্যার বাতাস যেন বরফ মাখিয়া বহিতেছে। যামিনীর বৈঠকখানা আজ ভারী গুল্‌জার; পাঁচ সাত জন বন্ধু বসিয়াছে, গান বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ মদ চলিতেছে, আর মাঝে মাঝে হাসির এক একটা হর্‌রা উঠিয়া বাড়ী তোলপাড় করিতেছে। হীরালাল সে আসরে নাই। সে একখানা মোটা কম্বল গায়ে দিয়া নীচের একটা ঘরে পড়িয়া আছে। কয়েক দিন হইল সন্ধ্যার পর তাহার একটু একটু জ্বর হইতেছিল। সে তাহা গ্রাহ্য করে না; তাহারই উপরে স্নানাহার করে, রাত্রি জাগে, হিম লাগায়। জ্বরটা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে।

একজন চাকর আসিয়া বলিল, "আপনাকে বাবু ডাক্‌ছেন।"

হীরালাল বলিয়া পাঠাইল, "বল্‌গে তার ভারী জ্বর হয়েছে।"

পরক্ষণেই যামিনী হীরালালকে ডাকিতে ডাকিতে সেই ঘরে আসিয়া বলিল, "তুই ম'রেছিস না কি? ডাকের চোটে, কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙ্গে যায়, মড়া জেগে ওঠে, আর তোর ঘুম ভাঙ্গে না!—তোর হ'য়েছে কি?"

হীরালাল। ভারী জ্বর!

যামিনী। হ্যাঁ জ্বর! এখন ওঠ্ দেখি! রসদ মোটেই নেই, তোকে একবার যেতে হ’চ্ছে।

হীরালাল। আমার ওঠ্‌বার শক্তি নেই;—ক’দিনই জ্বর হ’চ্চে বটে, কিন্তু আজ কিছু বাড়াবাড়ি।

যামিনী। Keep aside all such nonsense!—দুবেলা দুটি কাঁড়ি ভাত মারবার বেলা ত, বাবা, জ্বর টর্ কিছু থাকে না?—শীগ্‌গির ওঠ্— দেরী করিস্ নি বল্‌ছি, ভদ্দরলোকেরা ‘সোডা’ খুলে ব’সে রয়েছে।

হীরালাল বিরক্ত হইয়া বলিল, “কি জ্বালা! জ্বরেও নিষ্কৃতি নেই?— তোমার এত চাকরবাকর সব গেল কোথা?”

যামিনী রুষ্ট হইয়া বলিল, “তুই কি ঠাকুরমশায় এসেছিস্ না কি?— তোর একার জন্যে আমার যা খরচ হয় দশটা চাকরে তা হয় না জানিস্? —কড়ার উপকারে নেই?”

হীরালাল। আজকের মত আমায় মাপ কর ভাই! আমি পারছি না!”

“পারবি না ত?—আচ্ছা” এই বলিয়া যামিনী রাগ করিয়া হীরালালের গায়ের কম্বলখানা কাড়িয়া লইয়া পা দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া বলিল,—“get out villain of a beggar, বাড়ী থেকে বেরো বল্‌ছি— never darken my doors again with your detestable shadow!—ingratitude incarnate!”

হীরালাল রাগে নিজের অবস্থার কথা ভুলিয়া যামিনীর কটূক্তির বেশ কড়া জবাব করিল। নিমেষে যামিনীর বদ্ধমুষ্টি সবেগে আসিয়া হীরালালের মুখের উপরে পড়িল। হীরালালও বন্ধুত্বের হিসাবে সেইরূপ একটা প্রতিদানের চেষ্টা করিল; তাহাতে যাহা যাহা ঘটিল, সব বলিয়া তাহার সম্ভ্রম নষ্ট করা উচিত হয় না। ফলে হীরালাল নিজের যে ছেঁড়া

কালো কাপড়খানি চাকরদের নেকড়া করিতে দিয়াছিল সেইখানি আবার তাহাকে পরিতে হইল। তাহার নিজের বলিতে আর কিছুই ছিল না; সেই এক বস্ত্রে তখনই তাহাকে সে গৃহ ত্যাগ করিতে হইল।

পথে বাহির হইয়া হীরালাল দেখিল, তাহার গায়ে জামা নাই, শীতবস্ত্র নাই, পায়ে জুতা নাই। কোঁচার কাপড়টি খুলিয়া তাহাতেই গা মাথা ও মুখ বেশ করিয়া ঢাকিয়া, পাছে কোন জানাশুনা লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় পার্শ্বে পশ্চাতে বা সম্মুখে কোন দিকে না চাহিয়া ঘাড় গুঁজিয়া চলিতে আরম্ভ করিল; কোথায় চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, কোন্ পথে চলিতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই, কোন্ দিকে কোথায় যাইবে তাহারও ভাবনা নাই, সম্মুখে যে পথ পাইল তাহাতেই চলিতে লাগিল।

হীরালাল চলিতে চলিতে মধ্যে একবার একটা বদ্ধগলিতে আসিয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে তাহার সম্মুখে একটা লোক পড়িয়া গেল। লোকটার গা মাথা মুখ সব একখানা মোটা শীতের কাপড়ে ঢাকা; চোখদুটি শুধু বাহিরে ছিল, তাহাও চশমায় ঢাকা! রাত্রিকালে শুধু চশমা-ঢাকা দুটি চোখ দেখিয়া মানুষটা কে তাহা সহজেই বুঝা যায় না; কিন্তু সেই চশমা-ঢাকা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিটা 'আঁদারের' আলোর মত যেমন একবার তাহার মুখের উপর পড়িল, হীরালাল অমনি শিহরিয়া উঠিল। সে আর পশ্চাতে না চাহিয়া কর্দ্দমাক্ত পথে না ছুটিয়া যত দ্রুত চলিতে পারিল চলিয়া দূরে আসিয়া পড়িল।

অনেকদূর আসিয়া হীরালাল সভয়ে একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, কেহ নাই; তখন সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ

করিল। চলিতে চলিতে একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া একবার থামিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। পরক্ষণেই নলিনী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে, হীরু? এমন ক'রে এখন কোথা যাচ্ছিস্?"

হীরালাল যামিনীর আচরণের কথা সব প্রকাশ করিল। সব শুনিয়া নলিনী বলিল, "তাই ত, তা এখন যা, কাল দেখা হলে তাকে জিগ্‌গেস৷ ক'রব এখন—এমনটা কেন ক'রেছে।"

হীরালাল। যাব আর কোথা?—আজ রাতটা তোমার এখানেই থাক্‌ব। আমার জ্বর, কিছু খাব না; শুধু যেথা হ'ক প'ড়ে থাকা।

নলিনী মাথাটা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তা থাকৃতে আর কি, তবে কি জানিস্ ভাই, আমাদের ওপরে ঘর বড় কম; নীচতেও মোটে দুটি,—একটিতে চাকরবাকরেরা থাকে, আর একটি বৈঠকখানা।"

হীরালাল। তা বৈঠকখানাতে ত আর তোমরা কেউ থাক না?—আমি তাইতেই থাক্‌ব এখন।

নলিনী। অন্যদিন হ'লে তাতে তুই শুয়ে থাকৃতে পারতিস্, আজ ত হয় না, সেটা সাজান গোছান র'য়েছে; কাল সকালেই 'মনু'কে দেখ্‌তে আস্‌বার কথা আছে।

"তা আমি চাকরদের ঘরেই একপাশে প'ড়ে থাক্‌ব এখন" বলিয়া হীরালাল বসিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া নলিনী বলিল, "দূর তা কি হয়! এতদিন কাটালি, আজ রাতটাও সেইখানেই কাটিয়ে দেগে।"

হীরালাল। না, পথে ব'সে রাত কাটাতে হয় সেও ভাল, সে বাড়ীতে আবার?—তোমার আপত্তিটা কি?

নলিনী। তুই আমার positionটা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিস্ না;

দুমুখের কথা না শুনেই যদি তোকে বাড়ীতে রাখি, সে কিছু মনে ক'রতে পারে না ?

হীরালাল আর একটুও দাঁড়াইল না, একবারে পথে আসিয়া মনে মনে বলিল, "একগ্রামের একপাড়ার লোক,—বাল্যবন্ধু ! দূর ! দূর ! বন্ধুত্বের মাথায় মার্ ঝাড়ু !—এর চেয়ে অচেনা লোক ঢের ভাল।—দেখি এত বড় সহর, এত লোকের বাস, তা'তে একটা ভদ্রসন্তানের একরাত্রির মত কোথাও একটু ঠাঁই হয় কি না ?" এইরূপ ভাবিয়া যাইতে যাইতে পথের ধারে সে যত বড় বড় বাড়ীর দরজা খোলা পাইল, সব বাড়ীতেই চেষ্টা করিয়া দেখিল ; কিন্তু সকলেই—"অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ" এই মহাবাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিল।

বিফলপ্রযত্ন হইয়া ক্ষুণ্নমনে চলিতে চলিতে হীরালাল দেখিতে পাইল, পথের উপরেই একটা ঘরে একদল যুবা কনসার্ট্ বাজাইতে বাজাইতে মধ্যে একবার থামিয়া পরস্পরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, হাসিতেছে আর সিগারেট্ টানিতেছে। সে ভাবিল,—"যেখানে এত আনন্দ সেখানে অবশ্যই একটু দয়াও থাকবে ;—বিশেষতঃ এরা দেখছি সকলেই যুবা, এদের হৃদয় ততটা কঠিন হবে না।"—এই ভাবিয়া সে সেই ঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়াই একজন বিকৃতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, বাবা !"

হীরালাল খুব বিনীত ও কাতরভাবে বলিল,"আজ্ঞে নিরাশ্রয় পথিক।"

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, তাহার পর এক একজন করিয়া তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল :—

"অমন খাপ্সুরত চেহারা, ফ্রেঞ্চ্কাট্ দাড়ি, কার্লিং টেড়ি নিয়ে, একছোটে তুমি 'নিরাশ্রয় পথিক' কে বাবা ?"

"ওসব ছেঁদো কথা রেখে দিয়ে মৎলবখানা কি খুলে বল না যাদু!"

"কোন্ আড্ডা ফেঁসে বেরিয়ে এসেছ, ধনমণি! গুলীটে আরটা খেয়ে থাক?"

"তুমি কি চাও?"

হীরালাল। রাত্রির মত শুধু একটু থাক্‌বার ঠাঁই—

"সদাব্রত খুঁজে নাওগে।"

হীরালাল। খুঁজে বেড়াবার শক্তি নেই, আমি অসুস্থ।

"অসুস্থের জন্যে ত হাঁসপাতাল খোলা রয়েছে, বাবা! এখানে কেন?"

"সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে?—ঠিকানা ব'লে দিচ্ছি যাও, তোফা জামাই-আদরে থাক্‌বে এখন।"

সুবিধা নহে বুঝিয়া হীরালাল ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। তাহার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইল, কেহ বলিতেছে, "শালা কোকেন্‌খোর",—কেহ বলিতেছে, "ব্যাটা যে চোর তা'তে সন্দেহটি নেই"—কেহ বলিতেছে, "আহা অমনি অমনি ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক্ হল না, দু'চার ঘা দিয়ে ছেড়ে দিলেই হ'ত।"

হীরালাল আর আশ্রয়ের চেষ্টা করিল না; পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, রিক্তহস্তে ভিখারীর বেশে অজানা সহরে আসাটা দুরদৃষ্ট নিয়ে সংসারে আসার অপেক্ষা অল্প অসুবিধার নহে। অধিক রাত্রিতে সহর-পথের এই সর্ব্বজনসুলভতাও থাকিবে কি না কে জানে? সে সহর ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া পড়িবার ইচ্ছায় দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। তাহার মন উড়িয়া যাইতে চাহিলেও পা কিন্তু যেন আর চলিতে চাহিতেছিল না। পা দুইখানি কাদায় ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। পথের পাথরগুলা সূচিমুখ লইয়া তাহার পদতলকে বিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল।

রাত্রির কন্‌কনে বাতাস তাহার পাতলা ছেঁড়া কাপড় ভেদ করিয়া গায়ে যেন বরফ ঢালিয়া দিতেছিল। দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সে ফিরিয়া আবার একটা বাড়ীর উদ্দেশে চলিল।

পথের ধারেই একটা দোতলা বাড়ীর উপরঘরের সাসি আঁটা জানালা দিয়া উজ্জ্বল আলো দেখা যাইতেছিল। তাহার ভিতরে হারমোনিয়মের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বামাকণ্ঠে কে গাহিতেছিল,—

"ভুলি যদি মনে করি, আঁধার নেহারি ধরা।"

নীচের দরজাটা একটু খুলিয়া রাখিয়া পাশে একটা আগুনের মালসা লইয়া একজন বেহারা বসিয়া থেলো হুঁকায় কড়া তামাক টানিতেছিল আর মাঝে মাঝে খুব কাসিতেছিল।

হীরালাল এই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। লোকে অশুচিবস্ত্রে সোপানৎকপদে দেবায়তনে প্রবেশ করিতে যেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, সে মলিনবস্ত্রে নগ্নপদে সেই গৃহে প্রবেশ করিতেও সেইরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল; কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দরজাটা ধীরে ধীরে একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল এবং রাত্রিটা সেইখানে থাকিবার অনুমতি আনিবার জন্য বেহারাকে উপরে পাঠাইয়া আপনি আগুনের মালসাটা অধিকার করিয়া বসিয়া পড়িল।

বাহিরের বাতাসে বহুক্ষণ ঘুরিয়া হীরালালের হাত পা সব যেন অবশ ও অচল হইয়া পড়িয়াছিল। ঘরের ভিতরে আগুনটার কাছে বসিয়া সে বেশ একটু আরাম বোধ করিতেছিল এমন সময়ে বেহারা নামিয়া আসিয়া বলিল, "না বাবু, আপনি বেরিয়ে যান!"

অতি কষ্টে মাটী ধরিয়া উঠিয়া হীরালাল আবার পথে বাহির হইল। কিছু দূরে আসিয়া "ফুটপাথে"র উপরে একটা বারান্দার আশ্রয় পাইয়া

সেইখানে বসিয়াই রাত্রি কাটাইবার ইচ্ছায় পায়ের কাদা মুছিতে মুছিতে দেখিতে পাইল, ছোট একটা দরজার নীচে কুলুঙ্গির মত কাটা একটা সরু পৈঠা রহিয়াছে। তাহার উপরে বসিয়াই সে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিল এবং জানুদুইটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছিল এমন সময়ে সেই দরজা খুলিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কে র‍্যা ?"

হীরালাল শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমি বিদেশী ভদ্র-সন্তান ;—থাক্‌বার স্থান নেই,রাতটা এইখানে কাটাব মনে ক'রে ব'সেছি।"

লোকটা রুক্ষস্বরে বলিল, "না, না, এখানে থাকা টাকা হবে না ;—ঐ ওদিকের 'ফুট্‌পাতে' যাও !"

হীরালাল নির্ব্বিঘ্নমনে উঠিয়া একটু দূরে একটা বড় গাছের তলায় আসিয়া গাছটা ঠেসিয়া বসিয়া বলিল, "আঃ—এখান থেকে আর মেরে ফেল্‌লেও উঠ্‌ছি না বাবা !"

বিরাজ কথিত দিন আজ সমাগত। হীরালাল আজ অজ্ঞাতজনপদে বন্ধুহীন ও নিরাশ্রয়। তাহার শ্রান্ত প্রাণ আজ বিরাম-স্থানের জন্য কাতর ও সুহৃদের জন্য ব্যাকুল হইয়া এক একবার গৃহাভিমুখে ছুটিতেছিল ; কিন্তু গৃহিণীর প্রতি সেই নির্দ্দয় আচরণের কথা মনে করিয়া আত্মগ্লানি ও অনুতাপের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। ব্যথিত মস্তক জানুর উপরে রাখিয়া সে ভাবিতেছিল,—"পৃথিবীতে আমার মত হতভাগ্য কে আছে ? পৃথিবীর মধ্যে যে স্থানটুকুতে আমার অধিকার, সেথা ফিরে যাবার পথেও নিজে কাঁটা দিয়ে এসেছি। সংসারের অসংখ্য মানুষের মধ্যে যে আমাকে ভালবাসে, আমার পায়ে কাঁটাটি ফুট্‌লে দাঁতে ক'রে তুলে দিতে চায়,—আমার

পায়ে কাঁকর বিঁধ্‌বে ব'লে নিজের বুক্ পেতে দিতে চায়, তার কাছেও আর ফিরে যাবার মুখ নেই!" অনির্ব্বচনীয় একটা নির্ব্বেদ ও বিষাদ আসিয়া তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া একটা কান্নার ভাব আনিয়া দিল। সে আজ কোনও দিকে কিছুমাত্র আশা, ভরসা ও সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার প্রত্যক্ষবাদও আজ তাহাকে একাকী ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল যেন, সংসারটা একটা বিশাল শূন্য; আর সেই অনন্ত অপরিছিন্ন মহাশূন্যের মধ্যে সে একাকী, মেঘচ্যুত ক্ষুদ্র একটি বৃষ্টিবিন্দুর মত মধ্যগগনে আসিয়া পড় পড় হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে, কখন কোথায় গিয়া পড়িবে তাহার ঠিকানা নাই।—সেই সময়ে সে শুনিতে পাইল, দূরে কে একজন একটা ভজন গাহিয়া যাইতেছে :—

"যে জন ব্যাকুল প্রাণে তোমারে ডাকে,
অনায়াসে সে ত ত'রে যাবে,
যে তোমারে ডাকে না, তার কি গতি হবে না,
চিরদিন পাপে প'ড়ে রবে ?"

হীরালাল বড় বড় মজলিসে সুরজ্ঞ গায়কের সুমিষ্ট কণ্ঠে তান লয় সহযোগে অনেক ভাল ভাল গান শুনিয়াছে; কিন্তু নিদ্রিত মহানগরীর নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে, বেসুরো হইলেও পথিকের ভরাট গলায় এই ভজন-গীতি আজ তাহার কর্ণে বড়ই মধুর লাগিল। সে নিজের চিন্তা ভুলিয়া শুনিতে লাগিল, পথিক গাহিয়া যাইতেছে :—

"শুনেছি তোমার বড়ই দয়া, পতিত মানব সন্তানে,
ঘোর পাতকী আমি, জান ত অন্তর্যামী,
চাহ একবার করুণা নয়নে!

আমি ডুবেছি ডুবেছি, সংসারপাথারে,
উঠিতে পারি না নিজ বলে ;
যতই উঠিতে যাই, ততই ডুবিয়া যাই,
তুমি আমায় তোল করে ধ'রে !”

হীরালাল তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল, আর শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল,—ভ্রান্ত হইলেও সংসার-পাথারে শক্তিমান্ কোন করুণাময় মহাপুরুষের দয়ার উপরে এই বিশ্বাস ও নির্ভর কিন্তু বড়ই মধুর !—সেই সময়ে পথিক খুব নিকটে আসিয়া গাহিল,—

“বড় শ্রান্ত হ'য়ে তোমারে ডাকি, অবসন্ন হ'তেছে যে প্রাণ,
সাঁতারি শকতি নাই, স্রোতেতে ভাসিয়া যাই,
ধরিবার নাই তৃণখান।
আমার আশা ভরসা, কিছুই নাই আর,
তুমি যদি রাখ তবে থাকি,
বল আর কোথা যাই, এ দুঃখ কারে জানাই,
তোমা বিনা আর কারে ডাকি ?”

হীরালালের হৃদয়যন্ত্রেও আজ ঠিক এই ভাবের একটা সুর বাজিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে তাহা গাহিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সে মাথা তুলিয়া উৎকর্ণ, উদ্গ্রীব ও মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল, পথিক অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়া গাহিতেছে :—

“তোমার পতিতপাবন নামের গুণে, কত পাপী হইল উদ্ধার,
এ পাতকী অধমে, তার হে নিজ গুণে,
জয় জয় হউক তোমার !”

দূরপ্রস্থিত পথিকের বিলীয়মান মধুর কণ্ঠস্বর নিশাচর কোন

বিলাসীর শকটনির্ঘোষে মিশিয়া হারাইয়া গেল; কিন্তু তাহার সেই কণ্ঠস্বর এবং সেই গীতবদ্ধ পদাবলী তখনও হীরালালের কর্ণকুহরে ও হৃদয়কন্দরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সে অনিমেষনেত্রে মেঘাবৃত গগনের তমসাচ্ছন্ন সুদূরগর্ভে চাহিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। সেই সময়ে কেহ তাহার খুব নিকটে থাকিলে শুনিতে পাইত, সে অস্ফুটাক্ষরে ধীরে ধীরে বলিতেছে,—"ভুবনত্রিতয়ের একমাত্র আশ্রয়, অন্তর্যামী ও নিয়ন্তা যদি কেহ থাক,—আর যদি তুমি যথার্থই করুণাময়, সর্ব্বশক্তিমান্, দীনের বন্ধু ও অনাথের শরণ হও, তবে দয়া ক'রে আমাকে বিশ্বাসের পথ দেখিয়ে দাও!—আমি ভ্রান্ত, নাস্তিক-দর্শনের কুতর্কে প্রতারিত, সংশয়তিমিরে পথহারা!—"

ক্ষণকালের জন্য হীরালাল সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল। সেইক্ষণে তাহার মনে রহিল না, সে কে, কোথায়, কেন সেখানে,—যেন ঘুমাইয়া পড়িল। ক্ষণকালের পর সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিল, তাহার জানুদ্বয় কখন তাহার অজ্ঞাতসারে ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, করদ্বয় বক্ষের নিকটে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, নয়নদ্বয় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে, আর সেই অশ্রুপ্রবাহে তাহার অন্তরের গ্লানি, দেহের অবসাদ ও শ্রান্তি, জ্বরের যন্ত্রণা, নিরাশ্রয় অবস্থার দুঃখ, ধনগর্ব্বিত কপটমিত্রের নির্দ্দয়তা-জন্য মর্ম্মবেদনা, সব ধৌত হইয়া কোথায় সরিয়া গিয়াছে এবং ঐ সকলের স্থান কি একটা অননুভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ও গভীর শান্তির মধুরভাবে ভরিয়া গিয়াছে! সে অশ্রু কি তাহার চরিত্রের পঙ্কিলভাব ধৌত করিয়া দিবে?

হীরালাল। আপনার নাম ?

আগন্তুক। আমার নাম 'নরেন'; অন্য পরিচয় বাড়ীতে গিয়েই শুন্‌বেন এখন, ততটুকু দেরীও যদি না সয় ত' গাড়ীতেই শুন্‌বেন আসুন।

হীরালাল অবাক্ হইয়া রহিল। এতক্ষণ ভিক্ষা করিয়াও সে কোথাও একটু স্থান পায় নাই, আর এই লোকটা কেন সাধিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহে ? তাহার যে আশ্রয়ের অভাব তাহাই বা সে কিরূপে বুঝিল ?

হীরালালকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নরেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল এবং ধরিয়া আনিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া আপনিও তাহার পাশে বসিল।

আগন্তুকের পরিচয় জানিবার জন্য হীরালালের তত আগ্রহ হইয়াছিল, গাড়ীতে বসিয়া কিন্তু সে আর একটিও কথা কহিতে পারিল না। কেমন একটা অবসাদ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শ্রান্তি ও শৈত্যজনিত অবসাদের আতিশয্য বুঝিয়া নরেন্দ্রও কোন কথা কহিল না; গাড়ী খুব জোরে চালাইতে বলিয়া আপনার গায়ের কাপড়খানিতে হীরালালের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

৬

হীরালাল যে রাত্রিতে নরেন্দ্রের সঙ্গে আসিয়া তাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করিল, সেই রাত্রি হইতেই সে জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া ঔষধের বন্দবস্ত করিলেন এবং রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়া তাহাতে বরফ দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

হীরালালের জ্ঞান নাই; মাঝে মাঝে যে একটু জ্ঞান হয়, তাহাতে

যাতনা ব্যতীত সে আর কিছুই বুঝিতে পারে না। বর্ত্তমান অবস্থাটা অতীতের অর্দ্ধবিস্মৃত স্বপ্নের মত খানিক খানিক তাহার মনে হয়, অতীতের কোন কথাই মনে হয় না। তাহার সে জ্ঞানটা ঠিক যেন ঊষার আলোক মিশ্রিত অন্ধকার অথবা প্রদোষের অন্ধকার মিশ্রিত আলোক,—তাহাতে জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু মানুষ চেনা যায় না ;—যেন প্রভাতের স্বপ্নজড়িত জাগরণ অথবা জাগরণজড়িত নিদ্রা,—তাহাতে কথা শোনা যায়, কিন্তু কথার মানে বোঝা যায় না, শোনা কথাও সব মনে থাকে না। সেই অবস্থায় সে নিজের শয্যাপার্শ্বে অনেক অচেনা মুখ দেখিতে পাইত। সেই সব মুখের মধ্যে একদিন যেন সে একখানা মুখে সেই যামিনীর গৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার রাত্রিতে গলির মোড়ে যে চশমাঢাকা দুইটা চোখ তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল ঠিক সেই রকমের দুইটা চোখ দেখিতে পাইল।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে হীরালাল দিনে দিনে সুস্থ হইতে লাগিল ; কিন্তু এখনও অসুখের অর্দ্ধচেতন অবস্থায় দেখা সেই মুখখানা গভীর নিদ্রার স্বপ্নের মত অস্পষ্টভাবে তাহার মনে হয়, আর সেই স্বপ্নটা দুঃস্বপ্ন হইলে মন যেমন একটা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হয়, তাহার মনটাও তেমনি হইয়া থাকে। সে মুখখানা ঠিক বিরাজের মুখের মত। হীরালাল ভাবিয়া থাকে,—এই নরেন্দ্র কি তবে বিরাজের পরিচিত ? বিরাজ কি তবে তাহার দুরবস্থাটা সব দেখিয়া গেল ? তাহাই যদি হয় তবে সে আর আরোগ্য চাহে না। রাত্রিতে কোন স্থানে কোন ভয়ের কারণ দেখিয়া প্রভাতেও যেমন লোক সেইখানটায় চাহিয়া চাহিয়া দেখে, তখনও তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় কি না, হীরালালও সেইরূপ এখনও যাহারা তাহাকে দেখিতে আসে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া

চাহিয়া দেখে, তাহাতে সেই মুখখানার ও সেই চোখদুটোর কোন সাদৃশ্য দেখা যায় কি না। অনেক দিন যখন আর তেমন কিছু দেখিতে পাইল না, তখন নিজেরই দেখিবার ভ্রান্তি ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল ; ভাবিল,—"সে আর যেই হ'ক, বিরাজ নয় ;—সে হ'লে আবার আস্‌তই আস্‌ত।"

সে ভয়টা দূর হইবার পর আবার একটা ভাবনা তাহার মনকে চঞ্চল করিতে লাগিল,—এ নরেন্দ্র কে ? কেন সে তাহার জন্য এতটা করিয়া থাকে ? হীরালাল প্রত্যহ মনে করে, নরেন্দ্রকে ধরিয়া তাহার পরিচয়টা জানিয়া লইবে। নরেন্দ্রও প্রায়ই আসিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিয়া যায় ; কিন্তু সে যেন একটা বাতাসের মত আসিয়াই চলিয়া যায়, হীরালাল তাহার ধরা পায় না।

হীরালালকে কখন কোন জিনিষ চাহিতে হয় না, কোন জিনিষের অভাবও বুঝিতে হয় না ; অভাব হইবার পূর্ব্বেই দেখিতে পায়, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। একজন চাকর নিয়ত তাহার কাছে থাকিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে ; তার উপরে নরেন্দ্র দিনে দশ বার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যায়,—"আপনার কোন কষ্ট হ'চ্চে না ত ? কিছুর অভাব হ'চ্ছে না ত ?" চাকরদের বিনয়, কর্ম্মতৎপরতা ও নৈপুণ্য দেখিয়া হীরালাল ভাবে,—"হ'বে না কেন, কর্ত্তা নিজে কেমন !" একজন দীন অজ্ঞাত পথিকের জন্য এইরূপ যত্ন ও অকাতর অর্থব্যয় দেখিয়া হীরালালের মনে হয়, সে এতদিন পৃথিবীর যে ধারে ছিল এ বুঝি সে ধারটা নহে !

একদিন পূর্ব্বাহ্নে পথের দিকের বারান্দায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে হীরালাল দেখিতে পাইল, সেইপথে এক ভিখারিণী একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আর একটি বালিকার হাত ধরিয়া ভিক্ষায় বাহির

হইয়াছে। শিশু ও বালিকার বয়স্ তাহারই পুত্রকন্যার তুল্য। এই ভিক্ষাযাত্রীদের দেখিয়া তাহার মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অপরাহ্নে নরেন্দ্র আসিয়া বলিল, "হীরালাল বাবু! শুন্‌লাম আপনি আজ সব ভাত ফেলে উঠে এসেছেন;—রান্না বোধ হয় মুখে দেওয়া যায় না?"

হীরালাল। আপনি কি আজ আহার করেন নি?

নরেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "আমাদের কথা ছেড়ে দিন; কল্‌কেতায় যারা বেশী দিন উড়েবামুণের রান্না খেয়েছে, তারা স্বাদগন্ধ আর বড় বুঝ্‌তে পারে না।"

হীরালাল। কেন, আপনার বামুণঠাকুর ত বেশ রাঁধে?—তা নয়: বাড়ীর জন্যে আমার মনটা বড় চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছে;—এইবার আমাকে বিদায় দিন!

নরেন্দ্র বিষণ্নমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "কেন আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে কি?

হীরালাল। কষ্ট!—রাজার হালে রেখেছেন;—কষ্ট যদি কিছু থাকে ত এই সুখের আতিশয্য। বাড়ীতে কি হচ্ছে তাই ভেবে আমার মনটায় সুখ নেই!—আমার ইতিহাস শুন্‌বেন?"—

নরেন্দ্র। কতক শুনেছি;—আপনি বাড়ী যেতে চান কবে?

হীরালাল। আজ হয় ত আর কাল চাই না। আমার কথা আপনি কি ক'রে এত শুন্‌লেন?

"পরে বল্‌ব, আপনি একটু বসুন আমি এখনই আস্‌ছি" বলিয়া নরেন্দ্র বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল এবং তখনই ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বেশ সবল হ'য়েছেন, শরীরের আর কোন গ্লানি বা জড়তা নেই ত?"

হীরালাল। তা নেই, শুধু মনের একটু গ্লানি আছে;—আজও আপনার পরিচয় কিছু জানা হয় নি।

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সেটা এখনই যেতে পারে;—এখন আসুন আগে আপনাকে বাড়ী পাঠাবার যোগাড় দেখি।"

হীরালাল নরেন্দ্রের পশ্চাতে পশ্চাতে আর একটা ঘরে আসিয়া দেখিল, একখানি ভাল কালাপেড়ে দেশী ধুতি কোঁচান রহিয়াছে, নূতন একটি কামিজে নূতন একসেট্ সোণার বোতাম, ভাল গরমকাপড়ের একটি কোট্, এবং জুতা, মোজা, শীতবস্ত্র প্রভৃতি সবই নূতন আর সবই মূল্যবান্। সেইগুলি দেখাইয়া দিয়া নরেন্দ্র বলিল, "পরুন্!"

হীরালাল। এসব আবার কেন?

নরেন্দ্র। তবে কি শুদ্ধু পায়ে খোলা গায়ে দেশে যাবেন? প'রে নিন্ বেলা যায়!

হীরালালের বেশ সমাধা হইলে নরেন্দ্র একখানি রেশমের রুমালে বাঁধা কয়েকখানি নোট্ ও টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "এইটে পকেটে ফেলে রেখে দিন!"

হীরালাল সেটা হাতে লইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া নরেন্দ্রের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "না, আপনি আমার কৃতজ্ঞতার বোঝা যথেষ্ট ভারী ক'রে দিয়েছেন, আর কিছু না!"

নরেন্দ্র সেটা জোর করিয়া হীরালালের পকেটে গুঁজিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এত ব'য়েছেন আর এটা পারবেন না?—মনে করুন এটা বোঝার উপর শাকের আঁটি।"

হীরালাল অবাক হইয়া নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বিস্ময়বিজড়িতস্বরে বলিল, "আপনি কে ব'ল্‌বেন্ না?"

নরেন্দ্র তাহার সহজ সরল হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি নরেন।"

হীরালাল। সত্যই আপনি নরেন্দ্র!—আমি চিরদিন মানুষকে স্বার্থপর ব'লে ঘৃণাই ক'রে এসেছি;—আপনি আমার সে ভ্রমটা ভেঙ্গে দিলেন।

নরেন্দ্র পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল, "আপনি ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা ক'রেছিলেন কি?"

হীরালাল। কেন বলুন দেখি?

নরেন্দ্র। হাঁড়ীর একটা ভাত টিপে দেখে বাকী সব ভাতগুলিকেই সেই রকমের বুঝে নেবার মত কি একটা ন্যায় আছে না?—আপনি বোধ হয় মানুষের বেলাও সেই ন্যায়টা খাটিয়ে তাদের প্রতি এই অন্যায় ধারণাটা ক'রেছেন।—কোন দুজন মানুষ এক রকমের নেই, হীরালাল বাবু! এক মানুষই দুই সময়ে ঠিক এক রকমের হয় না। সে যা হ'ক, আপনার আর একটা ভুল আমি ভেঙ্গে দি,—আপনার কৃতজ্ঞতা একটুও আমার ওপরে খরচ ক'রবেন্ না, সব আর একজনের জন্যে রেখে দিন্!—সব তাঁরই পাওনা।

হীরালাল। সে কি!—তিনি আবার কে?

নরেন্দ্র। এই বাড়ীর যিনি কর্ত্তা;—আমি তাঁর চাকর মাত্র। আমি বা আমরা যা কিছু ক'রেছি বা ক'রছি সব তাঁরই আদেশে।

হীরালাল অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাঁকে ত কই একদিনও দেখ্‌তে পাই নি!"

নরেন্দ্র। কর্ত্তাকে সব সময়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, কাজ দেখে অনুমান ক'রে নিতে হয়। আপনি যে প্রেষ্যকেই প্রভু মনে ক'রেছেন, সেটাও আপনার একটা ভুল। কর্ত্তার সঙ্গে পরিচয় হ'লেই নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারবেন।

হীরালাল। আপনি প্রথম হ'তেই আমার চক্ষে একটি মূর্ত্তিমান্ রহস্য! এখন বলুন দেখি আর কতদিন আমাকে এই রকম ধাঁধায় ঘোরাবেন?—আপনিই কি সেই রাত্রিতে আমাকে পথ থেকে ডেকে আনেন নি?

নরেন্দ্র। আমিই বটে, কিন্তু তাঁরই আদেশে; তিনি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় খানিকটা ঘুরে আসেন; মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি বা বজ্রাঘাত কিছুই তাঁর সে নিয়মে বাধা দিতে পারে না। সেই রাত্রিতে অনেক দেরী হচ্ছে দেখে আমি খুঁজ্‌তে বেরুব মনে ক'রছি এমন সময়ে একখানা গাড়ী ক'রে এসে হাজির। গাড়ী থেকে নেমেই আমাকে ডেকে,—আপনি প্রথম যে বাড়ীর নীচে ব'সেছিলেন তার ঠিকানা ব'লে দিয়ে, ব'ল্‌লেন,—"তুমি এখনই এই গাড়ী নিয়ে যাও, যেমন ক'রে পার তাঁকে তুলে নিয়ে এস! তাঁর আশ্রয়ের দরকার, পরিচয় কিছু জান্‌তে চেওনা! আমাদের পরিচয়ও কিছু প্রকাশ ক'রো না! তা শুনে হয় ত তিনি না আস্‌তেও পারেন"।—তারপর আপনি সবই জানেন।

হীরালাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যেন কিছু ভাবিতে ভাবিতে বলিল, "আপনার প্রভুমহাশয়ের নামটি কি?"

নরেন্দ্র হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, "মাপ্‌ ক'রবেন্‌, সেটা বল্‌বার নিষেধ আছে।"

হীরালাল তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "তবে কি আমাকে একজনের কাছে এতটা কৃতজ্ঞ হ'য়ে তার নাম অবধি না জেনেই চ'লে যেতে হবে?"

নরেন্দ্র। না, তা কেন;—তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দিলেই ত হবে? যদিও প্রচ্ছন্ন থাকাই তাঁর অভিপ্রায়, তবু আমি অনুরোধ করলে তিনি 'না' বল্‌তে পারবেন না।

হীরালাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণমুখে বলিল, "যদিই বলেন!"

নরেন্দ্র। না মহাশয়! আমাদের যিনি প্রভু, তিনি বড় সদাশয়;—চাকর ব'লে যে কোন স্বতন্ত্র জীব নেই, তারাও যে মানুষ এবং মানুষের মত যে তাদেরও সুখদুঃখ মানঅপমান বোধ আছে, সেটাতে তিনি অবিশ্বাস করেন না। আমাদের সঙ্গে বয়স্যের অনুরূপ ব্যবহার করেন।

এই সময়ে বাড়ীর সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্র হীরালালকে গাড়ীতে বসাইয়া "তাঁকে ডেকে আনি"—বলিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। হীরালাল গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতেছিল, "এ সব কি ভৌতিক কাণ্ড না কি? আমার এমন বন্ধু কে আছে?—কিছু না, এ সব নরেনবাবুরই খেলা। আপনাকে ঢেকে রাখবার জন্যেই মিছে ক'রে একটা কর্ত্তা খাড়া করবার চেষ্টা ক'রছেন!"—সেই সময়ে সে দেখিতে পাইল, অদূরে হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্র আসিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে একটা আধময়লা ঝল্‌ঝলে জামা গায়ে, একজোড়া যেমন তেমন চটিজুতা পায়ে, অবনতমস্তকে মৃদুপদক্ষেপে আসিতেছে ও কে?—ও মুখ যে হীরালালের চিরপরিচিত! রোগশয্যার পার্শ্বে ঠিক এই মুখই যে সে দেখিতে পাইয়াছিল! এই চশমা পরা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিই ত সেই রাত্রে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল! হীরালালের মস্তক নত হইয়া পড়িল, মুখখানা অস্বাভাবিক ম্লান হইয়া গেল।

নরেন্দ্র দূর হইতেই নমস্কার জানাইয়া ফিরিয়া গেল। বিরাজমোহন ধীরে ধীরে আসিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া তাহার উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডেকেছ হীরুদা?"

হীরালাল উত্তর করিবে কি তাহার অন্তরে তখন একটা ভারী ঝড় বহিতেছিল। বিরাজের নিকটেই যে সে এতটা কৃতজ্ঞ এ সত্যটাকে নয় করিবার মত সে আর একটা সংশয়ও খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাহার মনটা যেন নীড়চ্যুত অজাতপক্ষ বিহঙ্গশাবকের মত কোন অবলম্বন না পাইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। জগৎপদ্ধতির সকল ব্যাপারেই সে চিরদিন কিছু না কিছু একটা দোষ দেখিতে পাইত; আজ আর একটা নূতন দোষ দেখিতে পাইল,—মানুষের ইচ্ছামৃত্যু হইল না কেন?

হীরালাল কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া বিরাজ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কেন ডেকেছ বল্‌লে না?"

হীরালাল অন্যদিকে চাহিয়া একটু ভারী ভারী গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা জড়ান জড়ান কথায় বলিল, "আমি যে এতদিন পরের বাড়ীতে ছিলুম না সে কথা আমাকে বুঝ্‌তে দাও নি কেন বিরাজ?"

বিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি ভেবেছিলাম পরের বাড়ীতে আছ জান্‌লেই তুমি ভাল থাক্‌বে। তা যদি না হবে, নিজেদের বাড়ী থাক্‌তে তুমি পরের দোরে দোরে একটু থাক্‌বার স্থান খুঁজে বেড়াবে কেন হীরুদা?—আমি না হয় দৈবাৎ তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে চিনে ফেলেছিনু, তা না হ'লে ত তুমি আস্‌তে না! অযশস্কর বারবাসে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষে ক'রতে পেরেছিলে, পথে ব'সে রাত কাটাতে মনস্থ ক'রেছিলে, তবু ত এদিকে আস নি? বাড়ীর পথ না জান্‌তে পার, কিন্তু ঠিকানা জান্‌তে না এমন কথা বল্‌তে পার না। সে যা হবার তা হয়েছে, এখন বাড়ী যাও! দিনকতক বিশ্রাম ক'রে আবার নূতনভাবে জীবন আরম্ভ কর!"

বিরাজের কথার উত্তরে হীরালাল কোন কথা কহিল না; সে ভাবিতেছিল, পৌষের দুঃসহ শীতে, বরফঢালা বাতাসে, চট্‌চটে কাদাভরা পথে তাহার পশ্চাতে বিরাজের সেই অনুসরণ, তারপর তাহার প্রতি এই সব অর্থব্যয় ও যত্ন; আর ভাবিতেছিল, এই বিরাজের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র প্রতিহিংসার বশে নীচ পরিচারিকার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া সে নিজে যাহা যাহা করিয়াছে। সে ছলছলনেত্রে পাংশুপূর্ণ পথের উপরে চাহিয়া নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল।

বিরাজের অনুমতি পাইয়া গাড়োয়ান গাড়ী চালাইয়া দিল। বিরাজ হীরালালের গাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হীরালাল যেন কোন পুণ্যময় মহাপুরুষের মুক্ত আত্মা, হিরণ্ময় রথে আরোহণ করিয়া সুখশান্তিপূর্ণ স্বর্গধামে চলিয়া যাইতেছে, আর সে অধম পাতকী, কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে এই পাপতাপপূর্ণ ধরাধামে পড়িয়া রহিল!

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিরাজ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—"অর্থ, মান, যশ, হীরুদার কিছুই নেই; কিন্তু তার কিছু না থাকার মধ্যেও যা আছে, আমার সমস্তের মধ্যেও তা কোথায়? আমার যা কিছু আছে সব দিয়েও কি তার সেইটুকুকে আমি কিন্‌তে পারি?—না;—স্ত্রীর অকপট অনুরাগ যদি কারও ভাগ্যে ঘটে তবে দরিদ্রের ভাগ্যেই ঘটে; তার প্রতি তার স্ত্রীর যে ভালবাসা সেইটুকুই খাঁটী, সৌভাগ্যের সঙ্গে সেটুকু ফুরিয়ে যাবার ভয় নেই।"—একটু পরে আবার একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "বাড়ী যাবার জন্যে আজ হীরুদার কতই আগ্রহ! সেই জীর্ণ বাড়ীখানিতে ফিরে যাবার জন্যে আজ সে বোধ হয় পৃথিবীর আধিপত্যও

ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত!—একদিন আমারও এমনই ছিল, কোথায় গেল? কেন গেল?—এখনও ত সেই সবই আছে; সেই তরুচ্ছায়াময় পল্লী তেমনই শান্তিপূর্ণ! সেই বাড়ী, সেই ঘর, তেমনই আদরঅভ্যর্থনায় পূর্ণ, সেই মাতা পিতা তেমনই স্নেহময়! তবে কেন আর বাড়ীর সে আকর্ষণ নেই?—একজনই শুধু নেই; সে কিছু চিরদিনই ছিল না। দুদিনের জন্যে এসে কেন সে আমার চিরজীবনের সুখ ভেঙ্গে দিয়ে গেল? আর কি সে দিন ফিরে আসে না?"—ঝড়ের মত একটা নিঃশ্বাস তাহার বক্ষঃস্থলকে আলোড়িত করিয়া সশব্দে প্রবাহিত হইল।

বিরাজ কতক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিত বলা যায় না, নরেন্দ্র একখানা পত্র আনিয়া দিয়া তাহার চিন্তা ভাঙ্গাইয়া চলিয়া গেল। বিরাজ সেইখানে দাঁড়াইয়াই পত্রখানা খুলিয়া পড়িল; পড়িয়া সেখানাকে ছিঁড়িয়া পাকাইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপরও কিছুক্ষণ অবনতমস্তকে অস্থিরপদে সেই স্থানে পাদচারণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল এবং নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, "নরেন! আমার বাইরে যাবার তোরঙ্গটা ঠিক্ ক'রে রাখ! আমার দুই একখানা পত্র লিখ্‌তে আছে।"

* * * *

বিরাজ কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার পর একদিন বেলা নয়টা দশটার সময়ে একখানা ঠিকাগাড়ী আসিয়া তাহাদের বাসাবাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। নরেন্দ্র শব্দ পাইয়াই ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে, কতকগুলি মোট গাঁট নামান রহিয়াছে, গাড়োয়ান একটা প্রকাণ্ড তোরঙ্গ মাথায় করিয়া বাড়ীর দিকে আসিতেছে, আর গাড়ীর নিকটে একটা 'গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ ব্যাগ' হাতে করিয়া সুধাংশু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

নরেন্দ্র কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা এখানে আছেন, নরেন?"

নরেন্দ্র। না; আপনি ভাল আছেন ত?

সুধাংশু। বাড়ীর খবর ভাল?

নরেন্দ্র। হ্যাঁ, আপনি চলুন, আমি এ সব নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রছি।

সুধাংশু। তুমি তাই কর, আমি বাড়ী যাই।

নরেন্দ্র। অনেকটা বেলা হয়েছে, এইখানেই স্নান আহার ক'রে গেলে হয় না?

সুধাংশু সেকথার উত্তর না করিয়াই গাড়ীতে চাপিয়া গাড়োয়ানকে বলিল,—"শিয়ালদা ষ্টেশন্"—তারপর নরেন্দ্রকে বলিল,—"না, নরেন, বাড়ীতেই যাই।"

নরেন্দ্র বিশেষ বিস্মিত হইল না; সুধাংশুর ব্যাপার যে এই রকমই তাহা সে জানিত। যেন হঠাৎ কোথা হইতে একটা ঝড় বহিয়া আসিয়া চলিয়া গেল।

৬

নীলকমল আহারান্তে নিদ্রা গিয়াছেন। কাত্যায়নী ঘরের ভিতরে কি করিতেছিলেন, কাহার জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; যে আসিয়াছিল সে টক্ টক্ করিয়া একবারে উপরে চলিয়া গিয়াছিল। মোহিনী কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিয়া কুঁচের মত চক্ষুদুটিকে যতটুকু বড় করা যায় তাহা করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "ছোট বাবু!"

"সুধা" বলিয়া কাত্যায়নী সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

সুধাংশু এঘর ওঘর দেখিয়া তখনই দুড়্ দুড়্ করিয়া নামিয়া আসিল এবং কাত্যায়নীকে দেখিতে পাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথা, কাকীমা ?"

কাত্যায়নী। সেদেশ থেকে কবে এলি ? 'দাদা' বাড়ীতে না থাক্‌লে কি আর ঘরে ঢুক্‌তেও নেই ?

সুধাংশু। কল্‌কেতার বাসাতেও ত দাদা নেই !—কোথায় তিনি ?

কাত্যায়নী। পশ্চিম গেছে।

সুধাংশু। হঠাৎ পশ্চিম গেলেন যে ?—আর কে গেছে ?

কাত্যায়নী। তা জানি না।

সুধাংশু। বউদিদি কোথা ?

"যম জানে"—বলিয়া কাত্যায়নী মুখখানাকে ঘুরাইয়া চলিয়া গেলেন। তাহাদের কথাবার্ত্তায় নীলকমলের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল ; তিনি বাহির হইয়া বলিলেন, "এই যে সুধাংশু এসেছ !—ভাল আছ ত ?"

সুধাংশু একটা প্রণাম করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার এমন হঠাৎ পশ্চিম যাবার কারণ কি, কাকাবাবু ?"

নীলকমল। তা ত ব'লতে পারি না।

সুধাংশু। আপনিও ব'লতে পারেন না ?

নীলকমল। কি ক'রে পারব বল না ;—আমি পত্র লিখ্‌লাম,—"মাঘ মাসে বিবাহের দিন আছে, গৌরীনাথ বাবু ব্যস্ত হ'চ্ছেন, তুমি বাড়ী আস্‌বে !" তার উত্তরে এক পত্র এল,—"আমি এখন দিনকতকের জন্যে পশ্চিম যাচ্ছি, কবে ফিরব তার ঠিক নেই।"

সুধাংশু। আমি আপনার কথা কিছু বুঝ্‌তে পারছি না ; বিবাহের দিন আবার কার ?—গৌরীনাথ বাবু কে ?

নীলকমল। ও হো, তুমি তা হ'লে কিছুই শোন নি! সে অনেক কথা; হাতে মুখে জল দাও, সুস্থির হও, শুন্‌বে তখন!

এই কথা বলিয়া তিনি চাকরকে তামাক দিতে ডাকিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, সুধাংশু ধীরে ধীরে হীরালালের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

হীরালাল ছেলেটিকে কাছে লইয়া ঘুমাইতেছিল। পারুল তাহার বইখানি লইয়া একপাশে বসিয়া মনে মনে পড়িতেছিল। তরঙ্গিণী সব কাজ সারিয়া আপনার ভাত বাড়িয়া খাইতে বসিবে এমন সময়ে সুধাংশু আসিয়া ডাকিল, "বড়বউ ঠাক্‌রুণ!"

তরঙ্গিণী তাহার সাড়া পাইয়াই ভাতে ঢাকা দিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "ছোট্‌ ঠাকুরপো!—কখন এলে?"

সুধাংশু। তোমরা সবাই ভাল আছ?

তরঙ্গিণী ঘাড় বাঁকাইয়া একটা "হুঁ" বলিয়া পারুলকে ডাকিয়া বলিল, "তোর কাকাবাবুকে ব'স্‌তে আসন পেতে দে ত!" তারপর সুধাংশুকে— "তুমি বস আমি হাতটা ধুয়ে আসি" বলিয়াই ছুটিয়া ঘাটে চলিয়া গেল।

পারুল আসন পাতিয়া দিল বটে, সুধাংশু কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে ধূলার উপরেই বসিয়া পড়িল।

আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে তরঙ্গিণী আসিয়া বলিল, "এ কি হ'য়েছে, আসন পাতা রইল আর ধূলোয় ব'সেছ কেন ঠাকুরপো?"

সুধাংশু। তা হ'ক; আমাদের বাড়ীর খবর কিছু বল্‌তে পার?

তরঙ্গিণী। তুমি কতখানি কি শুনেছ আগে বল দেখি!

সুধাংশু। আমি ত কিছুই জানি না; শ্রাবণ মাসেই বোধ হয় দাদা পত্র লিখ্‌লেন,—"একখানা বাড়ী ঠিক্ ক'রে আমাকে লিখ্‌বে? আমরা যাচ্ছি।" আমি তাই ক'রলুম। তারপরের চিঠিতে লিখ্‌লেন,—"এখন যাওয়া হচ্ছে না,

পরে যেমন হয় লিখ্‌ব।"—তারপর যত চিঠি পেয়েছি সবেতেই শুধু "আমরা সবাই ভাল আছি"—আর কিছুই না। মাসখানেক হ'ল আর কোন খবরই নেই। মন বড়ই চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। আফিসে ছুটী চেয়ে পাঠালুম, মঞ্জুর হ'ল না; চাকরীতে জবাব দিয়ে চ'লে এসেছি। কল্‌কেতার বাসায় শুনে এলুম, দাদা সেখানে নেই; ভাব্‌লাম বাড়ীতেই আছেন। বাড়ীতে এসে শুন্‌ছি, পশ্চিম গেছেন। বউদিদির কথায় কাকীমা বল্‌লেন, "যম জানে", দাদার কথায় কাকাবাবু বল্‌লেন, "সে অনেক কথা শুনো তখন।" তুমি কি বল্‌বে বল দেখি!

তরঙ্গিণী সুধাংশুর একটু নিকটে বসিয়া তাহার বিদেশ যাওয়ার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সব একে একে বলিতে লাগিল। সমস্ত কথা শুনিয়া সুধাংশু কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তোমার কি বিশ্বাস হয়, বউঠাকৃরুণ, সে দেবচরিত্রেও কলি প্রবেশ ক'রতে পারে?"

তরঙ্গিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাসের কথা কেন জিগ্‌গেসা কর ঠাকুরপো?—পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি তাই বলে, তবু আমার তা বিশ্বাস হবে না। নিজের চোখ্‌কেও অবিশ্বাস ক'র্‌ব তবু তার সম্বন্ধে এমন কথাকে কখন মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারব না।"

সুধাংশু। আমারও বিশ্বাস ঠিক তাই;—কিন্তু তবে কি?—সত্যিই কি শেষটায় আত্মহত্যাই ক'রলেন?

তরঙ্গিণী। তা যে সে পারে না, এমন কথা বলি না; কিন্তু এবার তাও আমার মন নেয় না!

সুধাংশু। তবে?—

তরঙ্গিণী। তা আমি এখন কিছু বল্‌তে চাই না।

"শুধু আমাকে বল!—তোমার সঙ্গে আমার মনের কথাটা মেলে কি না দেখি;—কি বল দেখি?"—বলিয়া সুধাংশু তরঙ্গিণীর কাছে আরও একটু সরিয়া বসিল। তরঙ্গিণী তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া খুব নিম্নস্বরে কি বলিল।

হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শর বা গুলির আঘাত লাগিলে সুপ্ত ব্যাঘ্র যেমন লাফাইয়া উঠে, সুধাংশু সেইভাবে একবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই তাই।"

তরঙ্গিণী চাহিয়া দেখিল, সুধাংশুর খোঁচা খোঁচা চুলগুলি যেন শজারুর কাঁটার মত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, বড় বড় চক্ষুদুটি জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, বিশাল বক্ষঃ ঘন ঘন স্ফীত হইয়া খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস বহিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া পারুলের মুখখানি ভয়ে শুকাইয়া গেল; সে তার মায়ের কাছে একটু সরিয়া বসিল।

তরঙ্গিণী বলিল, "দ্যাখ ঠাকুরপো!—শুধু একটা সংশয়ে ভর ক'রে এখন মিছে একটা হৈ চৈ ক'রো নি, তাকে খুঁজে বার ক'রে তারপর যা মনে আছে ক'রো; এখন ভালমানুষটির মত বাড়ীতে যাও!—নাওয়া খাওয়া বোধ করি কিছুই হয় নি?"

সুধাংশু ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নাওয়া খাওয়া?—সে সব আজ থেকে পথে পথে বউঠাকরুণ!—বাড়ীতে এখন আর কি জন্যে যাব? যে বাড়ীতে বউদিদির স্থান হয় নি, দাদা যে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, সে বাড়ীর অন্ন আমার অভোজ্য, জল অপেয়।—আমি যাই, দেখি যদি তাঁদের কোন সন্ধান কর'তে পারি। তাঁদের যদি খুঁজে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি তবেই আবার দেশে ফিরব, নইলে তোমাদের সঙ্গেও এই শেষ দেখা!"

তরঙ্গিণীর ঠোঁট দুইখানি যেমন হাসি জমাইয়া গড়া বলিয়া মনে হয়, তাহার চক্ষুদুইটিও তেমনি যেন শুধু জল জমাইয়া গড়িয়া তোলা,—ভারী পান্‌সে; মর্ম্মে একটু কিছুর আঘাত লাগিলেই অমনি সেই ভাসা ভাসা চোখ-দুইটি হইতে জল ঝরিতে থাকে। তবে বর্ষণটা সকল সময়ে একই রকমের হয় না; কখন তড়তড়ে ফোঁটা, কখন 'ইলীশে গুঁড়ি' আবার কখন বা ধারাসম্পাত! সুধাংশুর কথাগুলিতে তাহার মর্ম্মে বেশ একটু আঘাত লাগিয়াছিল,একটা ভারী পশলাই আসিতেছিল; দুই চারি ফোঁটা ফেলিয়া কোন রকমে সেটাকে থামাইয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "তা কি হয়, কতদূর থেকে এলে অমনিমুখে চ'লে যাবে? বাড়ীতে না যাও আমার হাঁড়ীতে ত ভাত তরকারী আছে;—দে ত পারুল, তোর কাকাবাবুর ঠাঁই ক'রে!—আমি ভাত বেড়ে আনি।"

সুধাংশু তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, "না বউঠাকুরুণ! সত্যি বল্‌ছি, খাবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই;—নিতান্তই যদি শুধু মুখে যেতে না দাও, ঘরে যা আছে একটু মিষ্টি আর একটু জল এনে দাও!"

তরঙ্গিণী তাহাই করিল। সুধাংশু তিনটি আঙ্গুলের ডগে যতটুকু উঠে সেই রকম একটু মিষ্টি মুখে দিয়া পানীয়টুকু নিঃশেষে পান করিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি দুই তিনটা পাণ মুড়িয়া আনিয়া তাহাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথা যাবে বল দেখি?—কোথায় খুঁজ্‌বে মনে ক'রেছ?"

সুধাংশু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তা এখনও কিছু ঠিক করি নি, বউঠাকুরুণ! এই পর্য্যন্ত মনে ক'রেছি, তাঁদের খুঁজ্‌তে বেরুব, খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে যেথা যতদূরে গিয়ে পড়ি।"—তরঙ্গিণীকে অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিতে দেখিয়া আবার বলিল, "তুমি কাঁদ কেন?—তাঁরা যদি পৃথিবী

ছেড়ে না গিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয় বল্‌ছি, খুঁজে বার ক'রব;—পৃথিবীতে যত দেশ আছে, দেশে দেশে যত গ্রাম আছে, গ্রামে গ্রামে যত বাড়ী আছে, সব তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখ্‌ব ;—শুধু গ্রাম কেন ?—বন, নদীতীর, পাহাড়, পর্ব্বতের গুহা, যেখানে যেখানে যত আছে, যেথা যেথা মানুষ যেতে পারে, সব খুঁজে বেড়াব, তবু পাব না ?"—তারপর পকেট্‌বইএর একটা পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে একটা ঠিকানা লিখিয়া তরঙ্গিণীর হাতে দিয়া বলিল,—"তুমি যদি এমন কিছু জান্‌তে পার যা আমারও জানা দরকার, তবে এই ঠিকানায় পত্র দিও ! আমি যেথাই থাকি ঠিক পাব ; আমিও কিছু সন্ধান ক'রতে পারলেই তোমাকে পত্র লিখে জানাব।—যদি অনেক দিন আর কোন খবর না পাও তবেই বুঝবে, তাঁরা আর এ পৃথিবীতে নেই,—আর তাঁদের সুধাও তাঁদেরই কাছে—চ'লে—গেছে।"

সুধাংশু শেষকথাগুলি বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তরঙ্গিণী বহুক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া চোখের জলে আঁচল ভিজাইয়া ফেলিল।

নিম্নাভিমুখ পয়ঃপ্রবাহের গতিও বরং প্রতিরুদ্ধ করা যায়, কিন্তু পতনশীলের অধোগতি কেহ স্থগিত করিতে পারে না। মানুষ নিজে যেদিন ঘৃণাপরিত চক্ষে আপনার দিকে আপনি চাহিয়া দেখে, সেই দিন হইতেই তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

হীরালাল গঙ্গার ঘাটে বসিয়া এখন প্রায়ই চিন্তা করে, "দেবতা ব'লে বোধ হয় কোন স্বতন্ত্র জীব নেই, মানুষই পশুও হ'তে পারে, আবার দেবতাও হ'তে পারে !" তরঙ্গিণী যখন কথা কহে, তাহার

মুখের পানে চাহিয়া হীরলাল ভাবিতে থাকে, “স্বর্গ ব’লে বোধ হয় একটা স্বতন্ত্র রাজ্য নেই, সাধ্বীর মুখে ও শিশুর হাসিতেও স্বর্গ দেখা যায়!” তরঙ্গিণীর যত্নে নিজের পূর্ব্বাচরণের কথা মনে করিয়া লজ্জিতচিত্তে চিন্তা করিয়া থাকে,—“আমি এ অমৃতের হ্রদ ছেড়ে এতদিন মৃগতৃষ্ণার পিছনে ছুটে বেড়িয়েছিনু কেন?—এ রত্ন ফেলে শোরের মত' পুরীষের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিনু কেন?”

হীরালাল বাড়ীতে ফিরিবার দুই চারি দিন পরে একদিন তরঙ্গিণী তাহার কাছে বসিয়া অভিমানের অশ্রু মুছিতে মুছিতে আপনার দুর্দ্দশার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বলিল, “বিরাজঠাকুরপো যদি সেদিন বাড়ীতে না আস্‌তেন, আর আমাদের কথা তাঁর কাণে না উঠ্‌ত, তবে তুমি ফিরে এসেও আর আমাদের দেখ্‌তে পেতে না।”

হীরালালও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া—“সে যদি আর সব মানুষের মত হ’ত, তরু, তা হ’লে আমার ফিরে আসাও তোমরা দেখ্‌তে পেতে না”—বলিয়া বিরাজ তাহার জন্য যাহা যাহা করিয়াছিল সব প্রকাশ করিল। তাহাদের পরস্পরের এই দুঃখের কথা বলাবলিটা সেই দিনেই শেষ হইয়া গেল না; তাহার পর প্রায় প্রত্যহই হীরালাল যেন কি বলিবে বলিয়া তরঙ্গিণীকে নিকটে ডাকে, কিন্তু আসল কথাটা বলিতে পারে না, একটা যা তা বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দেয়।

সুধাংশু আসিয়া যেদিন তাহাদের বাড়ীতে বসিয়া তরঙ্গিণীর সঙ্গে সেই সব কথা কহিয়া যায়, হীরালাল সে সমস্ত ক্ষণই ঘুমাইয়া ছিল না। সুধাংশু চলিয়া যাইবার পর হইতে তাহার সেই “বলি বলি বলা গেল না”—ভাবটা বড় বেশী বেশী হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ প্রকাশের লজ্জা অপেক্ষা অপ্রকাশ

রাখার যাতনাটাই বেশী হইয়া উঠিল। সেই সময়ে একদিন তরঙ্গিণী তাহার কাছে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি মনের ভেতর কিছু একটা চেপে রেখেছ, আমাকে বল্‌বে বল্‌বে কর, কিন্তু বল না ;—বল্‌বে না ?"

হীরালাল সেদিন আর সেকথা চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কমলার অজ্ঞাতবাস ও অপবাদ সম্বন্ধে সে যাহা যাহা জানিত, তরঙ্গিণীকে বলিয়া ফেলিল। স্তব্ধভাবে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া তরঙ্গিণী অশ্রুভারাক্রান্ত-নেত্রে হীরালালের দিকে যে ভাবে চাহিয়া রহিল তাহা অনির্ব্বচনীয়! তাহার সে দৃষ্টি যেন আহত মর্ম্মের গভীর মৌন আর্ত্তনাদ ও নির্ব্বাক্ ভৎ‌র্সনা! তাহাতে ভালবাসা আছে, ঘৃণা আছে, করুণা আছে, রাগও আছে, এবং রাগটাই যেন কিছু বেশী বেশী ; কিন্তু কাহার উপরে সে রাগ করিবে ? অপরাধী আপনার স্বামী! তরঙ্গ যেমন সবেগে শৈল-তটে আঘাত করিয়া শৈলের কিছুই করিতে পারে না, প্রতিহত হইয়া সাগরের হৃদয়ই অধিকতর চঞ্চল ও আকুল করিয়া তুলে, তরঙ্গিণীর রাগও তেমনি হীরালালের কিছু করিতে না পারিয়া তাহার নিজের হৃদয়কেই বিধ্বস্ত ও আলোড়িত করিয়া তুলিল। তাহার হৃদয় ঘন ঘন স্ফীত হইতে লাগিল এবং হীরালালকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া সে বিহ্বল হৃদয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আর একদিনও তরঙ্গিণী এমনই করিয়া এতই কাঁদিয়াছিল,—যেদিন হীরালালকে সে কিছুতেই কমলার বাপের বাড়ী যাওয়ার সম্বন্ধে সত্য কথা বলাইতে পারে নাই। সেদিন হীরালাল তাহার কান্না দেখিয়া শুধু হাসিয়াছিল আর পরিহাস করিয়াছিল, আজ সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

রোদনের পালা শেষ করিয়া হীরালাল বলিল, "কেঁদে এখন আর মিছে কি হবে তরু?—এতদিন গেছে আরও দুদশ দিন যেতে দাও! বিরাজ আসুক, আমি নিজেই এসব কথা তাকে ব'ল্‌ব। এখন অন্য কারুকে ব'ল্‌তে গেলে হিতে বিপরীত হ'য়ে দাঁড়াবে।"

তরঙ্গিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "এতদিন একথা আমাকে বল নি কেন? আর একদিনও একথা চেপে রেখো না! সে আমার বড় অভিমানী—সে কি আর এতদিন বেঁচে আছে?"—এই বলিয়া তরঙ্গিণী আবার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

হীরালাল ভারী ফাঁপরে পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "চেপে রাখা যে আর ভাল হ'চ্ছে না তা আমিও বুঝ্‌ছি, কিন্তু প্রকাশ ক'রতে গেলেও যে আগে আমারই সর্ব্বনাশ!"

তরঙ্গিণী কাঁদিতে কাঁদিতে একবার থামিয়া বলিল, "তোমার সর্ব্বনাশ কি আমারও নয়?—সে যদি অভিমানে, কলঙ্কের লজ্জায় আত্ম-ঘাতিনী হয়, সে পাপেও কি আমাদের সর্ব্বনাশ হবে না? মানুষের রাগকে আমি ভয় করি না, আমি আজই সুধাঠাকুরপোকে পত্র লেখাব।"

তরঙ্গিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল; হীরালাল গালে হাত দিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল।

চতুর্থ খণ্ড

——:*:——

হিন্দুর বিশ্বাস, কাশীতীর্থে মরিতে পারিলেই জীব শিবত্ব লাভ করিয়া থাকে, তাহাকে আর পুনঃ পুনঃ এই বিবিধদুঃখ-তরঙ্গসমাকুল শোকাবর্ত্তময় ভবার্ণবে বিধ্বস্ত হইতে হয় না। তাহাতেই যাহারা দুঃখ-শ্রান্ত, শোক-সন্তপ্ত ও সংসারের উপরে বিরক্ত, তাহারা এই 'অসী' ও 'বরণা' নদীর মধ্যগত শিবগঙ্গাপালিত আনন্দময় মহাতীর্থে আসিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকে। মৃত্যুর পরের কথা যাহাই হউক, জীবনে কিন্তু কোন তীর্থ মানুষকে দেবতা করিতে পারে এমন দেখা যায় না। মানুষ আপনার পাপরাশি আনিয়া পুণ্যতীর্থকেও কলুষিত করিয়া থাকে, এবং যে তীর্থে যাত্রী ও অধিবাসীর সংখ্যা যত অধিক সেই তীর্থে পাপের মাত্রাও যেন তত বেশী বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই কি কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ রূপকে এই ব্রহ্মাবিনির্ম্মিত বারাণসী-ক্ষেত্রকেই মহামোহের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

কাশীধামের একটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পল্লীতে স্বতন্ত্র একখানি দোতলা বাড়ীতে বামাসুন্দরী নামে এক বিধবা রমণী বাস করিয়া থাকেন। রমণীর গর্ব্বের জিনিষ প্রধানতঃ দুইটি,—রূপ আর যৌবন,—বামাতে ইহার কোনটিই ছিল না। তিনি শুধু নামে মাত্র সুন্দরী; আর জোয়ারের সঙ্গেই প্রায় যৌবনের তুলনা দেখা যায়, সে হিসাবে অনেক দিন হইতেই তাঁহার বয়সে ভাঁটা চলিতেছে, কিন্তু রূপের গর্ব্ব ও যৌবনের মত্ততাটা এখনও তাঁহাতে পূর্ণমাত্রাতেই বিদ্যমান্ আছে। আগুন নিভিয়া গেলেও কিছুক্ষণ তাহার উত্তাপ থাকে,

সূর্য্য অস্তে যাইবার পরেও কিছুক্ষণ পশ্চিম গগনে আরক্তরাগ লক্ষিত হয়, এবং ঐশ্বর্য্য চলিয়া গেলেও মানুষের মনে তাহার উষ্মাটা থাকিয়া যায়; অতএব যৌবন চলিয়া গেলেও বামার মনে যদি তাহার একটু গর্ব্ব থাকে তাহা বিচিত্র নহে। তবে অতীত যৌবন শুধুই যে তাঁহার মনে একটু গর্ব্ব বা মত্ততা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা নহে;—জোয়ারের জল চলিয়া যায়, সঙ্গে করিয়া যে সকল আবর্জ্জনা ভাসাইয়া আনে সেইগুলিকে নদীর দুইকূলে ফেলিয়া যায়,—বামাসুন্দরীরও উভয়কুল—স্বামিকুল ও পিতৃকুল, তাঁহার যৌবনজলতরঙ্গে সমানীত বহুবিধ আবর্জ্জনায় সমাচ্ছন্ন।

প্রকৃতির কৃপণতাজন্য অভাব যে কৃত্রিমতার বদান্যতায় পূর্ণ হইবার নহে, প্রার্থীর মন তাহা বুঝিতে চাহে না;—বামাসুন্দরীও আকৃতির বিরূপতাকে প্রসাধনের সহায়তায় ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রসাধনের ব্যবস্থায় হিন্দুবিধবার প্রতি শাস্ত্র ও সমাজ বড়ই কঠোর। তথাপি সে অবস্থায় যতটুকু চলিতে পারে তিনি তাহাতে ত্রুটি করিতেন না। একটা বিষয়ে বিধাতাও বামার প্রতি বড়ই বাম; তাঁহার মস্তকের মধ্যভাগে 'সাহারা' মরুর মত বিশাল একখানা আকর্ণপ্রসারী ইন্দ্রলুপ্ত। মস্তকের উভয়পার্শ্বে ও পশ্চাদ্‌ভাগে মরুভূমির তৃণের মত বিরল ও হ্রস্ব যে কয়েকগাছি কেশ ছিল সেগুলিকেও একত্র করিয়া বাঁধা যায় না। বামা কোনরূপে তাহাতেই পরচুল জড়াইয়া একটু বড়রকমের একটি গ্রন্থি বাঁধিয়া কবরীর সাধ পূর্ণ করিয়া থাকেন। আহারাদির বিষয়েও তাঁহার বাঁধাবাঁধি কোন একটা নিয়ম ছিল না। কেনারাম চূড়ামণি কমলাকে এই বামাসুন্দরীর নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন।

বামা নিজে যেমনই হউন, কমলাকে কিন্তু খুব যত্নে রাখিয়াছেন; তাহার গায়ে কষ্টের বাতাস লাগিতে দেন না। সে কোন কাজ করিতে উদ্যত

হইলে তিনি তাহার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া নিজে করিয়া থাকেন। তাহাকে কোন কিছুর অভাবও বুঝিতে দেন না; অভাব হইবার পূর্ব্বেই প্রয়োজনীয় সমস্তই সমাহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু পিঞ্জর লৌহময় না হইয়া স্বর্ণময় হইলেও পিঞ্জরবাসের দুঃখ কি অল্প হইয়া থাকে? কমলা উপরের যে ছোট ঘরখানিতে থাকে, তাহাতে বসিয়া আকাশ, গৃহশিখর ও মন্দিরাদির চূড়া ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবীর সঙ্গে তাহার বড় সম্বন্ধ নাই, কেবল পৃথিবীর উপরে স্থাপিত এই পর্য্যন্ত। কমলার স্নান, ভোজন, সমস্তই সেই রুদ্ধদ্বার গৃহের অভ্যন্তরে, এবং শয়ন, উপবেশন, সমস্তই সেই ঘরখানির ভিতরে। সেবাড়ীতে অতিথি ও অভ্যাগতের সংখ্যা নিতান্তই বিরল; কদাচিৎ কেহ আসিলে বামা অগ্রে কমলাকে কক্ষে আবদ্ধ করিয়া তৎপরে বহির্দ্বার অর্গলমুক্ত করেন। অজ্ঞাতবাসের সেইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত বুঝিয়া কমলা তাহাতে দুঃখ করে না; কিন্তু বামাসুন্দরীর সেই মুখখানি ভিন্ন আর অন্য মানুষের মুখও দেখিতে পায় না। প্রতিদিন সেই একই রুদ্ধকক্ষে একাকিনী অবস্থান, কর্ম্মহীন দীর্ঘদিনগুলি শুধু মনোবেদনা লইয়া যাপন, আর নিদ্রাহীন রজনীর সেই শয্যাকণ্টকি। তাহার জীবনটা ঠিক যেন কোন নির্জ্জনমরুপ্রবাহিনী বিশীর্ণা তটিনীর ক্ষীণ প্রবাহ; উপকূলে পুষ্পিত তরু নাই, তীরে শ্যাম তৃণ নাই, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু শুভ্র সিকতা ধূ ধূ করিতেছে! আর সেই একটানা জীবনের ক্ষীণ ধারাটি লইয়া সে দিবানিশি একভাবে একপথে বহিয়া চলিয়াছে। কখন ক্ষুদ্র আশার একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিয়াও তাহার এ নিরানন্দ নিৰ্জ্জীবতাকে ভাঙ্গিয়া দেয় না। ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্ত্তমান বিষাদময়, অতীতের স্মৃতিমাত্র তাহার সম্বল, অতীতের চিন্তামাত্র সঙ্গিনী; কিন্তু সুখের স্মৃতি হই-

লেও অতীতের স্মৃতিতে আনন্দ কোথায় ? জীবনের যেগুলি বড় সুখের দিন, সেগুলির স্মৃতিও মৃত প্রিয়জনের স্মৃতির ন্যায় বড় দুঃখের, বড় বিষাদের।

বামাসুন্দরী মধ্যে মধ্যে কমলার কাছে আসিয়া বসেন, তাহার চিত্ত-বিনোদন করিতে কত প্রকারের গল্প করেন ; কমলা সে সকল গল্প শুনিতে চাহে না, তিনিও শুনাইতে ছাড়েন না। সে সকল গল্পের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কমলা অনেক সময়ে জাগিয়াও যেন ঘুমাইয়া থাকে। একদিন কথায় কথায় তিনি কি একটা কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কমলা ভারী রাগ করিয়াছিল। 'পরিহাস', 'মনপরীক্ষা', ইত্যাদি বলিয়া তিনি কথাটাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কমলার মনে সেই হইতে একটা সংশয় ও আশঙ্কা জাগিয়া রহিল।

নিত্যব্যবহারের জন্য বামাসুন্দরী বেশ মিহি দুইজোড়া পাছাপেড়ে কাপড় আনিয়া কমলাকে পরিতে দিলেন, কমলা তাহা পরিল না। সে আসিবার সময়ে যে দুই তিনখানি মোটা কাপড় সঙ্গে আনিয়াছিল, পর্য্যায়ক্রমে তাহাই পরিতে লাগিল এবং মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলেই সাবান দিয়া নিজে কাচিয়া লইতে লাগিল। নিয়ত ব্যবহারে সেগুলি জীর্ণ হইয়া পড়িল, স্থানে স্থানে ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল ; কমলাও সেলাই তালি প্রভৃতি, কাপড়ের ছেঁড়া-রোগের যত প্রকার চিকিৎসা জানিত সব করিতে লাগিল। বামা তাহা দেখিয়া হাস্য করেন আর বলিয়া থাকেন, "ও মা ! এ কি গো ! এই হ'ল তোমাদের ভাল খাবার, ভাল পরবার বয়েস্ ; এখন থেকেই এমন কেন গো !" কমলা চুপ করিয়া থাকে।

বামাসুন্দরী কত বলেন, কমলা তবু চুল বাঁধে না। তিনি যে অনেক রকমের বাহারে খোঁপা বাঁধিতে জানেন, তাহার দীর্ঘ ও বিপুল কেশদামে তাহারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু কমলাকে কিছুতেই রাজী

করিতে পারেন না। দুই চারিদিন চুল টানাটানি ছিঁড়াছিঁড়ির পর তিনি সে প্রযত্ন পরিত্যাগ করিলেন।

কমলা পাণ খায় না। বামাসুন্দরী তাহার জন্য পাঁচরকমের মসলা রাখিয়া দেন, কমলা তাহাও মুখে দেয় না ; তিনিই দোক্তাসম্বলিত তাম্বুলের সঙ্গে চর্ব্বণ করিয়া সেগুলির সদ্ব্যবহার করেন। একদিন তিনি যে কাগজে মুড়িয়া মসলা আনিয়া কমলার ঘরে রাখিয়া গেলেন, তাহার উপরে দৃষ্টি পড়িলে কমলা দেখিল, সেখানা একখানা পুরাতন চিঠি। দুই চারিটা বর্ণে দৃষ্টি পড়িতেই সমস্তটা পড়িবার কৌতূহল হইল। কমলা পড়িয়া বুঝিল, সে পত্রখানা চূড়ামণি কবে বামাসুন্দরীকে লিখিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—নীলকমল কমলার খরচসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত একটি পয়সাও দেন নাই,—বিরাজের খুব ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কমলার উপরে বিরাজের বড়ই বিদ্বেষ ও ঘৃণা,—তাহার লুকাইয়া চলিয়া আসাতে গ্রামে একটা কুৎসিত অপবাদ উঠিয়াছে,—তাহাকে যাবজ্জীবন প্রবাসেই বাস করিতে হইবে, ইত্যাদি।

পত্রখানা পড়িয়া কমলা গালে হাত দিয়া স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। বিরাজের বিবাহ হইয়াছে, এই সংবাদে তাহার একটু আনন্দ হইল বটে ; কিন্তু সে আনন্দটুকু, 'গ্রামে অপবাদ' ও 'বিরাজের ঘৃণা', এই দুইএর চিন্তায় তুষারসমুদ্রে বহ্নিকণার ন্যায় নিমেষে হারাইয়া গেল। এই দুইই যে ঘটিবে, তাহা সে পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিল ; কিন্তু অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলেরও পূর্ব্বাশঙ্কা অপেক্ষা সূচনা বা সঙ্ঘটনই কি অধিক উদ্বেগাবহ নহে? কমলা ভাবিতে লাগিল, ভাবিতে ভাবিতে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে দুইচক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

দিন কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই; সন্ধ্যার দীপ লইয়া বামাসুন্দরীকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া উঠিয়া পড়িল এবং পত্রখানাকে লুকাইয়া ফেলিয়া কাপড় কাচিতে নামিয়া গেল।

কমলা উপরে আসিয়া ধৌত বাস পরিধান করিয়া দেবতাপ্রণামান্তে সজলনেত্রে প্রার্থনা করিল, "বিশ্বেশ্বর! এ পত্রের কথাই সত্য হ'ক! তিনি সুখী হ'ন!—আমি তোমার চরণে মন সমর্পণ ক'রতে পারি!"

মধ্যাহ্নে একদিন কমলা নিজের কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছে এমন সময়ে বামাসুন্দরী সেই কক্ষে আসিয়া বসিলেন এবং একথা সেকথা পাঁচ কথার মধ্যে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হর যে কাশীতে এসেছে গো!"

কমলা বামার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার চ'লে আসা নিয়ে গ্রামে খুব হৈ চৈ প'ড়ে গেছে।—মুখপোড়া মানুষের কি আক্কেল, বাছা! তার নামে অবধি একটা মিছে কথা রটিয়েছে গা! ও মা! অপ্রাধ কি না ভালবাসাবাসি আছে ব'লে সে তোমার খোঁজখবর নিতে তোমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা ক'রত!"

কমলা কথা কহিল না। বামাসুন্দরী পুনশ্চ বলিলেন,—"আহা, তোমাদের সে বড়ই ভালবাসে!—তোমার বাপের জন্যে ত কত দুঃখুই ক'রলে!—তোমার কথা কইতে কইতে তার চোখে জল এল! চমৎকার মানুষ, বাবু!—এতটা যে বিষয়, তার একটু গরম নেই, যেন মাটীর মানুষ!"

বামাসুন্দরী বিবিধ ছন্দে হরকুমারের গুণানুকীর্ত্তন করিলেন ; কিন্তু শ্রোত্রীর গুণগ্রাহিতার পরিচয় না পাইয়া কীর্ত্তনে ভঙ্গ দিয়া দুঃখিতচিত্তে উঠিয়া পড়িলেন।

তিনি চলিয়া যাইবেন এমন সময়ে কমলা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "দ্যাখ, পিসীমা ! আমি যে তোমার এখানে এসে লুকিয়ে আছি, এ কথা যেন তাঁকে ব'লো না !"

বামাসুন্দরী মুখ না ফিরাইয়াই—"না, বাছা, আমার সেকথায় দরকার কি"—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার দুই একদিন পরেই একদিন হরকুমার কমলার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা কি করিতেছিল, সহসা হরকুমারকে দেখিয়া যেন কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল ; কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

হরকুমার একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল, "কত দিনের পর দেখা ক'রতে এলুম্, কমলা! ব'স্‌তেও বল্‌লে না ?"—তারপর জুতা খুলিয়া —"আমি চিরদিনই তোমার দোরে অপ্রিয় অতিথি, কখন ব'স্‌তে বল নি, আজও ব'লবে না তা জানি"—বলিয়াই দ্বারদেশে বসিয়া পড়িল।

মেজেতে একখানা পাখা পড়িয়া ছিল, হরকুমার সেইখানাকে তুলিয়া লইয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিল, "তোমার আর আমার অদৃষ্টকে বিধাতা কি একই কলমে লিখেছিলেন, কমলা ?—তোমার মত আমারও দেশে মুখ দেখান ভার হ'য়েছে ; আমিও দেশ ছেড়ে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।—সংসারে আমার কেউ নেই, তোমারও সব থেকেও কেউই নেই। তুমি যাদের আপনার ব'লে জান্‌তে,—হয় ত এখনও আপনার ব'লেই ভাব, তারা সবাই তোমাকে মন থেকে বা'র ক'রে দিয়েছে,

কমলা। তুমি তাদের সুবিধের জন্যে এই প্রবাসে এসে লুকিয়ে র'য়েছ, তারা কিন্তু সবাই নিজের নিজের সুখ ও সুবিধে খুঁজে নিয়েছে। তুমি যে আর কেন এখনও বুকে রাবণের চিতা নিয়ে ব'সে আছ জানি না!"

হরকুমার অনেকক্ষণ বসিয়া অনেক কথা কহিল, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল; কমলা তাহাতে একটিও কথা কহিল না, একটিরও উত্তর দিল না। আরও কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া হরকুমার উঠিয়া গেল; তখনই আবার ফিরিয়া আসিয়া দ্বারদেশ হইতে বলিয়া গেল, "শুনলুম, তোমার শ্বশুর না কি তোমার খরচপত্রসম্বন্ধে যা দেবেন ব'লেছিলেন তা দিচ্ছেন না; সে জন্যে তুমি একটুও ভেব না! আমার এত বিষয় কি জন্যে রয়েছে? আর সবাই যাই করুক, আমি তোমাকে ভুলি নি, কমলা!—কখন ভুলবও না। আজ যাই, আর একদিন এসে দেখা ক'রব।"

হরকুমার চলিয়া গেলেই কমলা নামিয়া আসিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বামাসুন্দরীকে বলিল, "হ্যাঁ, পিসীমা! আমি তোমাকে মানা ক'রেছিনু নয় যে, হরদাদাকে কোন কথা ব'লো না! তবু সব ব'লেছ?"

বামা। ও মা! আমি কেন ব'লতে যাব গো! আমার কি মাথাব্যাথা প'ড়েছে, বাছা!—সে নিজেই সব ব'ললে; আরও কত কথা ব'ললে যা আমি শুনি নি।—এই যে তোমার বাপ তার কাছে একটি কাঁড়ি টাকা দেনা ক'রে গেছেন, সে কথা কি তুমি আমাকে ব'লেছিলে, বাছা?

কমলা। সে আর বলবার মত কথা কি, পিসীমা? বাবা দেনা ক'রে গেছেনই শুনেছ,—কত টাকার বিষয় বাঁধা রেখে গেছেন, তা কিছু শুনেছ কি?

বামা। আমার তাতে দরকার কি, বাছা? যার টাকা সে বুঝ্‌বে, আর তুমি বুঝ্‌বে। আমি আমার নিজের পাওনাগুলি পেলেই বাঁচি—বুঝ্‌তে পারি।

কমলা। তবে সেসব কথা কইতে আস কেন? আমি কি হরদাদার টাকা শোধের ব্যাবস্থা না ক'রেই এসেছি, না তোমার টাকা দেবার বন্দোবস্তই না ক'রব।

বামা। হরোর টাকা শোধের ব্যাবস্থা যেমন ক'রেছ, আমারও তেমনি ক'রবে না কি?—তা হ'লেই আমি টাকা পেয়েছি আর কি!

কমলা। কেন, শ্বশুর কি এখনও হরদাদার পাওনা সব চুকিয়ে দেন নি?

বামা। তোমার শ্বশুর তেমনি রীতের মানুষ কি না? মোটে আঁকে আমলেই আনেন নি, তার সব!—বিষয়গুলি সব দখল ক'রে ব'সেছেন, এখন টাকা চাইতে গেলে বলেন,—"তার মেয়ে ত আছে, তার কাছে বুঝে নাও গে!"—আর যা ব'লেছেন, তা শুন্‌লে এখন তুমি দশ দিন ভাতে হাত দেবে না।—ওমা! মিন্‌সের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, কি ক'রে ব'ল্‌লে গো! ব্যাটা না হয় ত্যাগই ক'রেছে, তবু বউ ত বটে!—ছি ছি ছি!—

কমলা। যাক্, শ্বশুর কি ব'লেছেন, সেকথা আমি শুন্‌তে চাই না; যাই ব'লুন, হরদাদার পাওনা তা ব'লে উড়ে যাবে কি? আমি ত জানি, আমি যেমন ক'রে পারি বাবার দেনা শোধের ব্যাবস্থা ক'রব।—এই কথা বলিয়া কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

বামাসুন্দরী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা বৈ কি, বাছা!—ধার রেখে ম'লে শুনেছি, মুক্তি হয় না; মরা বাপের দেনা আপনাকে বেচেও শোধ ক'রতে হয়।"—এই বলিয়া তিনি আবার একটু হাসিলেন।

বামাসুন্দরীর সে হাসিটা কমলার গায়ে যেন আগুন ছড়াইয়া দিল। সে রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "ভ্যাখ, পিসীমা! তুমি মনে কর বুঝি, তোমার ঘোরফেরের কথাগুলো কেউ বুঝ্‌তে পারে না?—বাবা আমাকে অপাত্রে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'ন নি; তাঁর দেনা শোধ করবার জন্যে তাঁর মেয়েকে কোন পিশাচের কাছে আপনাকে বেচ্‌তে হবে না।—সত্যি কিছু আমি তোমার বাঁদী নই যে, যা ব'লবে তাই শুনে চুপ্‌ ক'রে থাক্‌তে হবে। যে জন্যে আমি তোমার এখানে এসে ছিনু, তা সিদ্ধ হ'য়েছে; কালই আমি তোমার বাড়ী থেকে চ'লে যাব।"

বামাসুন্দরী প্রথমে কমলার রাগ দেখিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন; তারপর হাসির বেগটা সামলাইয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যাবে তা যেও না, বাছা!—থেকেই কোন্ রাজা ক'রে দিয়েছ যে গেলেই আমি কাঙ্গাল হ'য়ে যাব।—যাবার আগে, আমি যেগুলি খরচ ক'রেছি তা ত দিয়ে যেতে হবে? যে তোমাকে গচ্ছিত রেখে গেছে, সে আসুক! তুমি যাবে বল্‌লেই ত আর আমি যেতে দিতে পারব না।"

কমলা আর বৃথা বিতণ্ডা না করিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিল। সেরাত্রিতে সে জল অবধি পান করিল না। শুধু রাগ নয়, দুঃখ নয়, বামার কথায় তাহার মনে একটু ভয়ও হইয়াছিল। অনেক রকমের অনেক ভাবনা আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিল। সে যে অবিজ্ঞাত প্রবাসে অবান্ধব পুরে বন্দিনী, একথাটা পূর্ব্বে আর একদিনও তাহার মনে হয় নাই।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে হরকুমার আবার আসিল এবং বামাসুন্দরীর সঙ্গে অনুচ্চকণ্ঠে দুই চারিটা কথা কহিয়াই একবারে কমলার কক্ষে আসিয়া বসিল। কমলা কথা না কহিলেও সে আপনিই অনেক রকমের অনেক

কথা কহিল; শেষে উঠিয়া যাইবার সময়ে একটু নিম্নস্বরে বলিয়া গেল, "শুন্‌লুম্, রাগ ক'রে তুমি কাল থেকে উপোষ ক'রে আছ।—কার উপরে রাগ তাপ কর, কমলা? তুমি চিন্‌তে পার নি, এ মাগী ভারী সয়তান!—বেশী দিন যাতে তোমাকে এখানে থাক্‌তে না হয়, আমি তারই চেষ্টায় আছি। ছেলেমানুষের মত মিছে রাগ ক'রো নি, নাওয়া খাওয়া কর! তোমার কোন ভয় বা ভাবনা নেই।"

হরকুমার চলিয়া গেলে কমলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল না, 'সয়তান' কে?—বামা অথবা হরকুমার? তবে বুঝিতে পারিল যে, সে একটা ঘোর ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছে।

মধ্যাহ্নে বামাসুন্দরী আসিয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "কি গো, বড়মানুষের বউ! নাইতে খেতে হবে?—রাতটে ত উপোষেই কাটিয়েছ, দিনটেও কি তাই ক'রবে না কি?"

কমলা কথা কহিল না; বামাসুন্দরীর গৃহে জলগ্রহণ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি নাই। তিনিও আর বেশী সাধিলেন না;—"দেখা যাক্, উপোষ ক'রে কদিন যায়—এই বয়েসে এমন রাগ ঢের দেখেছি"—বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন।

কমলার ভাত বাড়িয়া একপাশে ঢাকা দিয়া ফেলিয়া রাখিয়া বামাসুন্দরী আপনি আহার করিলেন, বাসন মাজিলেন, ঘর ধুইলেন, কাপড় কাচিলেন, ধপ্ ধপে ফরসা একখানা কাপড় পরিলেন এবং একগাল পাণ মুখে দিয়া, গোটাকতক সাজা পাণ ও দোক্তার কৌটা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া, ঘরে বাহিরে কুলুপ লাগাইয়া তিনি বেড়াইতে বাহির হইলেন।

৩

দিন চলিয়া গেল, কমলা খাইতে নামিয়া গেল না। সন্ধ্যা আসিল, বামাসুন্দরী ফিরিয়া আসিলেন না। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহানগরীর জনকোলাহল ক্রমেই নীরব হইয়া আসিল, বামাসুন্দরী তখনও ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া কমলার মনে বড় ভয় হইল। সে মুক্ত বাতায়নের নিকটে আসিয়া বাহিরে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপবাসক্লিষ্ট দেহ তন্দ্রাবেশে অবশ হইয়া পড়িতেছিল, তথাপি সে শয়ন করিল না। যে কক্ষে সে বাস করিয়া থাকে তাহার দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিবার কোন উপায় ছিল না। তেমন কক্ষে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেও আজ তাহার ভয় হইতেছিল; অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কমলা সেই বাতায়নতলেই বসিয়া পড়িল এবং মাথাটি দেয়ালে ঠেকাইয়া চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল। এতদিন যে ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখিয়া তাহার হৃদয় আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিতেছিল, আজ তাহা যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহার চক্ষের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসন্ন বিপদের একটা আতঙ্ক আসিয়া তাহার হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। সে ভাবিতেছিল,—"এ চক্রান্ত কাহার?—বামার বা হরকুমারের, অথবা উভয়ের?—চূড়ামণিও বোধ হয় ইহাতে আছেন;—শ্বশুরও আছেন কি?"—এই কথাটা মনে হইতেই তাহার চক্ষে অশ্রুধারা বহিল। অশ্রু মুছিতে মুছিতে আবার ভাবিতে লাগিল,—"সংসার এমন কেন? ধর্ম্মের পথেও পদে পদে এত বিপদ আসিয়া জড়ায় কেন? একটা অনাথা অবলাকে দুঃখ দিবার জন্য চারিধার হইতে এত চক্রান্ত কেন? যাহার সুখ নাই, সুখের আশাও নাই, তাহার মরণ হয় না কেন?"—আবার তাহার গণ্ডস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল।

কমলা আঁচলটি লইয়া চক্ষু মুছিতে যাইবে এমন সময়ে বাহিরে চাবি খোলার মত একটা শব্দ শুনিতে পাইল। বামাসুন্দরী ফিরিয়া আসিলেন বুঝিয়া সে চক্ষু মুছিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

কক্ষদ্বারে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া কমলা চাহিয়া দেখিল, বামা নহে,—একজন পুরুষ! ত্রস্তহৃদয়ে তড়িদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

"ভয় নেই, কমলা—আমি" বলিয়া আগন্তুক জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

সে পুরুষ যদি তখনই বাতাসে মিলাইয়া গিয়া আপনাকে প্রেত বলিয়া জানাইয়া দিত, অথবা অন্য কোন অপরিচিত পুরুষ হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় কমলার তাদৃশ ভয় হইত না। শয়নকক্ষে বিষধর দেখিয়া লোক যেমন ত্রস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়ে, নির্জ্জন গৃহে গভীর রাত্রিতে কক্ষমধ্যে হরকুমারকে দেখিয়া সেও সেইরূপ হইয়া পড়িল।

হরকুমার হাসিয়া বলিল, "আমি ভূতপ্রেত নই, চোরডাকাত নই, বাঘভালুকও নই; আমাকে দেখে তোমার এত ভয় কেন, কমলা?"

বিস্ময় ও ভীতির প্রথম জড়তাটা অপগত হইলে কমলার হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে তীব্রস্বরে বলিল, "হরদাদা! এ সব কি?—এসব কেন?—স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌বেন?"

হর। কিসের কি জান্‌তে চাও আগে স্পষ্ট ক'রে বল!—

কমলা। আপনি আমার কে?

হর। এত দিনের পর আজ একথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

কমলা। গ্রামসম্পর্ক ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ আছে?—মানুষের মত উত্তর করুন!

হরকুমার একটু থতমত খাইয়া বলিল, "না, তা আর এমন বিশেষ কি আছে ;—তবে—"

কমলা। তা যদি নেই তবে আপনি এমন সময়ে এখানে কেন?—কেনই বা আপনি দিন নেই রাত নেই যখন তখন আমার সঙ্গে কথা কইতে আসেন?

হর। কথা ত ছেলেবেলা থেকেই ক'য়ে আসছি, কমলা!—আর তাতেই বা এমন দোষ কি হ'য়েছে?

কমলা। ছেলেবেলার কথা জানি না; জ্ঞান হবার পর আমি কখন আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে কথা ক'য়েছি? এখন আপনি ছেলেমানুষটি ন'ন, আমিও নই;—অবস্থাও আমার এখন ঢের ফিরে গেছে। দুঃখিনীর দুঃখের উপরে কলঙ্কের বোঝা চাপাতে আপনার এ জিদ্ কেন?—এখন যান! কিছু বল্‌বার থাকে কাল দিনের বেলা এসে ব'ল্‌বেন।

হরকুমার হাসিয়া বলিল, "এই জন্যে এত রাগ?—তুমি এখনও ঠিক সেই ছেলেবেলার ছোট্ট মেয়েটিই আছ, কমলা! আকার একটু বেড়েছে বটে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একটুও হয় নি।—কলঙ্ক ত লোকের কথা, তার কি কিছু মূল্য আছে? আর তাতেই বা তোমার ভয় কি? যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'য়েছিল, সে তোমাকে পরিত্যাগ ক'রেছে। তোমার শ্বশুর তোমাকে দেশছাড়া ক'রেছেন। অপবাদ কুলকামিনীদের তালিকা থেকে তোমার নাম তুলে দিয়েছে।—"

হরকুমারের মর্ম্মভেদী কঠোর পরিহাসে কমলার হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হইল। স্বামীর কথা না শুনিয়া শ্বশুরের কথায় অজ্ঞাতবাসে আসিয়াছে বলিয়া আজ প্রথম তাহার হৃদয়ে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সে অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হরকুমার হাসিয়া বলিল, "তুমি কেন কাঁদ, কমলা? কাঁদ্‌বার কথা ত আমার! তোমার জন্যেই ত আমি কলঙ্কের ভাগী হ'য়েছি, ঘরে পরে লাঞ্ছিত হ'য়ে দেশ ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছি।— আমি তোমাকে চিরদিন দিয়ে এসেছি হৃদয়ের অকপট প্রীতি আর পূজা, পেয়ে এসেছি শুধু ঘৃণা আর প্রত্যাখ্যান! কেন তুমি আমাকে এত ঘৃণা কর? আমি কি, কমলা?"

কমলা চক্ষু হইতে অঞ্চল অপসৃত করিয়া বাষ্পকম্পিতকণ্ঠে তীব্রস্বরে বলিল, "আপনি যে কি তা আপনিই জানেন, আর জানেন যিনি অন্তর্যামী! বাবা আপনাকে সন্তানের মত দেখ্‌তেন, তাই আমিও আপনাকে বড় ভাইয়ের মতই দেখে এসেছি। আপনার মন যে এত নীচ তা আর কখন এতটা বুঝ্‌তে পারি নি।"

হরকুমার। আমাব মন যে নীচ তা কিসে বুঝ্‌লে?

কমলা। নীচ না হ'লে কে এমন সময়ে অসহায় পরস্ত্রীর ঘরে এসে তার কাছে নিজের জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দেয়?

হরকুমার। আরাধ্যদেবতাকে নির্জ্জনে পেয়ে তার চরণে হৃদয়ের প্রীতি-ভার ঢেলে দেওয়া কি নীচতা, কমলা?—যদি তাই হয়, সে দোষ কার?— আমার, না যে তোমাকে এত সুন্দর ক'রে পাঠিয়েছে, আমার মনকে সুন্দর দেখে এমন মুগ্ধ হ'বার মত ক'রে দিয়েছে, তার?—কেন তুমি তোমার এই ফুল্লমল্লিকার মত শুভ্ররূপরাশি নিয়ে আমার চোখের এত নিকটে ফুটে-ছিলে? কেন আমি ভিক্ষে ক'রেও তোমাকে পাই নি?—তোমাকে পাবার মত আমার কি না ছিল? কেন তবে তোমার বাপ আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য ক'রে আমার মুখের গ্রাস—আমার পিপাসার জল, আর একজনকে সেধে দিয়েছিলেন? তুমি আমার জন্যেই জন্মেছ, তাই তাঁর সে কাজে বাজ

প'ড়েছে। নিয়তির ইচ্ছের বিরুদ্ধে তিনি তোমাকে যার সঙ্গে বিয়ের বাঁধনে বেঁধে দিয়েছিলেন, সে নিজেই সে বাঁধন ছিঁড়ে দিয়েছে। এখন ত আর তুমি তার নও! এখন তুমি তোমার নিজের। ইচ্ছে ক'রলেই তুমি অতুল সুখের অধিকারিণী হ'তে পার। তা না ক'রে কেন মিছে দুঃখ বুকে ক'রে অনাথার মত প'ড়ে থাক?

কমলা অতিশয় ঘৃণা ও অবজ্ঞা সহকারে দৃঢ়স্বরে বলিল "হরদাদা! ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দাদা বলি, সেই মতই মান্যও করি, তুমি আজ নিজে সে মান নষ্ট ক'রলে। স্বামী আর স্ত্রীর যে সম্বন্ধ মরণেও শেষ হবার নয়, দুদিনের জন্যে দূরে দূরে থেকেই যে তা ফুরিয়ে গেছে, একথা ব'ল্‌তে পারে হিঁদুর ঘরে এমন কুলাঙ্গার জন্মায় না। যে তোমাকে 'দাদা' ব'লে ডাক্‌ছে তারই মুখের ওপরে এই সব কথা ব'ল্‌তে কি তোমার একটু লজ্জাও হয় না! ধিক্ তোমার মনুষ্যত্বে! তোমার পরকালও নেই আর ইহকালও নেই!"

হরকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "লজ্জাসরম, ধর্ম্মভয়, মনুষ্যত্ব, একদিন আমার সবই ছিল, কমলা! অনেক দিন হ'ল, সে সব তোমার রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে উড়ে গেছে। আমার অন্তরের জ্বালা তুমি কি ক'রে বুঝ্‌বে? তুমি ত পুরুষ নও!—তুমি ত কখন কোন ভুবনমোহিনী সুন্দরীকে ভালবাস নি!—কি রকম ভালবাসা?—প্রাণ, মন, যশ, মান, দেহ, আত্মা, ইহকাল, পরকাল, সব দিয়ে ভালবাসা! আর তার বিনিময়ে কি পাওয়া?—ঘৃণা —শুধু ঘৃণা আর উপেক্ষা! এ মর্ম্মদাহ তুমি কি ক'রে বুঝ্‌বে? বুক চিরে দেখাবার হ'লে দেখাতাম, তার ভেতরটা ভেঙ্গে চুরে কি হ'য়ে গেছে!—হাড়গুলো অবধি বোধ হয় দিনরাত জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হ'য়ে

গেছে, কমলা! বিধাতা তোমার মূর্ত্তিটিকে ফুলের মত এমন সুন্দর, এমন সুকুমার ক'রে, হৃদয়টিকে তোমার এমন নির্ম্মম, পাষাণের মত কঠিন ক'রে দিয়েছেন কেন জানি না! ঘৃণাভরে একজনের মর্ম্মকে দলিত ক'রে, আত্মগরিমা নিয়ে নিজের মহত্ত্ব-শিখরে দাঁড়িয়ে থাকাই কি পুণ্য, কমলা? পুণ্যের এই কঠোর উচ্চশৈলে দাঁড়িয়ে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখ্‌তেছ, তোমার পদপ্রান্তে একটা হতভাগ্য, বিষাদ আর বেদনার দুর্ভর ভার বুকে বেঁধে, দুর্দ্দমনীয় বাসনার খরস্রোতে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে, নিরাশার অকূল, অগাধ পাথারে ভেসে চ'লেছে, তার দিকে একটি-বার করুণার চক্ষে চেয়ে দেখ্‌বে না?"

হরকুমারের কথায় কমলার কাণ ছিল না। সে মুক্তবাতায়নের পার্শ্বে পাষাণ-প্রতিমার মত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, স্থিরনেত্রে প্রকৃতির জ্যোৎস্না-ধবলিত সুপ্ত সুষমার প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছিল, আরও কতক্ষণ তাহাকে এই ভাবে দাঁড়াইয়া এই পাপিষ্ঠের পাপাখ্যান শুনিতে হইবে, আর যে ডুবিয়া যাইতেছে সে যেমন কূল পাইবার জন্য হিংস্র পশুকেও অবলম্বন করিতে চাহে, সে তেমনি ভাবিতেছিল, বামাসুন্দরী কতক্ষণে ফিরিবেন?

কমলার দৃষ্টিতে অনুমাত্র সহানুভূতির লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া এবং তাহার সেই উপেক্ষায় অতিমাত্র ব্যথিত ও উত্তেজিত হইয়া হরকুমার গম্ভীরস্বরে বলিল, "অযাচিত প্রীতির এই পূজা পায়ে ঠেলে, অপমান আর উৎপীড়নকে আলিঙ্গন ক'রতে চেও না, কমলা! যে এতদিন ধ'রে এত উপেক্ষা ও অপমান সহ্য ক'রে এসেছে, অহরহঃ পরস্ত্রীর চিন্তায় জীবনকে বিষময় ক'রেছে, মরণকে ভয়াবহ ক'রেছে, মনে ক'রো না সে তোমার এই ঘৃণা, উপেক্ষা আর প্রত্যাখ্যান মাথা পেতে

নিয়ে দীন ভিখারীর মত নতশিরে ফিরে যাবে! এখনও দীনভাবে যা ভিক্ষে ক'রছি, না পেয়েই নিরস্ত হব না; দস্যুর মত তা কেড়েও নেব। তোমার বাপই ত আমার জীবনের স্রোতকে পাপের পথে ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন; আমিও তোমাকে যেমন ক'রেই পারি পুণ্যের পথ থেকে আমার পথে টেনে নামিয়ে আন্‌ব।"

কমলা চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, হরকুমারের ভ্রুকুটিকুটিল নয়নদ্বয় অন্ধকারগর্ভ কক্ষের গবাক্ষপথের ন্যায় অন্তরস্থ একটা ভীষণ তমোভাব পরিব্যক্ত করিতেছে এবং দারুণ দুরভিসন্ধির একটা ছায়া প্রতিভাত হইয়া তাহার আস্যভাবকে যেন নিবিড়নীরদাচ্ছন্ন সান্ধ্যগগনের মত ঘোরতর করিয়া তুলিয়াছে! সে বুঝিল, তাহার বিপদ নিতান্ত তুচ্ছ নহে; এ বিপদ হইতে কে তাহার পরিত্রাণ করিবে?—বাহিরে চাহিয়া দেখিল, প্রকৃতি নীরব, মহানগরী ঘুমঘোরে অচেতন! ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, নীল আকাশ স্তব্ধ, তারামালা চাহিয়া আছে, কিন্তু সে চাহনিতে সহানুভূতি নাই! চেতনের দুঃখে জড়প্রকৃতির সহানুভূতি কোথায়?—চন্দ্রও হাসিতেছে! উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

আরও দূরে চাহিয়া কমলা দেখিতে পাইল, জ্যোৎস্নাধবলিত সৌধ-রাজির মধ্যে একটা দেবমন্দির উচ্চ চূড়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া যেন নিদ্রিত নগরের প্রহরীর মত জাগিয়া রহিয়াছে! তাহার অবসন্ন হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হইল।

কমলা হরকুমারের কথার উত্তরে দৃঢ়স্বরে বলিল, "ভগবানের এ ধর্ম্মরাজ্যে পাপ কখন পুণ্যকে জয় ক'রতে পারে নি, হরদাদা!—কখন পারবেও না! মনে ক'রো না, তুমি পুরুষ ব'লে তোমারই বল

আছে, আর আমি অবলা ব'লে আমার একটুও বল নেই। তোমার সাধ্যি কি যে আমার প্রাণ থাক্‌তে তুমি আমাকে ধর্ম্মপথ থেকে এক তিল সরাতে পার?—"

হরকুমার গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি জান, এ বাড়ী আমার?—তোমার এখানে কেউ নেই!—চীৎকার ক'রে গলা চিরে গেলেও তোমার সাহায্যে কেউ অগ্রসর হবে না, কমলা!"

কমলাও সদর্পে উত্তর করিল,—"আমার এখানে কেউ নেই?—দূরে ঐ মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে কার?—আকাশে ঐ নিমেষহারা শত শত উজ্জ্বল আঁখিতারা কার?—ভগবান্ আছেন, হরদাদা! তিনিই অসহায়ের সহায়, অবলার বল, র'ক্ষে ক'রতে যাকে কেউ নেই তার রক্ষক।"

হরকুমার পিশাচের মত অট্টহাস্য করিয়া "আচ্ছা, তবে ভগবান্ এসে তোমাকে রক্ষা করুক্!"—এই কথা বলিয়া কমলার অভিমুখে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল।

কমলা সরলভাবে দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে বলিল,— "হরদাদা!"

হরকুমারের উত্থিত চরণের গতি রুদ্ধ হইল। সে স্তব্ধ হইয়া কমলার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশঙ্কা, ক্রোধ, উদ্বেগ ও উত্তেজনায় কমলার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি যেন কি একটা দৈবী জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রোধাশ্রুগর্ভ উজ্জ্বল নয়নদ্বয় হইতে যেন বহ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। পীবর বক্ষঃস্থল শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সৌন্দর্য্যরাশি যেন তাহাতে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হরকুমার পূর্ব্বে যদি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া থাকে তবে এখন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে দুষ্ট উন্মত্তবৎ—'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ'—

যেমন পুনর্ব্বার কমলার অভিমুখে ধাবিত হইবে অমনি নিজ অসম্বৃত বসনে জড়িত হইয়া কক্ষতলে পতিত হইল। কমলা সেই অবসরে পলাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে না করিতেই হরকুমার উত্থিত হইয়া তাহার অঞ্চল ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিল।

রমণীর প্রেম যেমন অগাধ, করুণা যেমন স্নিগ্ধ, তাহার ক্রোধও তেমনি ভীষণ এবং প্রবল। যখন শান্তা, তখন কুসুমমালা; কিন্তু রুষ্টা, কাল-ভুজগী। তাহার যে নয়ন হইতে অমৃতধারা নিস্যন্দিত হইয়া থাকে তাহা হইতেই বিষ-বহ্নিও নির্গত হয়। তাহার যে মৃণালকোমল বাহুলতা মৃদুমলয়ানিলকম্পিত, পুষ্পিত বাসন্তীলতার মত ভাঙ্গ ভাঙ্গ বলিয়া মনে হয়, তাহাতেই অবস্থা বিশেষে মত্তকরিকরের বল উপচিত হইয়া থাকে, সেই কুসুমপেলব দেহে দানবী শক্তির আবির্ভাব হয়। হরকুমার কর্ত্তৃক অঞ্চলে আকৃষ্ট হইয়া কমলা দলিতপুচ্ছ কালনাগিনীর ন্যায় ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং মুক্তাবলী সদৃশ দশনাবলীতে নিজ বিম্বাধর দংশন করিয়া সক্রোধে আঁচলটা ছিনিয়া লইয়াই দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া দুই হস্তে হরকুমারের বক্ষোদেশে একটা ধাক্কা দিল। হরকুমার সে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত ছিল না; সে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় কক্ষতলে গিয়া পতিত হইল।

কমলা ত্বরিতপদে বাহিরে আসিয়া ক্ষিপ্রকরে কপাটে শিকল লাগাইয়া দিল এবং মুহূর্ত্তমাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া নামিয়া আসিল। বাহিরের দরজার কুলুপ যে স্থানে থাকে তাহা সে জানিত; কম্পিতহস্তে তাহা লইয়া আশু অনুসরণের পথ রুদ্ধ করিয়া পথে আসিয়া পড়িল।
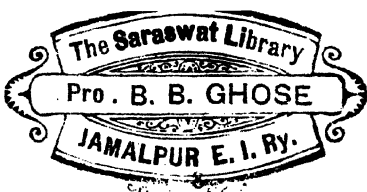
কমলা পথে পড়িয়াই স্পন্দিতহৃদয়ে কম্পিতপদে যত দ্রুত পারিল চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে মধ্যে মধ্যে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতেছিল। প্রতিপলে তাহার মনে হইতেছিল, হরকুমার তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে। আপনার পদশব্দেই সে চমকিত হইতেছিল। পথপার্শ্বস্থিত আলোকগুলা পশ্চাতে পড়িলেই নিজের ছায়াটাও দীর্ঘতর হইয়া সম্মুখে পড়িয়া, যেন পশ্চাদনুসারী কাহারও ছায়া বলিয়া ভ্রমোৎপাদনের সঙ্গে তাহার ভয়োৎপাদন করিতেছিল। পশ্চাতে চাহিতেও সকল সময়ে তাহার সাহস হইতেছিল না।

সম্মুখে যে পথ পাইল কমলা তাহাতেই চলিতে লাগিল। কোন্ পথ কোন্ দিকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার বিচার নাই—তাহাতে যেন তাহার প্রয়োজনই ছিল না। বামাসুন্দরীর সেই পাপগৃহ হইতে সে দূরে গিয়া পড়িতে চাহে। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া যায়; কিন্তু দেখিতে পাইয়া পাছে কেহ কোন সন্দেহ করে, কিছু জিজ্ঞাসা করে, সেই ভয়েই কেবল তাহা পারিতেছিল না। তথাপি মোড় ফিরিবার সময়ে অগ্রপশ্চাৎ চাহিয়া দুই চারি পা ছুটিয়াও লইতেছিল। অনেকক্ষণ চলিয়া, অনেক দূর আসিয়া যখন পশ্চাতে তেমন কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন সে বুকটাকে একবার দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। গন্তব্যের ঠিকানা নাই, পৃথিবীর যে অতি দীন, তাহার যাহা আছে তাহাও নাই—আশা নাই, জীবনের উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, তথাপি দুষ্টের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির বাহিরে আসিয়া উদার আকাশতলে মুক্ত বায়ুতে পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে

হইতে লাগিল, যেন সে বহুদিনের পর কারামুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। পথে লোকের গতিবিধি নিতান্ত বিরল। ক্বচিৎ কোন আলোকস্তম্ভের পার্শ্বে কোন নিদ্রাতুর প্রহরী পথের উপরে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া ছিল। সুপ্ত নগরের ঘুমঘোরের মধ্যে ক্বচিৎ ক্বচিৎ জাগরণের শব্দও শ্রুত হইতেছিল। মাঝে মাঝে দুই একটা লোক এদিকে ওদিকে গমনাগমনও করিতেছিল। তাহাদের দেখিয়া কমলার ভয় হইতেছিল না। হরকুমার ও বামাসুন্দরী ভিন্ন বিশ্বের আর তৃতীয় প্রাণীর নিকটে যেন তাহার কোন ভয় ছিল না।

বহুদূর চলিয়া আসিয়া কমলা দেখিতে পাইল, অদূরে জাহ্নবীর পুণ্য প্রবাহ জ্যোৎস্না মাখিয়া দ্রবরজতপ্রবাহের ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে! তীরে অসংখ্য সৌধরাজি, দেবমন্দির ও মস্‌জিদ্ উচ্চ চূড়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া নীরবে অবস্থান করিতেছে! একটা ঘাটের উপরসোপানে দাঁড়াইয়া সে দেখিল, প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই; ভাবিল, "একটু পরেই এই ঘাটে কত লোক স্নান করিতে আসিবে; তাহাদের মধ্যে এমন কি কেহ থাকিতে পারে না যে একটু নিরাপদ আশ্রয় দান করিতে পারে? সুখের আশা নাই, শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায় কোথাও থাকিয়া জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া দেওয়া!—বিশ্বেশ্বরের এই পুণ্যক্ষেত্রে তেমন একটু স্থান কোথাও মিলিবে না?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া কমলা সোপানাবলী অবতরণ করিল এবং হস্তপদাদি ধৌত করিয়া দুই তিন অঞ্জলি জল পান করিল। উঠিয়া যাইবার সময়ে তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীটা বড় দুলিতেছে ও টলিতেছে, দিক্‌সকল তাহার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতেছে, আকাশের নক্ষত্রগুলা

যেন আতসবাজীপ্রসূত বহ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বেগে দিঙ্‌মুখ হইতে ছুটিয়া আসিয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল এবং উর্দ্ধসোপানে মস্তক স্থাপিত করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিল।

কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব্বগগন ঊষার অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সুপ্তোত্থিত ভক্তবৃন্দের 'শিব' 'শিব' রবে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। কত জন গঙ্গায় স্নান করিতে বাহির হইল। কত জন স্নান করিয়া ফিরিতে লাগিল। জনৈক যুবা ঊষাভ্রমণ করিতে করিতে একটা ঘাটের উর্দ্ধসোপানে দাঁড়াইয়া দেখিল, অনিন্দ্যসুন্দরী এক যুবতী যদৃচ্ছাক্রমে পাষাণসোপানে শয়ান রহিয়াছে! আসন্ন প্রভাতের ম্লান জ্যোৎস্না তাহার রূপের প্রভায় যেন ম্লানতর প্রতিভাত হইতেছে! যুবতীর অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই; পরিধেয় জীর্ণ ও মলিন, অবেণীসম্বদ্ধ কেশপাশ সোপানের উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে। একখানি বাহু তাহার উপাধান হইয়াছে, আর একখানি বিপুল নিতম্বের উপরে অলসভাবে বিলম্বিত রহিয়াছে! মূর্ত্তিটি যেন উৎকীর্ণ,—যেন কোন নিপুণ শিল্পী কোমলতাগুণে লাবণ্য মিশাইয়া শুধু সৌন্দর্য্যের উপাদানে তাহার নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে!—যেন সদ্যোবিকশিত মল্লিকার স্থূলহার গঙ্গার প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া সোপানতটে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে! কেবল বক্ষঃস্থলের শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত মৃদু উত্থান ও পতনে জীবনলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

ঊষার শীকরবাহী শীতল সমীরণ মৃদুমন্দ বহিয়া কমলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইয়া দিল। যে নগর বহুদিন পূর্ব্বে জনশূন্য হইয়া, মনুষ্যবসতির ভগ্নাবশেষ মাত্র বুকে করিয়া, অরণ্যানীপরিবৃত হইয়া পড়িয়া আছে, নিদ্রিতাবস্থায় কেহ যদি তাহার মধ্যে নীত হইয়া পরিত্যক্ত হয়, সে জাগিয়া যে ভাবে চারিদিকে

চাহিয়া দেখে, কমলাও ঠিক সেইভাবে নিজের চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

রাত্রির ছায়া তখনও সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হয় নাই। কমলার মূর্চ্ছার ঘোরও তখনও সম্পূর্ণভাবে অপগত হয় নাই। সে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, সে কে, কোথায়, কেন সেখানে আসিয়াছে, কে তাহাকে সেখানে আনিয়াছে! সহসা দেখিতে পাইল, তাহার শিওরে একজন যুবা ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। গত রাত্রির কথা স্বপ্নের স্মৃতির মত তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। অমনি ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বসনাদি সংবীত করিতে করিতে সে তীব্রস্বরে বলিল, "কে? হরদা—"

তাহার মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে যুবা ঘৃণাপূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া অতিমাত্র রুক্ষ ও কঠোর স্বরে বলিল, "আরে কলঙ্কিনি!—বাপের পুণ্যনামে, শ্বশুরের অকলঙ্ককুলে কালী ঢেলে দিয়ে, দেশময় কলঙ্কের কথা ছড়িয়ে আবার তীর্থকেও কলুষিত ক'রতে এখানে এসেছিস্?"

কমলা বজ্রাহতার ন্যায় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া স্পন্দহীননেত্রে ক্ষণকাল যুবার দিকে চাহিয়া রহিল; তৎপরে যেন কি একটা অনির্ব্বচনীয় বেদনায় আকুল হইয়া রোদনগুঞ্জনের ন্যায় অস্ফুট ও কাতর স্বরে বলিল, "তু—মি—?" —আর তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

কমলার মনে হইল, জ্যোৎস্নাটা অকস্মাৎ যেন নিভিয়া গেল। আবার তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। তখনই আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া সে যুবার পদপ্রান্তে পতিত হইল। যুবা বিরাজমোহন।

কৃষ্ণনাথ পশ্চিম প্রদেশে চাকরী করিতেন। সম্প্রতি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া সপরিবারে দেশে ফিরিতেছিলেন। একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়াই তাঁহার পরিবার। পুত্র হেমন্তকুমারের বয়স্ আঠার বৎসর, কন্যা করুণাময়ী তাহার অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের ছোট। কাহারও বিবাহ হয় নাই।

কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কৃষ্ণনাথ কিছু তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিতেছিলেন, তথাপি পথে যতগুলি তীর্থস্থান ছিল তাহা দেখিতে দেখিতে— আসিতেছিলেন। দুই চারি দিন হইল তাঁহারা কাশীতে আসিয়াছেন।

নীরদা নামে এক জ্ঞাতিকন্যা তাঁহাদের পাচিকার কার্য্য করিয়া থাকে। নীরদা পতিপুত্রবিহীনা, সংসারে আপনার বলিতে আর তাহার কেহই ছিল না। সেও কৃষ্ণনাথের পরিবারভুক্ত হইয়া ছিল, এবং বেহারী নামে একজন ভৃত্য ছিল, তাহারও স্বতন্ত্র গৃহ ছিল না।

নীরদা প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া থাকে। কাশীতে আসিয়াও সে প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করিতে যায়। করুণাও প্রত্যহ তাহার সঙ্গে গমন করে। এই প্রাত্যহিক স্নানযাত্রায় বেহারী উভয়ের পথপ্রদর্শক, রক্ষক ও বস্ত্রবাহী। স্নান কখন দুইদিন এক ঘাটে হয় না; কোন দিন মণিকর্ণিকায়, কোন দিন কেদারে, কোন দিন দশাশ্বমেধে।

একদিন তাহারা স্নান করিতে আসিয়া দেখিল, ঘাটে অনেক লোক জমা হইয়াছে। ভিড়ের একপাশে একটু ফাঁক পাইয়া উঁকি দিয়া দেখিল, সেই বৃত্তাকার জনতার দৃষ্টি-কেন্দ্র একটি অসামান্যসুন্দরী যুবতী। তাহার পরিধেয় একখানি মোটা লালপেড়ে শাড়ী, খুব ময়লা, খুব জীর্ণ, আর স্থানে স্থানে সেলাই-করা ও তালি-দেওয়া।

অলঙ্কারের মধ্যে দক্ষিণহস্তে একখানি শাঁখা, বামহস্তে কেবল—মাত্র একখানি সূক্ষ্ম লৌহবলয়; আর ললাটের উর্দ্ধদেশে অবিন্যস্ত, আলুলায়িত রুক্ষকেশদামের মধ্যভাগে সূক্ষ্ম একটি সিন্দূরতিলক। তাহাতেই যেন সে কত অলঙ্কার পরিয়াছে! রূপ যেন তাহার অঙ্গে ধরিতেছে না, চারিদিকে উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে! সে নাতিলম্বিত অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে নিম্নে চাহিয়া নিশ্চলাঙ্গে বসিয়া আছে। তাহার সেই দীন দৃষ্টিতে যেন জীবনী শক্তি নাই! ম্লান মুখখানি দেখিয়া বোধ হয়, সম্প্রতি তাহার জীবনের উপর দিয়া যেন একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে।

যাহারা দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছে, তাহাদের মুখেও কোন কথা নাই; দৃষ্টিতে শুধু কৌতূহল, আর একটা মৌন জিজ্ঞাসা,—এ সুন্দরী কে? এখানে এমন ভাবে বসিয়া কেন? এ কি মানবী না দিবচ্যুতা কোন দেবী? তাহারা এমনিভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে যেন সত্যই সে এ পৃথিবীর জীব নহে, রাত্রির মধ্যে কোন গ্রহান্তর হইতে পৃথিবীতে নামিয়া পড়িয়াছে আর উঠিয়া যাইতে পারে নাই;—যেন গগনচ্যুত নাক্ষত্রিকশিলার মত কি একটা অপূর্ব্ব!

বেলার সঙ্গে জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নূতন যাহারা আসিতে লাগিল, তাহারা পূর্ব্বাগতদিগকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি হ'য়েছে গা!—মেয়েটি কে গা?—এমন আলো-করা রূপ নিয়ে, এমন ক'রে এখানে ব'সে আছে কেন গা?" তদুত্তরে কেহ কিছুই বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধা আসিয়া বলিলেন, "ওগো আমি এর বিত্তান্ত সব জানি; আমি যখন এসেছি ঘাটে তখন কেউ আসে নি, কেবল এই মেয়েটি প'ড়ে ছেল, আর একটি ভদ্দর বাবু উড়ুনি ভিজিয়ে

জল নিয়ে এর মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছেলেন। আমাকে দেখেই বাবুটি উঠে গেলেন। মেয়েটি কিন্তু সেই থেকে গালে হাত দিয়ে ঠিক এমনিভাবে ব'সে আছে! কত জিগ্‌গেসা ক'রলুম তা একটি কথাও কইলে না।”

বৃদ্ধার এবম্বিধ সমস্ত বৃত্তান্তে যদিও কাহারও কৌতূহল চরিতার্থ হইল না, কিন্তু জনতাটা সেইক্ষণ হইতেই পাতলা হইয়া পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধার বচনে অনেকেরই ধারণা হইল, যুবতী মহা পাপিষ্ঠা, কুলাঙ্গনা-কুলের কলঙ্ক, কাশী-বাসিনী পুণ্যশীলাগণের দর্শনেরও অযোগ্য। কেহ কেহ কৌতুকিনী সঙ্গিনীকে—'আয় না, লো! বেলা হচ্ছে; কাশীর কাণ্ড আর কি দেখ্‌বি?”-- বলিয়া টানিয়া লইয়া, স্নান করিতে নামিতে লাগিলেন।

করুণা একটি পাশে নীরদার হাতটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যে যখন কিছু বলিতেছিল, তাহার বড় বড় চোখের কালো কালো তারাদুটি স্থির হইয়া তাহারই মুখের দিকে ফিরিতেছিল; সকলেই যখন নীরব হইতেছিল, তাহার কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি ধূলিবিলুণ্ঠিতা রত্নমালার ন্যায় এই অপরিচিতা সুন্দরীর দীনসৌন্দর্য্যের উপরে পতিত হইতেছিল। বর্ষীয়সীগণের অযথা সমালোচনা শুনিয়া তাহার মনে মনে ভারী রাগও হইতেছিল। ভিড়টা একটু কমিয়া গেলেই সে নীরদাকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, “দিদি, তুমি নেয়ে নাও! আমি ওঁর কাছে গিয়ে একটু বসি।”

নীরদারও ইচ্ছাটা তাহাই করে, কিন্তু অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সে একটু দুঃখিতভাবে বলিল, “যাই এই;—তুইও ত নাইবি?”

করুণা। এখন নয়; তুমি যাও, আর দেরী ক'রো না!

নীরদা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে জলে গিয়া নামিল। করুণা তাহাকে স্নান করিতে পাঠাইয়া দিয়া, বেহারীকে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল; তৎপরে ধীরে ধীরে অপরিচিতার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া, তাহার মুখের খুব নিকটে নিজের মুখখানি আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে কি কেউ নেই?"

যুবতীর অলস দৃষ্টি একবার ভূমি ছাড়িয়া করুণার মুখের উপরে পড়িল।

করুণা তাহাতেই নিজের প্রশ্নের উত্তর পাইয়া বলিল, "আমাদের বাসাবাড়ী খুব কাছেই; এ বেলাটা সেইখানে থেকে তারপর যেথা যাবার গেলে হয় না?"

যুবতী এবার একটু বেশীক্ষণ ধরিয়া করুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময়ে বেহারী আসিয়া বলিল, "পাল্কী এসেছে, দিদিমণি!" নীরদাও গামছা নিঙ্গড়াইতে নিঙ্গড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। করুণা যে অপরিচিতাকে বাসায় লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, ইহাতে খুসী হইয়া নীরদা আর চুল মুছিল না, কাপড়ও ছাড়িল না, শুক্না কাপড় বগলে লইয়া, ভিজা কাপড় পরিয়াই পাল্কীর পিছনে পিছনে ছুটিল।

কমলা কৃষ্ণনাথের পরিবারের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কঠিন পাষাণ-সোপানে মূর্চ্ছাজন্য পতনে তাহার অঙ্গে যে ক্ষত ও বেদনা হইয়াছিল, তাহা সারিয়া গিয়াছে; কিন্তু বিরাজমোহনের কঠোর বাক্যে তাহার হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, সেটা দিনে দিনে বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে।

দিনে দিনে কমলার গণ্ডের সেই নলিন-রাগ কেতকীর গর্ভপত্রের ন্যায়

পাণ্ডুবর্ণে পরিণত হইল। চোখের কোলে কালিমা প্রকাশ পাইল। তাহার যে সুকুমার দেহখানি যেন অনস্থিরচিতবৎ প্রতীত হইত, তাহারও স্থানে স্থানে অস্থি জাগিতে লাগিল। বসিলে সে আর সহসা উঠিতে পারে না, একবার সিঁড়িতে উঠিলেই হাঁপাইতে থাকে, যে কাজ করিতে বসে, বহুক্ষণ তাহা লইয়াই বসিয়া থাকে, যে দিকে চাহে, অনেকক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া থাকে, সব কথা একবারে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, যেন কেমন একতর হইয়া পড়িল।

কমলার স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণে ভয় পাইয়া নীরদা কৃষ্ণনাথকে তাহা বলিল। করুণা মুখটি শুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে ডাক্তার আনিবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি বিষণ্ণমুখে একটু হাসিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া হেমন্তকে ডাক্তার ডাকিতে বলিলেন।

ডাক্তার আসিয়া দীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধসেবনে কমলার প্রবৃত্তি নাই; তবে না খাইলে করুণা কাঁদে, কৃষ্ণনাথ ও হেমন্তের মুখ বিষণ্ণ হয়, নীরদা বকে, সুতরাং ঔষধ খাইতে হয়। কিন্তু তাহাতে কোন উপকার নাই। হৃদয়ের ব্যাধি কাহার কবে ঔষধে উপশান্ত হইয়াছে?

করুণা একদিন কাঁদ কাঁদ হইয়া কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি এমন হ'য়ে যাচ্ছ, দিদি? তোমার কি কষ্ট হ'চ্ছে ব'ল্‌বে না?"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার কোন কষ্ট নেই, বোন, আমি বেশ আছি; শুধু তোরা সবাই আমার জন্যে এতটা উতলা হ'স্‌ নি!"

নীরদা একদিন কথায় কথায় বলিল, "ছিঃ! তার প্রাণ কিন্তু বড় কঠিন, বোন!"

কমলা ধীরে ধীরে বলিল, "অমন কথা ব'লো না, দিদি! তাঁর মত প্রাণ ক'জনের আছে? আমিই মন্দভাগিনী।"—এই কথা বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

কৃষ্ণনাথ দেশে ফিরিবার নাম করেন না; তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্পিত দিন বাড়াইয়া দিয়া গোপনে গোপনে কমলার স্বামীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

হেমন্ত সকাল সন্ধ্যা দুই বেলাই ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। একদিন সে একটা ঘাটের একজন পাণ্ডা আর একব্যক্তির নিম্নোক্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইল।

"বয়েস্ কত?"

"একুশ বাইশ বছর হবে।"

"দিনে এমন কত শত সুন্দরী আস্ছে যাচ্ছে; আপনি কাকে খুঁজ্ছেন তা কি ক'রে বুঝ্‌ব?"

"একটু লক্ষ্য রাখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে। সুন্দরী অনেক আসে বটে, তেমন বেশী আসে না;—দেবতার মত সুন্দরী, সৌন্দর্য্যে গর্ব্ব নেই, মুখে হাসি দেখ্‌তে পাবে না, কথা শুন্‌তে পাবে না, গায়ে গয়না থাক্‌বে না, চাউনি মাটীর দিকে। সঙ্গিনীদের কথাবার্ত্তায় যদি শুন্‌তে পাও, তাঁর নাম 'কমলা,' তবে একটু সন্ধান রেখ। তাঁর ঠিকানা যদি জেনে দিতে পার, তা হ'লে আর তোমাকে পেটের ভাতের জন্যে এমন ক'রে ঘাটে ব'সে থাক্‌তে হবে না।"

হেমন্ত বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াই কৃষ্ণনাথকে সেই সব কথা বলিল। তিনি সব শুনিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁর নাম ধাম জান্‌তে চাইলে না?"

হেমন্ত। আমার মনে হ'ল, সে আমাদের নতুন দিদিকেই খুঁজ্‌তেছে ; কিছু জিগ্‌গেসা ক'রলে পাছে সন্দেহ করে যে, তিনি আমাদের বাড়ীতেই আছেন ?

কৃষ্ণনাথ গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই ভয়ে ?—বয়েস্ হচ্ছে, আর মানুষ হবে কবে ?—লোকটা কি রকমের ? বয়েস্ কত আন্দাজ হবে বল দেখি !"

হেমন্ত। বয়েস্ বেশী হবে না ;—তবে খুব লম্বা-চওড়া মস্ত একটা মদ্দ। সে একটা অদ্ভুত লোক, বাবা !—চেহারাটা বেশ, কিন্তু সন্ন্যেসীর মত গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া চাদর, গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, হাতে পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লিও কিছু নেই ;—মাথার চুলগুলো রুক্ষু আর খোঁচা খোঁচা, চাউনিটা যেন কেমন একতর !—কখনো মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে, আবার কখনো বা কট্‌মট্ ক'রে তাকায় !

কৃষ্ণনাথ একটু ভাবিয়া, "যে পাণ্ডার সঙ্গে তিনি কথা ক'য়েছিলেন, তাকে চিনিয়ে দেবে চল দেখি" বলিয়া তখনই হেমন্তকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। তখনই যদিও তিনি হেমন্তকথিত সেই 'অদ্ভুত লোক'টাকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পাণ্ডার মুখে শুনিয়া বুঝিলেন যে, তাহার দেখা পাওয়া দুষ্কর নহে,—সে প্রত্যহই সেইরূপে ঘাটে ঘাটে বেড়াইয়া থাকে। তিনিও তাহাকে ধরিবার জন্য প্রত্যহ ঘাটে ঘাটে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

দুই তিন দিন পরেই একদিন কৃষ্ণনাথ একটা ঘাটের উপরে সেই রকমের একটা লোককে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। তাহার বেশ সন্ন্যাসীর মতই বটে, কিন্তু যে সকল সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি আমরা সাধারণতঃ

দেখিতে পাই, তাহাতে তেমন কিছুই নাই। তাহার মস্তকে দীর্ঘ জটা নাই, কপালে সিন্দূরের ঘটাও নাই, চাহনিতে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ছায়া নাই, হস্তে ভিক্ষাপাত্রও নাই। চেহারা প্রকৃতই সুন্দর, দীর্ঘ নয়নের দৃষ্টি উজ্জ্বল, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, বক্ষঃস্থল বিশাল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ। অদ্ভুতের মধ্যে এই যে, যে সকল স্ত্রীলোক স্নান করিতে আসিতেছে বা স্নান করিয়া ফিরিতেছে, সে তাহাদের দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

কৃষ্ণনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেন। সে তাহা লক্ষ্যই করিল না; যেদিকে চাহিয়া যেভাবে বসিয়া ছিল, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণনাথ বলিলেন, "এই দিক্‌টায় একবার ফিরে চাই-বেন?"

উদাসীন চকিতে একবার ফিরিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে মহাশয়?"

কৃষ্ণনাথ। আমিও আপনাকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছি।

উদাসীন। জিজ্ঞাসাটা কিন্তু আমিই আগে ক'রেছি।

"তবে আমিই আগে উত্তর করি" বলিয়া একটু হাসিয়া কৃষ্ণনাথ সংক্ষেপে নিজের পরিচয় প্রকাশ করিলেন।

আকৃতিবিশেষের এমন একটা বিশেষত্ব থাকে যে, দর্শনমাত্রেই দর্শকের হৃদয়ে একটা অকারণ বিদ্বেষ অথবা অনুরাগের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণনাথকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া উদাসীন আর অধিকক্ষণ তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকিতে পারিল না; ফিরিয়া বসিয়া আলাপে প্রবৃত্ত

হইয়া বলিল, "আপনার কাছেই অমন ঘাসের আসন পাতা থাক্‌তে ধূলোটার ওপরে ব'সেছেন কেন ?"

কৃষ্ণনাথ পুনর্ব্বার একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যে আমার আগেই তা ক'রেছেন, অগত্যা আমাকেও তাই ক'রতে হ'য়েছে; আসনটা সমান না হ'লে যেন আলাপে বেশ তৃপ্তি হয় না।—সে যা হ'ক, আপনি এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হ'য়েছেন কেন শুনতে পাই না ?"

উদাসীন। বয়েসের হিসেব ক'রে কি কেউ সন্নোসী হয় ?—আমার এটা বিড়ালব্রত। সন্নোসী হ'লে স্ত্রীলোকদের দিকে চেয়ে ব'সে থাক্‌ব কেন ? তবে কাপড়টা যে গেরুয়া প'রেছি, কি জুতোটা পায়ে দিই নি, তার কারণ আছে ;—এ কাপড়ে ধূলোয় ব'স্‌তে মন খুঁৎখুঁৎ করে না, জুতোটা বাইরে রেখে দেবতার স্থানে গিয়ে জুতো হারাবার ভয়েও বিব্রত হ'তে হয় না।

কৃষ্ণনাথ। আমি শুনেছি, আপনি এই ছদ্মবেশে কোনও স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করেন,—সত্য কি ?

উদাসীন। ঠিকই শুনেছেন।

কৃষ্ণ। আমিও ছদ্মবেশ না ধ'রেই একজন পুরুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

উদাসীন একটু হাসিয়া বলিল, "তাহ'লে আপনি বৈদিক, আর আমি তান্ত্রিক—"

কৃষ্ণ। আপনার পরিচয়টা শুনতে পেলেই এখন বুঝতে পারি, পথ ভিন্ন হ'লেও আমাদের উদ্দেশ্যটা একই কি না ;—আপনার নামটি কি বলুন দেখি !

উদাসীন। সুধাংশুভূষণ।

কৃষ্ণনাথের মুখটা যেন একটু অপ্রসন্ন হইল ; তিনি নতমস্তকে একটু

চিন্তা করিয়া বলিলেন, “ঠিক্ ব’ল্‌ছেন?—আপনার নাম যা বল্‌লেন তাই?”

সুধাংশু। বেঠিক্ ব’লে লাভটা কি?—কিছু না ব’ল্‌লেই বা আপনি কি ক’রছেন?

কৃষ্ণ। আপনার নিবাস?

“এই রকম একটি একটি ক’রে আপনি কতবার কতকথা জিগ্‌গেসা ক’রবেন, আমিই সব বল্‌ছি” বলিয়া সুধাংশু অকপটে নিজের সমস্ত পরিচয় ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলিল, “তার পর—সেই পত্র পেয়ে, বাড়ী ফিরে গিয়ে, সেই পাপ বামুণটাকে ধ’রে নিয়ে এখানে এলুম; এসে দেখি, তাঁরা যে বাড়ীতে থাক্‌তেন, সে বাড়ী বন্ধ। অনুসন্ধানে জানা গেল, তাঁরা সে বাড়ী থেকে উঠে গেছেন। সেই থেকে আমি এইখানেই তাঁর সন্ধান ক’রে বেড়াচ্ছি। পুণ্যধর্ম্মে তাঁর বড় অনুরাগ ব’লে গঙ্গার ঘাটে আর দেবতার মন্দিরেই আমি তাঁর বেশী খোঁজ করি। সকাল থেকে যতক্ষণ স্নানের সময় অতীত না হয়, এইরকম ক’রে এক একদিন এক একটা ঘাটে ব’সে থাকি,—কখন হয় ত তিন চারিদিন এক ঘাটেই ব’সে থাকি, তার পরে বাসায় গিয়ে, যা হয় ভাতেভাত দুটি রেঁধে খেয়েই আবার বেরুই। তখন আর ঘাটে ঘাটে নয়, পথে পথে;—পথের ধারে যতগুলি বাড়ীর দোর খোলা পাই, উঁকি দিয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা করি, যদি লোক দেখ্‌তে পাই, জিগ্‌গেসা ক’রে জান্‌তে চেষ্টা করি। সন্ধ্যের সময় বিশ্বেশ্বরের আরতিশেষ পর্য্যন্ত মন্দিরের পথে দাঁড়িয়ে থাকি, সেই পথে যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁদের দেখি, দেখ্‌বার সুবিধে না হ’লেও কথা শুন্‌তে চেষ্টা করি। এই রকম ক’রে কাশীর অনেকটা খোঁজা হ’য়েছে, বাকীটাও খুঁজে দেখ্‌ব। কাশীতে যদি

থাকেন, তবে নিশ্চয়ই সন্ধান পাব; না পাই, অন্যত্র খুঁজ্‌তে বেরুব।"

কৃষ্ণনাথ বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে সুধাংশুর অধ্যবসায়ের পরিচয় শুনিতেছিলেন; তাহার কথা শেষ হইলে প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "বৎস, তুমি তোমার ভ্রাতৃজায়ার অন্বেষণ ক'রতেছ, আর আমি তোমার ভ্রাতার সন্ধানে বেড়াচ্ছি। তোমার চেষ্টা সফল হ'য়েছে, তোমার ভ্রাতৃজায়া আমারই আশ্রয়ে আছেন।"—এই বলিয়া তিনি কমলার অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস নীরদার মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন এবং কমলা যে প্রকারে তাঁহার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিলেন।

সুধাংশু সমস্ত শুনিয়া স্তব্ধভাবে একটু বসিয়া থাকিয়া সহসাই দাঁড়াইয়া উঠিল। কৃষ্ণনাথ দেখিলেন, তাহার খোঁচা খোঁচা চুলগুলি একবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, বড় বড় চোখদুটি লাল হইয়া উঠিয়াছে, বিশাল বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্ফীত হইতেছে!

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সুধাংশু বলিল, "আপনার এ উপকারের ঋণ আমরা জীবনে কখনও শোধ ক'রতে পা'রব না;—আপনি এখন বাসায় যান! আমার প্রণাম দিয়ে তাঁকে ব'ল্‌বেন যে, দুচার দিনের মধ্যেই আমি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব।"

এই কথা বলিয়াই কৃষ্ণনাথকে নমস্কার জানাইয়া সুধাংশু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তাহাকে ফিরাইয়া তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে এখনই তুমি কোথায় যেতে চাও?"

সুধাংশু। আমার নিজের একটু কাজ আছে;—তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলে আর তা সারা হ'বে না।

কৃষ্ণনাথ। বুঝেছি, তুমি কি কাজে কোথায় যেতে চাও;

তার দরকার নেই, বৎস! পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনার পথ খুঁজে নেবে, তোমাকে কিছুই ক'রতে হবে না।—এখন আমার সঙ্গে এস। তোমাদের কা'রও দেখা না পেয়ে, মা আমার যেন দিন দিন ম্লান হ'য়ে প'ড়ছেন।

কৃষ্ণনাথ সুধাংশুকে সঙ্গে লইয়া বাসায় চলিলেন এবং কমলা উপরের যে ঘরে থাকিত একবারে সেই ঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "নূতনমা কোথা গা!—বেরিয়ে এসে একবার দেখ দেখি!"

কমলা অসঙ্কোচে বাহিরে আসিতেছিল, কৃষ্ণনাথের সঙ্গে আর একজনকে রহিয়াছে দেখিতে পাইয়াই সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া দরজাটি ঠেসিয়া নতমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণনাথ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "এই সন্ন্যেসীটিকে চিন্‌তে পার কি? দেখ দেখি!"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সুধাংশু অগ্রসর হইয়া কমলাকে প্রণাম করিল; প্রণামান্তে উঠিয়া দেখিল, কমলা অঞ্চলে নয়ন অবরুদ্ধ করিয়াছে। সুধাংশুকেও গৈরিকউত্তরীয়ে মুখ আবৃত করিতে দেখিয়া, কৃষ্ণনাথ চক্ষুভরা অশ্রু লইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

রন্ধনাদির কার্য্য চুকিয়া গিয়াছিল; তথাপি হেমন্ত আবার বেহারীকে সঙ্গে লইয়া বাজারে বাহির হইল। নীরদাও নিবন্ত উনুনে কয়লা চাপাইয়া শিল পাতিয়া মসলা পিষিতে বসিল।

গৃহস্থকে বেশ একটু বিব্রত দেখিয়া সুধাংশু কিছু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল; হেমন্ত ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে একটু আড়ালে

ডাকিয়া বলিল, "ওহে ভায়া! এত ধুম-ধাম প'ড়ে গেছে কিসের বল দেখি?"

হেমন্ত। কৈ!—ধুম-ধাম কিছুই ত নয়!

সুধাংশু। নয় কেন, বেশই ত দেখ্‌ছি; একটা কথা তোমাকে ব'লে রাখি,—আমার জন্যে ছুটি আলোচাল, আর ভাতে দেবার মত যা হয় কিছু,—আলুই হ'ক, আর কাঁচ্‌কলাই হ'ক্‌,—বুঝেছ ত?

হেমন্ত একটু বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি হবিষ্যি ক'রবেন?"

সুধাংশু। হবিষ্যি ঠিক্‌ নয়,—এই নিরামিষ আর কি।

হেমন্ত। বাবাও তাই করেন। নীর-দিদির আর তাঁর রান্না এক হেঁসেলেই হয়।—সেই সঙ্গে হ'লে হবে না?

সুধাংশু। ওঃ—খুব খুব! তবে আর কিছুই ক'রতে হবে না।

অল্পক্ষণ পরেই হেমন্ত আসিয়া জল খাইবার জন্য সুধাংশুকে বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুধাংশু গিয়া দেখিল, বেশ দামী এক-খানা মিরজাপুরী কার্পেট্‌-আসনের সম্মুখে খুব বড় একথালা ভাল জল-খাবার—নানাবিধ ফলমূল, সন্দেশ ও ক্ষীরের জিনিস সাজান রহিয়াছে। একটু দূরে কমলা বসিয়া তাহার অপেক্ষা করিতেছে।

সুধাংশু জল খাইতে বসিলে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, ঠাকুরপো!—বেড়াবার সুবিধে হয় ব'লে না হয় গেরুয়াই প'রেছ, আবার এসব কেন?—মাছ খাবে না, হবিষ্যি ক'রবে ব'লেছ না কি?"

দ্বারদেশে মুখটি শুকাইয়া হেমন্ত দাঁড়াইয়া ছিল। সুধাংশু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ, ভায়া! এরই মধ্যে নালিশ রুজু ক'রেছ?"—তারপর কমলার দিকে চাহিয়া বলিল, "পুণ্যি-ধর্ম্মের জন্যে নয়, বউদিদি!—পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হ'লে হবিষ্যিটাই সহজে হয়। আজ

আমাকে হেমন্ত কালিয়ে-কাবাব্ খাওয়াবে, কাল আবার এই মুখে ভাতে-ভাত ভাল লাগ্‌বে কেন?—তা আজ মাছ-টাছ খাব এখন।"

হেমন্ত তখনই প্রফুল্লমুখে নামিয়া গেল, এবং রান্নাঘরে নীরদার কাছে গিয়া, রান্নাটা যাহাতে খুব ভাল হয় সেই বিষয়ে ব্যস্ত রহিল।

করুণা এক ডিপে পাণ আনিয়া, কমলার হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল; কমলা তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া, দুই হাতে তাহার লজ্জানম্র মুখখানিকে ফিরাইয়া ধরিয়া সুধাংশুকে বলিল, "ঠাকুরপো!—অনেক দেশ ত ঘুরেছ, এমন সুন্দর মুখ কোথাও দেখেছ?"

সুধাংশু জলখাবারের থালাখানিকে খালি করিবার জন্য বেশ একটু ব্যস্ত ছিল, কমলার কথায় একবার মুখ তুলিয়া করুণাকে দেখিয়া লইল এবং মুখের ভিতরে যাহা পূরিয়াছিল তাহা উদরে নামাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি যেথা থাক, বউদিদি, সেইখানেই স্বর্গের বাতাস বয়।"

করুণা কমলাকে ঠেসিয়া, তাহার পিঠে মুখ লুকাইয়া বসিয়া ছিল। কমলার অত্যাচারে সে আর বসিতে পারিল না, তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া দৌড়াইয়া পলাইল এবং একবারে নীচের একটা ঘরের কোণে আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

"মুখে আগুন, ঠেলে ফেলে দিয়ে গেল দেখ!"—বলিয়া, কমলা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিয়া সুধাংশুকে বলিল, "শুধু মুখখানি নয়, ঠাকুরপো,—অন্তরটিও এমনি সুন্দর। এত কম বয়েসে এত বুদ্ধিবিবেচনা আমি ত আর কারো দেখি নি! এই ছোট্ট মেয়েটির অন্তরে এত দয়া-মায়া আছে, আধখানা পৃথিবীতে তা নেই।"

সুধাংশুর জলযোগ শেষ হইলে, তাহার নিকটে পাণের ডিপেটি খুলিয়া রাখিয়া, কমলা একটু হাসিয়া বলিল, "আর একদিন পাণ নিতে এসে তুমি আমার কাছে কি সত্যি ক'রে রেখেছ মনে আছে ?"

সুধাংশু পাণ মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "কি সত্যি, বউদিদি?"

কমলা। আমি ব'ল্‌লেই তুমি কি ক'রবে ব'লেছেলে মনে নেই ?

সুধাংশু একটু হাসিয়া নতমুখে বলিল, "ও !—সেই কথা ?—তা সেই দিনই আসুক !"

কমলা। আমি যদি সেই দিন অবধি নাই থাকি ?

সুধাংশু। তুমি না থাক্‌লে সে দিন আস্‌বার দরকারও হবে না।

কমলা। না—বল যে, তোমার দাদা অনুরোধ ক'রলে তাঁর অবাধ্য হবে না !

সুধাংশু। সেকথা এখন কেন, বউদিদি ?—এখন—

সুধাংশু কথাটা শেষ করিতে পাইল না। হেমন্ত আসিয়া তাহাকে ভাত খাইবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে সুধাংশু কৃষ্ণনাথের নিকটে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কমলাকে গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, তাহা শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন ; কে যেন অকস্মাৎ তাঁহার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিল। কমলা যে তাঁহার নহে, সে যে একদিন তাহার আত্মীয়গণের নিকটে চলিয়া যাইবে তাহা তিনি জানিতেন,—তিনি নিজেই তাহার স্বামীর অন্বেষণ করিতেছিলেন ; তবে তাঁহার এ ব্যামোহ কি জন্য ? হায় মানব-প্রকৃতি ! যাহা আমাদের নহে এমন কত জিনিসকেই আমরা আমাদের ভাবিয়া আগুলিয়া রাখিতে যত্ন করি এবং থাকিবার নহে জানিয়াও তাহাদের চলিয়া যাইবার নামে এমনি করিয়াই শিহরিয়া উঠি !

কৃষ্ণনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "তোমাকে ত এখন তোমার দাদার সন্ধানে যেতেই হচ্ছে? যত দিন তাঁর সন্ধান না হয়, তত দিন না হয় আমার মা আমার কাছেই রইলেন?"—তারপর আবার কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না—এ বিষয়ে তাঁর অভিপ্রায় কি, তাই আগে জান—তুমি একবার বাড়ীর ভিতরে যাও!"

সর্ব্বদাই যে কমলার নিকটে থাকে,—সুধাংশু আসিতেছে,—শুনিয়াই সে পলাইয়া গেল। নীরদাও ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল। সুধাংশু কমলার কাছে গিয়া বসিল এবং তাহার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া আপনার মনে মনে বলিল,—"হা জগদীশ্বর! এ কি করিয়াছ!—সে তপ্তকনক-কান্তির—সে ললাম দেহের এ কি দুর্দ্দশা করিয়াছ!"

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। অন্যান্য কথার শেষে সুধাংশু কমলাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল।

কমলা এতক্ষণ বেশ প্রফুল্লমুখে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, সুধাংশুর প্রস্তাবে তাহার মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। নীরবে, নতমুখে একটু বসিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, ঠাকুরপো!—আগে তুমি তাঁর সন্ধান ক'রে, তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও! এতদিন তোমার তাই করাই উচিত ছেল,—আমাকে খুঁজে বেড়িয়ে মিছে সময় নষ্ট ক'রেছ।"

সুধাংশু। না—বউদিদি, পরের অন্তঃপুর থেকে তোমাকে খুঁজে বার করাই দুঃসাধ্য ছিল; ভগবানের কৃপায় যখন তোমার সন্ধান হ'য়েছে—আর ভাবি না। তাঁকে খুঁজে বার ক'রতে দেরী হবে না। আগে তোমাকে বাড়ীতে রেখে আসি—চল! তুমি বাড়ীতে না গেলে, দেখা পেলেও কি তাঁকে বাড়ী ফেরাতে পারব?

কমলা ম্লানমুখে একটু হাসিয়া বলিল, "আমি বাড়ীতে গেছি শুন্‌লেও তিনি ফিরে যাবেন না ;—তিনি যে জানেন, আমি কলঙ্কিনী !"—একটা দীর্ঘশ্বাস কমলার হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নির্গত হইল।

সুধাংশু। এ তোমার অন্যায় অভিমান, বউদিদি! তিনি যেমন শুনেছিলেন, তেমনি বুঝেছিলেন ; আমার মুখে যখন সব কথা শুন্‌বেন, তখন কি আর কিছু বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌বে ? কালই আমরা বাড়ী যাই—চল ! তোমাকে রেখে এসে নিশ্চিন্তমনে তাঁকে খুঁজ্‌তে বেরুব।

কমলা। তুমি বুঝ্‌তে পারছ না ;—শেষে যা ক'রবে ব'ল্‌তেছ, আগে তাই কর ! তিনি বড় দুঃখেই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।—আমার জন্যে আর ভাবনা কিসের ?—আমি ত এখন একটা আশ্রয় পেয়েছি।

সুধাংশু মুখখানা ভারী ভারী করিয়া বলিল, "তাঁকে খুঁজে পেতে এখন যদি কিছুদিন দেরীই হয়, ততদিন তুমি এই রকম অনাথার মত পরের বাড়ীতে প'ড়ে থাক্‌বে ?"

কমলা পুনর্ব্বার একটু হাসিয়া বলিল, "এরা পর নয়, ঠাকুরপো ! এরা আমার বড় আপনার। আপনার জন যারা, তারাই যখন আমাকে সবাই ত্যাগ ক'রেছেল, কেউ আশ্রয় দেয়নি—কোথাও আশ্রয় পাই নি, তখন এরাই আমাকে আপনার হ'তেও বেশী আপনার ভেবে বাড়ীতে রেখেছে।"

সুধাংশু নিম্নে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল ; তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তবে তুমি এইখানে এদের বাড়ীতেই থাক !—আমাদের সংসার উচ্ছন্নে যাক্ ! আগুন লেগে, পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্ !"

সুধাংশু এই কথা বলিয়া অন্য দিকে চাহিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

কমলা। কেন তোমাদের সংসার উচ্ছন্নে যাবে, ঠাকুরপো ?—তোমরা দুটি ভাইএ বে-থা ক'রে সুখী হও! সংসারে শান্তি ফিরে আসুক!—আমার সুখের আশা এ জন্মের মত ফুরিয়ে গেছে।

কমলার আঁচলের খুঁটে একগোছা চাবি বাঁধা ছিল; সে তাহারই একটা লইয়া, সজলচক্ষে নিম্নে চাহিয়া মেজেতে হিজি-বিজি দাগ কাটিতে লাগিল।

সুধাংশুর বিশাল বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। সেও মাটীর দিকে চাহিয়া বাষ্পকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি যদি ফিরে না যাও, বউদিদ. তবে আমিও আর জীবনে ঘরমুখ হচ্ছি না;—দাদার যেদিন মন হবে বাড়ী ফিরে যাবেন, ইচ্ছে হয় আবার বে ক'রবেন,—তা'তে আমার কি ?—তিনি যখন আমাকে একটা কথাও না ব'লে যেখানে ইচ্ছে চ'লে যেতে পারেন, যতদিন ইচ্ছে থাকৃতে পারেন,—তুমিও যখন আমার দুঃখ বুঝ্‌লে না, তখন আমার আর বাড়ীতে ফিরে যাবার দরকার কি ?—এই গেরুয়াই আমার জীবনের সম্বল"—বাষ্পাকুলকণ্ঠে এই কথা বলিয়াই সে উত্তরীয়প্রান্তে নয়নদ্বয় আবৃত করিল।

সুধাংশুকে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া কমলার চক্ষুও অশ্রুশূন্য রহিল না। সেও অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি ত অজ্ঞান নও, ঠাকুরপো! সবই ত শুনেছ! আমি কি নিজের ইচ্ছেয় দেশ ছেড়ে এসেছি ?—মিছে কেন আমাকে দেবতার কাছে, ব্রাহ্মণের কাছে, গুরুজনের কাছে মিথ্যেবাদিনী হ'তে অনুরোধ কর ?—আমার কি আর ফিরে যাবার মুখ আছে ?"

সুধাংশু অশ্রুসমাকুল, আরক্ত নয়নদ্বয়কে বিস্ফারিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "গুরুজন কে?—স্ত্রীর কথায়, কি শুধু একটা জিদের বশে আপনার পুত্রবধূকে যে অকূলে ভাসিয়ে দিতে পারে, সে গুরুজন?—না দুদশটা টাকার জন্যে যে মানুষের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে পারে, সে ব্রাহ্মণ?—মানুষই নয়—তারা পশু—তারা পিশাচ—"

কমলা। ছি,—অমন কথা ব'ল্‌তে নেই! তাঁরা যে যাই করুন তবু আমাদের গুরুজন; সে কথাটা রাগে ভুলে যেও না!—

সুধাংশু অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না—বউদিদি! যাদের দয়া-মমতা নেই, আমি তাদের গুরুজন ব'লে মানি না—তাদের 'পশু' ব'ল্‌লে যদি পাপ হয়, আমি তাতে ভয় করি না;—সে পাপে যদি নরকে যেতে হয়, আমি সেখানে গিয়েও ব'লে বেড়াব,—তারা পশু, তারা পিশাচ!—যদি তাতে আমার জিভ্‌ খ'সেও যায়—কথা ক'ইতে না পারি, তবু নরকের দোরে দোরে অঙ্গারের অক্ষরে লিখে বেড়াব,—তারা পশু—তারা পিশাচ! তাদের কাছে মিথ্যেবাদিনী হবার ভয়ে তুমি বাড়ীতে ফিরে যাবে না?—দেবতাই বা কোথায়?—তাঁরাও আর কেউ জেগে নেই, বউদিদি!—তাঁদের বজ্র পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে প'ড়েছে!"

কমলা প্রশান্তমুখে সুধাংশুকে সান্ত্বনা করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "শান্ত হও! জ্ঞানবান্‌ হ'য়ে তুমি এমন অধীর হ'চ্ছ কেন? একটু স্থির হ'য়ে বুঝে দেখ দেখি, দুঃখ কি কেউ কারুকে দিতে পারে? তাঁদের কারো কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার কপালের।—আমি না গেলে তোমরা বাড়ীতে যাবে না কেন? তোমাদের বাড়ী, তোমাদের ঘর; আমি তোমাদের কে, ঠাকুরপো? ক'দিন তোমাদের বাড়ীতে ছিলুম, কিই বা ক'রতে পেরেছি?—শুধু নিজের মন্দ ভাগ্যি নিয়ে গিয়ে তোমাদের

অবধি সবার সুখ নষ্ট ক'রে দিয়েছি।—আমাকে আর মিছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রো না! দুঃখিনী বা অভাগী ব'লে যদি আমার ওপরে তোমার দয়া প'ড়ে থাকে, মন থেকে সেটুকুকে মুছে ফেল্‌তে চেষ্টা কর!—"

কমলার বক্ষটা আবার স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, কথাগুলি একটু একটু জড়াইয়া আসিতেছিল, কণ্ঠস্বরটাও যেন একটু কম্পিত হইতেছিল; একবার একটু থামিয়া, হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া স্থিরভাবে পুনরপি বলিল, "সংসারে কি সবাই চেরকাল থাকে? মেয়ে ছেলেদের নিয়ে মানুষ মা বাপের অভাবই ভুলে যায়। তোমাদেরও মেয়ে ছেলে হবে, জামাই হবে, বউ হবে, তাদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার ক'রবে, তাদের মুখ দেখে এ অভাগীর কথাও ভুলে যাবে।—আমি অনেক দিন ধ'রে অনেক দুঃখ পেয়ে ঘুরে ঘুরে এদের সংসারে এসে, একটু স্বচ্ছন্দে থাকতে পেয়েছি, এদের ছেড়ে আমি আর এখন কোথাও যাব না, ঠাকুরপো! জীবনের বাকী কটা দিন এদের কাছে থেকেই কাটিয়ে দোব।"

সুধাংশু বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে কমলার দিকে চাহিয়া দেখিল, সে যেন মর্ম্মরের প্রতিমা! তাহার দীর্ঘ নয়নদ্বয় অশ্রুপরিপ্লুত, কিন্তু দৃষ্টি স্থির! বিশীর্ণওষ্ঠপ্রান্তে, প্রভাতের ম্লান জ্যোৎস্নার মত মৃদু একটু হাসিও লাগিয়া আছে; কিন্তু সে হাসিটুকু কেবল তাহার সঙ্কল্পের অটলতা প্রকাশ করিতেছিল মাত্র। পরিম্লান মুখকান্তি, যেন প্রভাত-কুমুদাকরের ন্যায় প্রশান্ত-সুন্দর,—মূর্ত্তিটি যেন সদ্যঃশেষবর্ষণা জ্যোৎস্নাময়ী গভীর নিশীথিনীর ন্যায় মধুর-গম্ভীর!

সুধাংশু কমলাকে গৃহে ফিরাইবার আশায় নিরাশ হইয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিতচিত্তে ধীরে ধীরে বলিল, "তবে আমি এখন যাই?"

কমলা কথা কহিতে পারিল না। সুধাংশু প্রণামান্তে বিদায় লইয়া আসিয়া, নামিয়া যাইবার সিঁড়ির দুই তিনটা ধাপ অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময়ে কমলা উঠিয়া আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌বে, ঠাকুরপো ?"

সুধাংশু ফিরিয়া, নতমুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আদেশ কর !"

কমলা। আমার কাছে সত্যি ক'রে যাও যে, রাগ ক'রে গুরুজন কারুকে কোন অপমানের কথা ব'ল্‌বে না !

সুধাংশু গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার আদেশের চেয়ে কি আমার সত্যি বড়, বউদিদি ?—তুমি আমার হাত ও মুখ বেঁধে দিলে বটে, কিন্তু বিধাতার হাত ত বেঁধে রাখ্‌তে পারবে না !"

সুধাংশু ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল ;—"তাঁর সন্ধান হ'লে একটা খবর দিও" বলিয়া কমলা ফিরিয়া গেল।

কমলা ঘরে আসিয়া চোখদুটিকে ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল। সন্ধ্যার সময়ে সে হেমন্তের মুখে শুনিল, সুধাংশু চলিয়া যাইবার সময়ে কৃষ্ণনাথের সঙ্গেও দেখা করিয়া যায় নাই।

একখানা রেলগাড়ী হাবড়া ছাড়িয়া কাল্‌কা যাইবার জন্য ছুটিতেছিল। মধ্যশ্রেণীর একটা কামরায় অন্যান্য আরোহীর মধ্যে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া ছিল।

আকৃতি দেখিয়া সন্ন্যাসীর বয়স্‌ বেশী বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাহার মুখখানি যেমন কচি কচি, দাড়ি ও জটাগুলি ঠিক তেমন নহে ; সেগুলি যেন পেশাদারী যাত্রায় সাজা-সন্ন্যাসীর মত কেমন খাপছাড়া ধরণের।

সন্ন্যাসী-বাবাজীর চাহনিটাও ঠিক ঈশ্বরপরায়ণ, সংসারত্যাগী মুমুক্ষুর মত স্থির ও প্রশান্ত নহে, বড় উদাস, আর যেন সন্ধ্যাকালে কোন অজ্ঞাত, বিজন গিরিসঙ্কটে পথহারা পথিকের মত আকুল ও চঞ্চল।

অন্যান্য আরোহীরা সকলেই কথাবার্ত্তায় রেল-গাড়ীতে যাওয়ার কষ্টটাকে একটু লঘু করিয়া লইতেছিল; সন্ন্যাসী কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেছিল না, বোধ হয় কাহারও কথা শুনিতেও ছিল না। সে আপনার চিন্তা লইয়া একটি কোণে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বসিয়া ছিল।

আরোহীরা একে একে সকলে নামিয়া গেলে, সন্ন্যাসী একাকী হইয়া যেন একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছিল; আবার একজন যুবা আসিয়া সেই কামরায় উঠিল।

যুবারও আকৃতি বেশ সুন্দর, পরিচ্ছদাদিও বেশ সম্পন্নাবস্থার পরিচায়ক; মুখখানি কিন্তু বেশ প্রফুল্ল নহে। তাহার বিশাল ললাটে দীর্ঘদুশ্চিন্তা যেন একটা রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল এবং নেত্রক্রোড়ে প্রগাঢ় একটা কালিমা ও প্রজাগর-শ্রান্তিও লক্ষিত হইতেছিল। সেও গাড়ীতে উঠিয়া, সন্ন্যাসী যে ধারে বসিয়াছিল তাহার বিপরীত দিকের একটা কোণে বসিয়া বাহিরে চাহিয়া নিজের চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ অতীত হইল। গাড়ীখানা বহুপথ অতিক্রম করিয়া বহুদূরে আসিয়া পড়িলে, যুবা যেন নিজের চিন্তায় পরিশ্রান্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসীর নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল।

অনেক সময়ে এমন ঘটিয়া থাকে যে, পরস্পরের পরিচয়াদি জানিবার পূর্ব্বেই কথায় কথায় দুইজনের মধ্যে কেমন একটু প্রীতি জন্মিয়া যায়। সন্ন্যাসী ও যুবার মধ্যেও যেন সেই ভাবটা ঘটিয়া গেল। ভাবটের

প্রসিদ্ধ বিবিধ তীর্থস্থান লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের অনেক কথাবার্ত্তা হইল ; তাহার শেষে যুবা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতদূর যাবেন ?"

স। উপস্থিত এই গাড়ী যতদূর যায়।

যু। তার পর ?

স। তার এখন কিছুই ঠিক নেই ; আপনার কতদূরের টিকিট্ ?

যু। আমি আগ্রায় নেমে যাব।

স। আগ্রাতেই থাকা হয় কি ?

যু। না বেড়াতে যাচ্ছি।

স। তাজমহলটা তা হ'লে দেখ্ছেন বোধ হয় ?

যু। সে ইচ্ছে আর বড় নেই ;—অনেকবার দেখা হ'য়েছে।

স। আমিও তাজ অনেকবার দেখেছি, কিন্তু আবার দেখ্বার ইচ্ছে নেই, এমনটা বল্তে পারি না।—সুন্দর জিনিস যেন পুরন হ'তে চায় না ; যতবার দেখেছি, তাজ ততবারই যেন নূতন মনে হ'য়েছে!—দিনে, রাতে, রৌদ্রে, জ্যোৎস্নায়, সকালে, সন্ধ্যায়,—যখনই দেখুন, তাজ ত সেই একই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য্য মনকে মুগ্ধ করে না?—ভিন্ন ভিন্ন কথা মনে তুলে দেয় না?—সেইখানটাতে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন মনের কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়!

যুবা। মাটীর চাপ্ড়া বসান একটা যেমন তেমন গোরস্থান, কিম্বা ছেঁড়াকাঁথা—ভাঙ্গাকলসী—আধপোড়াকাঠ-কয়লা-ছড়ান শ্মশানের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও কি মনের ভাবান্তর হয় না?—আর যুগযুগান্তের কত রাজা ও রাজ্যের আবির্ভাব-তিরোভাব, অভ্যুদয়-বিলয়ের সহস্রস্মৃতি-জড়িত যমুনার কালো জলের উপরেই মর্ম্মরের এমন শুভ্র-সুন্দর সমাধিমন্দির

দেখে মনের ভাবান্তর উপস্থিত হবে বিচিত্র কি ?—তাজমহলে শিল্প-নৈপুণ্য যথেষ্ট আছে তা স্বীকার করি ; তেমন আগ্রায় এবং ফতেপুরশিক্রী, দিল্লী, বিজাপুর ও বিজয়[illegible] প্রভৃতি ভারতের আরও অনেক স্থানে দেখা যায়।

সন্ন্যাসী। [illegible] সৌন্দর্য্যের কথা ব'লছি না। কাব্যের সৌন্দর্য্য যেমন ভাষায় নয়—[illegible]ব, তাজের সৌন্দর্য্যও তেমনি শুধু পাথর-সাজান-বসা-মাজায়, পাথর [illegible]টে তার ভিতরে রঙ্গিন্ পাথর বসিয়ে, ফুল-ফল-লতা পাতা-দেখানতেই নয় ;—যে ভাবে তাজের সৃষ্টি, সেই ভাবটি বড় সুন্দর! যেমন জীবনে, তেমনি মরণেও দু'জনে কেমন পাশাপাশি! তাজ শুধুই 'মর্ম্মরে স্বপ্ন' নয়,—মর্ম্মরে একখানি অতি উপাদেয় ভাবময় কাব্য!—পৃথিবীর আর কোন দেশে, আর কোন রাজা পত্নী-প্রেমকে এমন চিরসুন্দর ও চিরস্মরণীয় ক'রে যেতে পেরেছে কি ?

যুবা। তার কারণ, একটা প্রকাণ্ড ভুলকে রাশি রাশি অর্থব্যয়ে চিরস্মরণীয় ক'রে যেতে ইচ্ছে করে এমন পাগল পৃথিবীর আর কোন দেশে জন্মে নি।

সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ যুবার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভুল কিসে ?"

যুবা। আপনি সন্ন্যাসী সে কথা কি ক'রে বুঝ্‌বেন ?

স। সন্ন্যাসীরও হৃদয় আছে, বোঝ্‌বার শক্তি আছে, একটু বুঝিয়ে ব'ল্‌লেই বোধ হয় বুঝ্‌তেও পারে।

যুবা। পত্নীকে ভালবাসাই যে মানুষের একটা মস্ত ভুল!

স। এ ভ্রান্তির জগতে ভুল কোন্‌টা নয় ?—আর সব ভুলের মধ্যে এই ভালবাসার ভুলটাই বোধ হয় সুখের, এ ভুল ভেঙ্গে যাওয়াটাই দুঃখের।—সুখের স্বপ্নও যদি ভেঙ্গে না যায় ত তাই স্বর্গ!

কিছুক্ষণ দুইজনেই নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবা বলিল, "আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড় ভাল হল; প্রভু—আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিল, "আমার যাওয়া যে অপুনরাবৃত্তির জন্যে; অমার সঙ্গে আপনি কোথা যাবেন ?"

যুবা। আমারও আর ফিরে আস্‌বার ইচ্ছে নেই।

সন্ন্যাসী। আপনি এত অল্প বয়েসে সংসার ছেড়ে পালাতে চান কেন ?

যুবা। বয়েসের হিসেব ক'রে সংসার ছাড়তে হ'লে ত আপনাকেও আবার জটামুণ্ডন ক'রে দেশে ফিরে যাবার টিকিট্ কিন্‌তে হয়।—সুখ না থাকে, সুখের একটু আশা থাক্‌তেও মানুষ সংসার ছাড়তে চায় না। সংসারে ত সুখ খুঁজে পাই নি, সন্ন্যাসে আছে কি না একবার খুঁজে দেখি।

সন্ন্যাসী একটু বেশী রকমের হাসি হাসিয়া বলিল, "সংসারে যা খুঁজে পান্ নি, সন্ন্যাসে তা খুঁজে পাবেন ? সংসারীর সুখের জন্যে সমস্ত সংসারটা দিনরাত বিব্রত,—কত দেশে, কত উপায়ে, কত সুখের ও বিলাসের উপকরণ উৎপন্ন হ'চ্ছে। আর সন্ন্যাসীর জন্যে কি ?—জীর্ণচীর পরিধান, ভূতলে শয়ন, দিনান্তে—কখন দিনান্তরে, প্রাণ-ধারণের মত কিছু ভোজন,—বনে যদৃচ্ছোপপন্ন কষায় কটু-তিক্ত ফল-পাতা, আর জনপদে কচিৎ ভিক্ষালব্ধ যৎকিঞ্চিৎ!—সন্ন্যাস অভাবময়, তাতে সুখ কোথা ?"

যুবা। সন্ন্যাস মানেই ত ত্যাগ,—ভোগে সুখ কোথায় ?—ভোগ্য বস্তু ক'জন পায় ? কঠোর পরিশ্রম বিনিময় ভিন্ন সংসার কারুকে এক

মুঠা ভাত অবধি দিতে চায় না। যারা ভাগ্যবান্, তাদের জন্যে সংসারে একটু সুখ থাক্‌তে পারে; কিন্তু সেই কণামাত্র সুখের জন্যে তাদিকেও রাশি রাশি দুঃখ ভোগ ক'রতে হয়। যারা ভাগ্যহীন, তাদের ত কথাই নেই; সংসার তাদের উপরে কতই দুর্ব্বহ দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স'রে দাঁড়ায়, কাঁদ্‌লেও আর ফিরে চেয়ে দেখে না। দুঃখের চাপানে কতজন প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রেছে তার গণনাই হয় না।

সন্ন্যাসী। সে রকম দুপাঁচটা হতভাগ্যের কথা ছেড়ে দিন! বাকী পোনের আনা লোকের মুখই ত বেশ হাসিমাখা দেখ্‌তে পাওয়া যায়? জীবনের ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠাই ত অনেকের কেবল সুখের কথাতেই পূর্ণ শুন্‌তে পাই?

যুবা একটু হাসিয়া বলিল, "আপনি সন্ন্যাসী, দূরে থেকে সংসার দেখেন, তাই ঐ রকমটা আপনার মনে হয়। দূর থেকে দূরের বিরল তৃণও ঘন মনে হয়—স্বল্প জলও গভীর দেখায়। জীবনের ইতিহাস যদি কারও কাছে গিয়ে প'ড়ে দেখেন তবে দেখ্‌তে পাবেন, তার প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, ছত্রে ছত্রে, বর্ণে বর্ণে, কেবল দুঃখ—দুঃখ—আর দুঃখ!"

একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যুবা পুনশ্চ বলিল, "জীবনের ইতিহাস ক'জনের শুন্‌তে পান? ঘটনাপূর্ণ দু'চারটা বড় বড় জীবনের কথাই শুন্‌তে পাওয়া যায়,—বাকী সব, যে অনন্তগর্ভ থেকে ছোট ছোট বুদ্‌বুদের মত উঠে নিয়তির স্রোতে, মহাকালের বক্ষে ভেসে আসে, তাতেই মিলিয়ে যায়;—পৃথিবী তাদের দাগটি পর্য্যন্ত বুকে রাখ্‌তে চায় না, জনসমাজ তাদের স্মৃতিটুকু অবধিও মন থেকে মুছে ফেলে!"

দূরে একটা প্রান্তরের মধ্যস্থলে বনবেষ্টিত একখানি জনশূন্য, জীর্ণ গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখা যাইতেছিল। যুবা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া

সন্ন্যাসীকে তাহা দেখাইয়া "বলিল, ঐ যে বনে-ঢাকা ভাঙ্গা বাড়ীখানি দেখা যাচ্ছে, আর কিছুদিন পরে ওর কি থাক্‌বে? এখনই বা কে জানে,—কে ব'লতে পারে, ঐ বাড়ীর লুপ্তপ্রাঙ্গণ কতদিন আগে কোন্ ভাগ্যবানের আনন্দহাস্যে মুখরিত হ'য়েছিল, কি কোন্ অভাগার ক্রন্দনের রোলে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছিল? কোনও ইতিহাসেই তা দেখ্‌তে পাবেন না; কিন্তু বেশ ব'ল্‌তে পারি, তারা যদি অসাধারণ সৌভাগ্য নিয়ে না এসে থাকে তবে সাধারণের মত দুঃখেই তাদের জীবনের অবসান হ'য়েছে! এ সংসার অশেষবিধ দুঃখের অকূল সাগর,—দুঃখের সীমা নেই, অবসান নেই।

সন্ন্যাসী। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না। আমার বিশ্বাস, সংসার আনন্দ-সুখে পূর্ণ—অমৃতময়; দুঃখ মানুষের অন্তরে। যে সংসারে চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে, যে সংসারে শিশুর সরল হাসি আছে, প্রীতিময়ী রমণীর প্রেমামৃতপূর্ণ হৃদয় আছে, সে সংসারে আনন্দের বা সুখের অভাব কি?

যুবা। মানুষের দুর্ভাগ্য যে, চাঁদের আলোয় শুধু অন্ধকারই দূর হয়—অভাব দূর হয় না, ফুলের গন্ধেও কারো পেট ভরে না! শিশুর আনন্দের হাসি মৃত্যুর স্পর্শে নিভে যায়, মা বাপের আশা-ভরসা একমাত্র বংশধর পুত্রকে মায়ের কোল শূন্য ক'রে কেড়ে নেবার জন্যে তার শিওরেও যম এসে দাঁড়িয়ে থাকে। রমণীর হৃদয় নেই, থাকে ত তাতে প্রেম থাকে না; প্রেম ব'লে যা মনে হয়, সেটা অমৃত নয়—একটা তীব্র বিষ, তাতে প্রাণ শীতল হয় না—স্নিগ্ধ হয় না, শুধু জ্ব'লে পুড়ে ক্ষার হ'য়ে যায়।

সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যুবা

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল,"সোণার শৈশবে যখন কোন বড় চিন্তা হৃদয়ে আস্‌তে পায় না, সংসারের স্রোত জীবন-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখের তরঙ্গ নিয়ে দূরে দূরে ব'য়ে যায়, আমরা শুধু খেলা নিয়ে থাকি—খেলা পেলে খাওয়া অবধিও ভুলে যাই, আর সন্ধ্যেবেলা খেলায় শ্রান্ত হ'য়ে, ধূলামাখা দেহখানি মায়ের কোলে ঢেলে দিয়ে স্বর্গের সুখ উপভোগ করি, তখন সংসার অমৃতময় ব'লেই মনে হয়। তখন গাছ, পাতা, ঘর, বাড়ী, সবই যেন কি একটা ইন্দ্রধনুর রঙ্‌ মেখে থাকে। সমস্ত সংসারটা যেন কি একটা অপূর্ব্ব ছায়া-বাজীর মত মনোহর মনে হয়। বাল্যেই আবার যখন মা আদর-যত্ন করেন, কিন্তু পাঠশালায় না গেলে পিতা তাড়না করেন, সঙ্গীরা খেল্‌তে এসে ঝগড়া ক'রে ফিরে যায়, ফোটাফুল তুল্‌তে গেলেই ঝরে পড়ে, তখনই মনের মধ্যে একটা সংশয় উপস্থিত হয়, সংসার কি শুধুই অমৃতময়, না এ অমৃতের সঙ্গে আরও কিছু আছে! তারপর প্রথম যৌবনে, পত্নীর নবানুরাগের মোহে যখন হৃদয়ে আনন্দের নদী উজান ব'য়ে যায়, বিবিধ আশার অরুণরাগ তরুণহৃদয়ে নানাবিধ সুখের চিত্র অঙ্কিত করে, তখন আবার দিন কতক যেন সে সংশয়টা কোথায় স'রে যায়! কিন্তু পরেই আবার যখন পত্নীর সেই নবানুরাগের ওপরে সংসারের কঠোর আবরণ পড়ে, প্রেমালাপের মধ্যেও সংসারের বিবিধ অভাব ও অভিযোগের কথা এসে উপস্থিত হয়, ছেলে মেয়েদের আনন্দের হাসি প্রাণে অমৃত-সেচন করে,আবার তাদের রোগ-শোক হৃদয়ে বিষাদ ঢেলে দেয়, তখন আবার বাল্যের সেই সংশয়টা ঘোরতর হ'য়ে ফিরে আসে। জ্যোৎস্নারাত্রিতে সাজান বৈঠকখানায় গান-বাজনার সঙ্গে হাসির লহর উঠ্‌তে শুনে মনে হয়, সংসার আনন্দে ভরা; কিন্তু গভীর

নিশীথের নীরব, প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে যখন পতি-পুত্র-শোকাতুরার রোদনের রোল উঠ্‌তে থাকে, তখন মনে হয়—"ন জানে সংসারং কিমমৃতময়ং কিং বিষময়ং!" তারপর আবার যখন জীবন-সংগ্রামের কঠোর প্রতিযোগিতা ও পরাভব, হৃদয়ে নৈরাশ্য,—দেহে শ্রান্তি ও অবসাদ ঢেলে দেয়, প্রিয় সঙ্গীরা সব নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে দূরে দূরে স'রে প'ড়ে, নবযৌবনের সেই সব অতৃপ্ত আশা ও বাসনাপুঞ্জ ভগ্নদুর্গের ছিন্নপতাকার মত জড়িয়ে সড়িয়ে একপারে প'ড়ে থাকে, স্নেহ ও ভালবাসার জনগুলি সব একে একে আমাদের একা ফেলে চ'লে যেতে আরম্ভ করে,তখন কার মনে হয় না যে, এ প্রত্যক্ষ বিষময় সংসারকে কি ক'রে একদিন তেমন সুখময় বা অমৃতময় ব'লে মনে হ'য়েছিল! স্বভাবের শোভা সুখীর সুখ বাড়াতে পারে, কিন্তু দুঃখীর দুঃখ কমাতে পারে না। তাই বা কোন্‌টা ক'দিন থাকে?—শরতের পূর্ণ সরিৎ ও সরোবরের শোভা হেমন্তে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, বসন্তের বনশ্রী নিদাঘের নিঃশ্বাসেই শুকিয়ে ঝ'রে যায়, সন্ধ্যের স্বর্ণমেঘগুলি রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যায়, উষার আনন্দ-রাগ প্রভাতের অবসাদ-ম্লানতায় বিলীন হ'য়ে যায়! মোটের ওপরে উপভোগের সব আনন্দ ও সুখই ক্ষণিক, ত্যাগের আনন্দ ও তৃপ্তিই স্থায়ী; কিন্তু সংসারে ত্যাগের পথ বড়ই সঙ্কীর্ণ, বহুবাধাপূর্ণ ও বিঘ্নসঙ্কুল!"

সন্ন্যাসী। কিন্তু ভোগের মধ্যেই যে ত্যাগ তাই যথার্থ ত্যাগ,—সংসারে থেকেই যে সন্ন্যাসী সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আসক্তি নিয়ে ভোগের সামগ্রী থেকে দূরে থাকাকে ত্যাগ বলা যায় না, জটা-বল্কলধারণ বা কপ্‌নী-কম্বল-গ্রহণকেও সন্ন্যাস বলা যায় না। কৌপীনধারী কত জটাধর সংসার-সুখের দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তা লক্ষ্য ক'রেছেন কি? সংসার

বাইরে নয়—মানুষের অন্তরে। মন থেকে যে সংসারকে বা'র ক'রে দিতে পেরেছে, সংসারে থাক্‌লেও সে সন্ন্যাসী ; আর যে তা পারে নি, বনে ব'সেও সে ঘোর সংসারী।

যুবা। তাই যদি জানেন তবে এ জটার বোঝা মাথায় ক'রে বনে চ'লেছেন কেন ?

সন্ন্যাসী। আমি যে ধর্ম্মের জন্যে বা সুখের আশায় সন্ন্যাসী হ'য়েছি সেটা কিসে বুঝ্‌ছেন ?

যুবা। সুখের অন্বেষণ আর দুঃখপরিহারের চেষ্টা মানুষের—শুধু মানুষ কেন, জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব, তাইতেই অনুমান ক'রছি। আপনার সন্ন্যাসের হেতু কি তা নয় ?

সন্ন্যাসী। না—আমার সংসার-বিরাগের হেতু একটা নিন্দনীয় বিষয়ে অকৃতকার্য্যতা ও নৈরাশ্য, সংসার-জীবনের ইতিহাসও শুধু পাপের কাহিনী।

যুবা। অকৃতকার্য্যতা বা নৈরাশ্য ত মনুষ্যের নিত্যসঙ্গী। নিষ্পাপ জীবন দেবতার স্বপ্ন! মানুষ এমন কে আছে যে একেবারে পাপশূন্য ? যে নৈরাশ্য বৈরাগ্য এনে দিতে পারে তা নিন্দের নয়—বরং শ্লাঘার। আপনার সন্ন্যাসের রহস্য বোধ করি কারুকে বল্‌বার মত নয় ?

সন্ন্যাসী। যাকে তাকে বল্‌বার মত নয় বটে, তবে আপনার কাছে গোপন রাখ্‌বারও কোন দরকার দেখ্‌তে পাই না,—শুন্‌বেন ?

সন্ন্যাসী উক্ত প্রকার বলিয়া, যুবকের দিকে ফিরিয়া বসিয়া আপনার ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল।

৯

সন্ন্যাসী। আমার বাপ্ একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার ছিলেন। আমি তাঁর একমাত্র পুত্র। একজনকে কন্যাদায়মুক্ত ক'রবার জন্যে যার সঙ্গে তিনি আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, একটি দিনের জন্যেও তার সঙ্গে আমার মনের মিল হ'ত না। আমার ভালবাসা-বৃত্তিটা উপযুক্ত অবলম্বন না পেয়ে, অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে নিরন্তর চারদিকে ছুটে ছুটে বেড়াত। বাল্যে সুশিক্ষা পাই নি ; সুপরামর্শ দিয়ে সৎপথে নিয়ে যায়, বাবার মৃত্যুর পর সংসারে এমনও কেউ ছিল না। অর্থ ও সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল,—প্রভুত্বও অপ্রতিহত ; সুতরাং আমার ইচ্ছে কখন দরিদ্রের মনোরথের মত হৃদয়ে উত্থিত হ'য়ে হৃদয়েই বিলীন হ'ত না—বরং ইচ্ছের প্রতিকূলে কিছু উপস্থিত হ'লে, ইচ্ছেটা আরও প্রবল হ'য়ে উঠ্ত। যৌবন, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি যার এক একটিকেই জ্ঞানীরা অনর্থের মূল ব'লে থাকেন, তার চারটিই আমাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান্ ছিল ; সুতরাং প্রমত্তযৌবনে আমার চরিত্র যা হ'য়ে দাঁড়াল তা বুঝ্তেই পারছেন ! স্ত্রী সংসারের বন্ধন না হ'লেও স্বেচ্ছাচারের পথে একটা কণ্টক ছিল, সেও—আমার অনাদরেই বোধ হয়, অকালেই মৃত্যুকে আশ্রয় ক'রে আমার যথেচ্ছাচারের পথকে বিঘ্নশূন্য ক'রে গেল। আমি অবাধে বিলাসের স্রোতে গা-ভাসান দিলুম। সব কথা ব'লে আপনার ঘৃণা বাড়িয়ে ফল কি ?—যেটুকুর সঙ্গে আমার সন্ন্যাস অথবা বৈরাগ্যের সম্বন্ধ তাই বলি।

প্রথমযৌবনে একজনকে বড় ভালবেসেছিলুম। আমাদের গ্রামেই তাদের বাড়ী। তার বাপের সঙ্গে আমার বাপের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

আমি প্রায়ই তাদের বাড়ীতে যাওয়া-আসা ক'রতুম। একদিন—সে তখন কুমারী, তাদের বাড়ীতে হঠাৎ গিয়ে দেখি, সে মেজেতে ঘুমিয়ে র'য়েছে। সেটা গ্রীষ্মকাল। তার মুখখানিতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল। আমার মনে হ'ল, যেন একটি পদ্মফুল ফুটে র'য়েছে—আর তার ওপরে ছোট ছোট মুক্তোর মত শিশিরের ফোঁটা জ'মে র'য়েছে! মেঘের মত ঘন—কালো রঙের চেয়েও কালো এলো চুলের রাশি মেজেতে লুটিয়ে প'ড়েছে!—মনে হ'ল যেন খানিকটা কালো মেঘের সঙ্গে একটা বিদ্যুৎ মাটীতে খ'সে প'ড়ে র'য়েছে! তার সে যে কি রূপ—আর কত রূপ তা ব'লতে পারি না। মানুষের যে তত রূপ সম্ভব হ'তে পারে তাই বিশ্বাস হয় না! আমি অবাক্ হ'য়ে, তার সেই অসামান্য রূপের পানে চেয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম তা ব'লতে পারি না,—হঠাৎ দেখ্‌তে পেলুম, সে তাড়াতাড়ি উঠেই কটাক্ষে একবার আমার পানে চেয়ে, একটু হেসে ঘর থেকে চ'লে গেল। আমার মনে হ'ল, যেন দিনটা অকস্মাৎ রাত হ'য়ে গেছে,—সংসারটা একটা প্রকাণ্ড শূন্য হ'য়ে গেছে! সে শূন্যের মধ্যে প'ড়ে আছি আমি একা! তার সে কটাক্ষটা যে তিরস্কার তা বেশ বুঝ্‌তে পারলুম; কিন্তু বুঝ্‌তে পারলুম না, সে হাসিটা কেন! সে হাসিতে যেন অমৃতের ফেনা উছলে প'ড়তেছিল! আমি সে মধুর, শুভ্র হাসির অমৃত-মদিরায় মুগ্ধ হ'য়ে, মত্ত হ'য়ে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে সেই ঘুমন্ত মূর্ত্তিটি এঁকে নিয়ে উদাসমনে বাড়ী ফিরে এলুম।

দু'দশ দিন চ'লে গেল, আমার মুগ্ধমনের সে উদাসভাবটা একটুও কম হ'ল না। পূর্ব্বে ত আরও কত দিন কত শত বার তাকে দেখেছি; কিন্তু সেদিন যে কি চোখে তাকে দেখে এলুম তা জানি না,—

জাগরণে ও স্বপ্নে, সে মূর্ত্তি [illegible] আমার চোখের সাম্‌নে জ্বল্ জ্বল্ ক'রতে লাগ্‌ল। সুন্দর কিছু দেখ্‌লে সেটাকে নিজের ক'রে নেবার ইচ্ছেটা বোধ হয় মানুষের স্বাভাবিক।—সুন্দর ফুলটি ফুটে র'য়েছে দেখে, কে না সেটিকে তুলে নিতে চায়?—শিশু যে চাঁদ দেখে ধরবার জন্যে নিজের ছোট ছোট হাত দুখানি বাড়িয়ে দেয়, সেটাও বোধ হয় শিশু-মানবেরই বিকাশোন্মুখ মানবত্ব,—না পেরে যে কাঁদে সেই টুকুই শুধু তার শিশুত্ব। সেই দিন তাকে দেখে আমার ইচ্ছে হল, যেমন ক'রে পারি তার সেই মূর্ত্তি আমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত ক'রব—তাকে আমার নিজস্ব ক'রব। ভাবলুম, কেন তা হবে না? ধন, মান, কুল, শীল, রূপ, যৌবন,—আমার কি নেই? লজ্জায় নিজে তার বাপ্‌কে ব'ল্‌তে পারলুম না, একজন ঘটক লাগালুম। সে ঘটক আবার তার বাপের গুরুপুত্র। তবু আমার প্রার্থনা তিনি গ্রাহ্য ক'রলেন না। আমাদের গ্রামের নিকটেই আর একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আমি নিরাশ হ'য়ে যুক্তি-তর্কে মনকে বাঁধ্‌তে অনেক চেষ্টা ক'রলুম,—কিছুতেই কিছু হল না। দুর্দ্দমনীয় বাসনার প্রবল স্রোতে সব যুক্তি, সব তর্ক, প্রবল বানের মুখে বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে ভেসে কোথায় কি হ'য়ে গেল। সেই সঙ্গে ভেসে গেল,—আমার আনন্দ, সুখ, মনুষ্যত্ব, ইহকাল, পরকাল! রইল শুধু আমার সেই কু-আশা-সমাচ্ছন্ন তমোময় হৃদয়ে জেগে,—তার সেই মূর্ত্তি—শুভ্র, শান্ত, সুপ্ত জ্যোৎস্নার মত,—ধ্রুবতারার মত! আর রইল শ্রাবণের কূলপ্লাবিনী প্রবলা স্রোতস্বতীর মত, আমার সমস্ত প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়কে মগ্ন ক'রে,—তার চিন্তা! আমি যেন পাগলের মত হ'য়ে গেলুম!

কতদিন চ'লে গেল, তারপর তার শাশুড়ী তাকে বাড়ী থেকে

তাড়িয়ে দিলেন। তার স্বামীও তাকে ত্যাগ ক'রলে। তার বাপের মৃত্যু হ'ল। আমার মনে হ'ল, আমার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বিধাতার চরণে গিয়ে লেগেছে! আবার আমি হৃদয়ে দুরাশার প্রকাণ্ড ঘর বেঁধে দিলুম। তার অসহায় অবস্থায় সহায়তা করবার চেষ্টা ক'রে, কত রকমে প্রীতি জানিয়ে তার মনে একটু স্থান পাবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লুম। ইতিমধ্যে তার স্বামী লুকিয়ে তাকে নিয়ে বিদেশে যাবার ইচ্ছে জানিয়ে একখানা পত্র দিয়েছিল; সে পত্রখানা হঠাৎ একদিন আমি পথে কুড়িয়ে পেলুম। সে কোথাও চ'লে যায়,—তাকে দেখার সুখটুকু থেকেও বঞ্চিত হই, আমার তা ইচ্ছে নয়। আমি সে পত্রখানাকে তার শ্বশুরের কাছে পাঠিয়ে দিলুম। তিনি লুকিয়ে রাখ্‌বার জন্যে তাকে দূরে কোথাও পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রছেন শুনে, আমি তার বাপের গুরুপুত্র—সেই অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণটাকে কিছু টাকা দিয়ে হাত ক'রলুম। কাশীতে—আমারই একটা বাড়ীতে, তার এক কুলটা ভগিনী থাকত। পরামর্শ দিয়ে তাকে সেইখানে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে নিলুম। আমার সুচিরপোষিত বাসনা সফলতার জন্যে শতমুখী হ'য়ে উঠ্‌ল। ভিক্ষে ক'রে যা পাই নি, তা পাবার জন্যে দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন ক'রলুম। পুণ্য, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব,—সব ভাসিয়ে দিয়ে, আমার দিকে তার মনকে ফেরাবার জন্যে, আপনি আড়ালে থেকে সেই ব্রাহ্মণীটাকে দিয়ে অনেক দিন ধ'রে অনেক চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লুম। যখন দেখ্‌লুম, কিছুতেই কিছু হ'বার নয়, তখন নিজে দেখা দিলুম। দুই একটা দুরূহ বিষয়ে কৃতকার্য্য হ'য়ে আমার ধারণা হ'য়েছিল, সতীত্ব ব'লে জগতে কিছু নেই,—ওটা কেবল একটা ফাঁকা কথা। সতীত্বের আবরণ যতই দৃঢ় হ'ক, প্রলোভনের টান সইতে পারে না, দুঃখকষ্টের ভয়েও ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু সে আমার

এই ভুল ধারণাটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কত রকমের কত প্রলোভন ও ভয় দেখিয়েছি, কিছুতেই কিছু হয় নি।—অসহায় অবস্থায় সাহায্য ক'রতে গিয়ে দেখেছি, দুর্দ্দিনে আত্মীয়তা জানিয়ে দেখেছি, বিদেশে বন্দিনী ক'রে মুক্তির আশা দিয়ে দেখেছি, বিপদে ফেলে বিপদ্ বুঝিয়ে দিয়ে দেখেছি, ভয় দেখিয়ে ভরসা দিয়েও দেখেছি, সেই একভাব—সেই ঔদাসীন্য আর উপেক্ষা! সহোদরের মত প্রীতি দেখিয়ে দেখেছি, প্রণয়ীর মত ভালবাসা জানিয়ে দেখেছি, ভক্ত সাধকের মত উপাসনা ক'রেও দেখেছি—সমান ঘৃণা! স্বর্গবাসী যেমন নারকীকে ঘৃণা করে, মানুষ যেমন বিষ্ঠার কৃমিকে ঘৃণা করে—তেমনি ঘৃণা! আমি যে কি কঠোর পাষাণের উপাসনায় জীবনকে বিষময় ক'রেছি তা আর কি ব'ল্ব? তার যে সে কি অসীম আত্মনির্ভর,—কি প্রগাঢ় পতিনিষ্ঠা তা ব'ল্তে পারি না। কাম-বৃত্তিটা যেমন একদিক দিয়ে মানুষের মনে প্রবেশ করে, অমনি আর একদিক দিয়ে ধর্ম্মজ্ঞান, মনুষ্যত্ব, দয়া-মমতা, সব মন থেকে বেরিয়ে যায়। কৌশল, প্রলোভন, দীনতা ও সাধনা, সব বিফল হ'ল দেখে, হতাশহৃদয়ে উন্মত্তভাবে, গভীর রাত্রিতে তার ঘরে প্রবেশ ক'রে বলপ্রয়োগেও উদ্যত হ'য়েছিনু। তাতেও তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিচলিত ক'রতে পারি নি। সে দানবীর বলে আমাকে একধাক্কায় ফেলে দিয়ে, ঘরে শিকল দিয়ে আমাকে বন্দী ক'রে রেখে, আপনি মুক্তি লাভ ক'রেছে।—সেই থেকে জীবন-ব্যাপী নৈরাশ্য আর মর্ম্মব্যথা নিয়ে সে অসাধ্যসাধনা ত্যাগ ক'রেছি।

সন্ন্যাসী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া দূরে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

যুবা স্তব্ধভাবে বসিয়া সন্ন্যাসীর প্রণয়াখ্যান শুনিতেছিল, তাহা শেষ

হইবার পরেও অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ সেই ভাবে অতিবাহিত হইলে, যুবা নিজের অনবধানতার জন্য যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া, মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ জটা-শ্মশ্রুগুলি কি আপনার প্রণয়-সাধনার সঙ্গী ছিল, না—বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে জন্মেছে?"

সন্ন্যাসীও যুবার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "এ সমস্তই কৃত্রিম;—বিষয়গুলির একটা বিলি-ব্যবস্থার জন্যে একবার দেশে যাবার দরকার হ'য়েছিল, ছদ্মবেশ ভিন্ন আর সেখানে আমার যাবার যো নেই।"

যুবা। দেশ ছেড়ে ত অনেক দূর এসে প'ড়েছেন, এখনও এগুলি ছাড়েন নি কেন?

সন্ন্যাসী। ছদ্মবেশের জন্যে এগুলি ধারণ ক'রেছিলুম্ বটে, কিন্তু মনের গতিটা এখন এতই ফিরে গেছে যে, রাজবেশের জন্যেও আর এ বেশ ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। এই বেশটাকেই নিত্যবেশ ক'রে নেবার ইচ্ছে হ'য়েছে।

যুবা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা বেশ!—তবে একটা কথা এই যে, এ শ্মশান-বৈরাগ্যটা স্থায়ী হবে কি?"

সন্ন্যাসী একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "ব'ল্‌তে পারি না, তবে হওয়াই সম্ভব মনে হয়।—ভাল আর মন্দের সঙ্ঘর্ষটা একবারে নিষ্ফল হয় না,—মন্দ যদি ভালকে নিজের পথে টেনে আন্‌তে না পারে তবে আপনিই ভালর পথে গিয়ে পড়ে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তনটা একদিকে না একদিকে সব জিনিসেরই হ'চ্ছে। ভালর দিকে যে পরিবর্ত্তন, সেটার বড় আর পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ সেই দিকেই বিশ্বের প্রবণতা—জগৎ দিনে দিনে ভালর ভাবেই ফুটে উঠ্‌ছে।"

যুবা। কি জানি—আমার ত ঠিক তার বিপরীত মনে হয়। সয়তান যে কখন রমণীর একটা ধাক্কাতেই সদাশিব হ'য়ে দাঁড়ায়, তা ত কৈ বড় দেখা যায় না।—সে যা হ'ক,—আপনি ব'ল্লেন, সে সুন্দরীর বাড়ী আপনারই গ্রামে। তার স্বামীর সঙ্গে আপনার কখন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি ?

সন্ন্যাসী। আমিই ইচ্ছে ক'রে তা করি নি।—কেন, তার সঙ্গে আপনার জানা-শুনা আছে না কি ?

যুবা পুনর্ব্বার একটু হাসিয়া বলিল, "একবারেই যে নেই তা কি ক'রে বলি ?—আপনার নাম বোধ হয়—হরকুমার বাবু ?"

সন্ন্যাসী বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে যুবার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার নাম ?"

যুবা। বল্‌তে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে সেটা না শুন্‌লেই বোধ হয় ভাল হ'ত ;—যে সুন্দরী আপনাকে সন্ন্যাসী ক'রেছে, সেই আমাকেও গৃহত্যাগী ক'রেছে।—আমার নাম বিরাজমোহন।

'বিরাজমোহন' এই নামাক্ষর কয়টিতে কি ইন্দ্রজাল-শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল বলা যায় না, তাহা উচ্চারিত হইবা মাত্র হরকুমারের মুখখানা কাগজের মত শাদা হইয়া গেল—সে যেন একবারে নিভিয়া গেল !—তাহার মাথা একবারে বুকের উপরে ঝুলিয়া পড়িল।

হীরালালকে বাড়ী ফিরাইয়া দিয়া বিরাজমোহন সেই যে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে, তাহার পর আর দেশের দিকে মুখ ফিরায় নাই, বিদেশেও কোথাও দুইদিন একস্থানে স্থায়ী হইতে পারে নাই,—ঝড়ের মুখে শুক্‌না পাতার মত নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে একবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কলিকাতায় গিয়া বাড়ীর সংবাদটা জানিয়া আসিবে। সেই অভিপ্রায়ে কাশী পর্য্যন্ত ফিরিয়াছিল। যে

রাত্রিতে সে কাশীধামে উপস্থিত হয়, তাহারই ঊষায় বেড়াইতে বাহির হইয়া গঙ্গাতীরে কমলার সঙ্গে তাহার অকস্মাৎ দেখা হইয়া যায়। কমলার চরিত্র ও অপবাদ সম্বন্ধে তাহার তখনও যেটুকু সংশয় ছিল, তাহা কমলার মুখে 'হরদা'—শুনিয়াই স্থিরসিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছিল। সে সেই দিবসেই কলিকাতায় যাওয়ার সঙ্কল্প ও কাশীধাম ত্যাগ করিয়া আবার দেশে দেশে উদ্দেশ্যহীনভ্রমণে দিন কাটাইতেছিল।

বায়ুসঞ্চালিত বিচ্ছিন্ন মেঘমালার মধ্যে চন্দ্রের ক্ষণিক প্রকাশে, পৃথিবীর বক্ষে যেমন একটা ক্ষণে ক্ষণে বিলীয়মান আলো ও ছায়া-পরম্পরার সঞ্চারিভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, হরকুমারের প্রণয়াখ্যান শুনিবার পর হইতে, বিরাজের মুখেও সেইরূপ একটা ভাব লক্ষিত হইতেছিল। এক একবার যখন তাহার মনে হইতেছিল, "হরকুমারের এ আবেগপূর্ণ আখ্যান কল্পিত হইতে পারে না, কমলা অবিশ্বাসিনী নহে,"—তাহার মুখে একটা প্রফুল্লভাব আসিয়া পড়িতেছিল; আবার পরক্ষণেই যখন মনে করিতেছিল,—"তাহাই যদি হইবে তবে এতদিন সে এসব কথা পত্র লিখিয়া জানায় নাই কেন?"—তাহার মুখখানা গম্ভীর, আর যেন অন্ধকার হইয়া পড়িতেছিল।

বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে, অধোবদনে বসিয়া থাকিয়া হরকুমার ধীরে ধীরে মাথা তুলিল এবং অনুতপ্ত অপরাধীর মত দীননেত্রে বিরাজের পানে চাহিয়া, তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"আমাকে ক্ষমা করুন!—আমি তখন মানুষই ছিলাম না। যে মানুষ সে পশুর উপরে রাগ করে না।"

বিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার কাছে আপনার এ দীনতা কিসের জন্যে? আমি আপনার ওপরে রাগ করি নি।—আপনি ত জানেন, সে স্ত্রীকে আমি পরিত্যাগ ক'রেছি?—তবে যা যা ব'ল্লেন এ সবই যদি

সত্যি হয় তা হ'লে আপনি সমাজের চক্ষে নিন্দনীয় হ'য়েছেন, আর ধর্ম্মের কাছেও অপরাধী হ'য়েছেন। সে জন্যে যদি সত্যিই কা'রও ক্ষমা দরকার মনে ক'রে থাকেন, তা হ'লে সবার সব অপরাধের যিনি দণ্ডবিধাতা আর মার্জ্জনাকর্ত্তা তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রবেন। —তেমন কেউ যে আছেন তা বিশ্বাস করেন ত?"

হরকুমারের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। অবনতমস্তকে একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "পাপের আনন্দেই চিরদিন মগ্ন থাক্‌তাম, তেমন কারও কথা মনে করবার কখন অবসর হয় নি,— মনে করা যে দরকার তাও কখন মনে হয় নি। কিন্তু তেমন কেউ যে নেই তা কি ক'রে বল্‌ব?"—তারপর একটু থামিয়া বিরাজের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—"চক্ষুষ্মান্ কে এমন অন্ধ আছে,—চেতন কে এমন অচেতন আছে, যে তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে?—এ রবি-শশিশোভিত, তরু-গিরিসমন্বিত বিরাট্ সৃষ্টি কার?—তৃণ অঙ্কুরিত হয়, তরু-লতা পল্লবিত ও মুকুলিত হয়, ফুল ফোটে, ফল ফলে, মানুষ ঘুমায়—আবার জাগে,—এসব কে করে?—তেমন যদি কেউ নেই তবে পাপ কেন পুণ্যকে কলুষিত ক'র্‌তে পারে না?—দুরাচার পাষণ্ডের অন্তরেও কেন অনুতাপ উপস্থিত হয়?"

ট্রেণগাড়ীখানা সেই সময়ে একটা বিস্তৃত প্রান্তরের উপর দিয়া ছুটিতেছিল। পশ্চিমগগন সূর্য্যাস্তের লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। দিগন্তের নীল ও বক্র বনরেখার উপরিভাগে রক্তরবিবিম্ব যেন অস্তগিরিবনালীর ফুল্লমন্দার-স্তবকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। হরকুমার সেই জবাকুসুমসঙ্কাশ অস্তমান্ ভানুর তপ্তকনক-রশ্মিচ্ছটায় দীপিত দিগন্তের পানে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বিশ্বাত্মন্! তুমি নেই?—তুমি যদি নেই তবে এ বিশ্ব-প্রপঞ্চ কেন?—তুমি আছ তাই

এই দৃশ্যমান্ জগৎ!—তুমি আছ তাই আমি আছি!—এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের যেমন এই ক্ষুদ্র 'আমি'—ঐ মহতোপি মহীয়ান্ গ্রহজ্যোতিষ্ক-সমন্বিত বিরাট্ বিশ্বের তেমনি বিরাট্ 'তুমি'!—অন্তর্যামিন্!—আমার 'আমি'ও কি সেই 'তুমি' নও?"

ইহার পর কতক্ষণ চলিয়া গেল, কত দেশ, কত পথ অতিক্রান্ত হইল, উভয়ের মধ্যে কেহই তাহার হিসাব রাখিল না। ট্রেণখানা যেন লোহিতাক্ষ একটা কৃষ্ণকায় আহত ভুজঙ্গের ন্যায় ফণা তুলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিতেছিল। হরকুমার পূর্ব্ববৎ দূর দিগন্তে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া নীরবে বসিয়া ছিল। বিরাজও স্থিরদৃষ্টিতে শূন্যদেশে চাহিয়া মৌনভাবে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পরে একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীখানা থামিতেই বিরাজ নামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি এইখানেই নেমে যাচ্ছি,—নমস্কার!"

হরকুমার ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া যখন চাহিয়া দেখিল, বিরাজ তখন অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়াছে, প্রতিনমস্কারের অবসর পাইল না। ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

১০

দুঃখ মনুষ্যের চিরসঙ্গী। যে সকল দুঃখ দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও বজ্র-ঝটিকাদির মত যেন সাক্ষাৎ বিধাতার হস্ত হইতে নামিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়, সে সকল মানুষ নতশিরে বহন করিয়া থাকে; কিন্তু অদৃষ্টগত হইলেও যে সকল দুঃখ নিজের দোষে অথবা আত্মীয়-স্বজনের নির্দ্দয়তা বা দুর্ব্ব্যবহার জন্য বলিয়া প্রতীত হয়, সে সকল যেন বড়ই দুর্ভর ও দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয়।

বিরাজমোহন যেদিন 'কলঙ্কিনী' বলিয়াছিল, সেই দিন কমলার মনে হইয়াছিল, সংসারে থাকিবার তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই ; সেই দিন হইতেই সে দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তিল তিল করিয়া মরিতেছিল। সুধাংশু যেদিন তাহাকে বলিয়া গেল যে, তাহার শাশুড়ী টাকা খরচ করিয়া হীরালালের দ্বারা তাহার অসতীত্ববাদ প্রচার করাইয়াছেন, সেই দিন হইতেই সে যেন প্লুতগতিতে জীবনের অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া মরণের দিকে ছুটিতে লাগিল। প্রত্যহ তাহার যে সামান্য একটু জ্বরের মত হইত সেটাও ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণনাথ ভয় পাইয়া কমলার চিকিৎসার জন্য একজন বিচক্ষণ কবিরাজ নিযুক্ত করিলেন। কবিরাজের ঔষধে কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া, তিনি আবার একজন বহুদর্শী ডাক্তার ডাকিলেন। তাহাতেও কোন উপকার দেখা গেল না। কমলা ঔষধ খায় না ; নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে, ঔষধ মুখে করিয়া বমনের ছলে তাহা ফেলিয়া দেয় ; যখন কেহ থাকে না তখন ঔষধ ফেলিয়া দিয়া শিশিতে জল ঢালিয়া রাখে।

নীরদা, কমলা ও করুণা, তিনজনে এক শয্যাতে শয়ন করে। প্রতি প্রভাতে উঠিয়া করুণা কমলাকে জিজ্ঞাসা করে, "আজ কেমন আছ, দিদি ?"

কমলা বলে, "ভাল আছি।"

নীরদা বলে, "তুই বলিস্ 'ভাল আছি,'—ডাক্তার বাবুও বলেন, 'ভাল আছেন—কোন ভয় নেই' ; কিন্তু আমরা কেন তোকে ভাল দেখ্‌তে পাই না, কমলা ?"

কমলা হাসিয়া বলে, "তোমরা যে আমাকে ভালবাস, দিদি !"

মধ্যাহ্নে একদিন কমলা শয়ন করিয়া আছে। নীরদা ধীরে ধীরে পাখা

নাড়িয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে আর করুণা তাহার আলুলায়িত রুক্ষ কেশরাশির মধ্য দিয়া নিজের ছোট ছোট অঙ্গুলিগুলিকে চালনা করিতেছে। তিন জনেই নীরব।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইয়া কমল বলিল,—"কৈ ঠাকুরপো ত আজও এলেন না,—কোন খবরও দিলেন না! বোধ হয় তাঁর দেখা পান্ নি।—তাঁদের কারু সঙ্গে বোধ হয় আর এখানে দেখা হল না!"—এই কথা বলিয়া, আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

চুপ করিয়া একটু শুইয়া থাকিয়াই আবার পাশ ফিরিয়া কমলা উপাধান-তল হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বলিল, "এ চিঠিখানা তা হ'লে, করুণা, তোর কাছেই রেখে দে, বোন্! যা ব'লেছি—যদি ম'রে যাই, হেমন্তকে দিয়ে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়ে ডাকে ফেলিয়ে দেওয়াস্!—আর যদি বেঁচে উঠি ত তার দরকারই হবে না।"

শেষ কথাটা বলিয়া কমলা ম্লানমুখে একটু হাসিয়া পত্রখানা করুণার কাছে রাখিয়া দিল।

করুণা কাঁদ কাঁদ হইয়া,—"আমি এ চিঠি রাখ্‌তে চাই না"—বলিয়া সেখানাকে কমলাকে ফিরাইয়া দিল, এবং চোখে আঁচল চাপা দিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কমলা নিজের শীর্ণ বাহুখানিতে করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখখানিকে নিজের বুকের উপরে টানিয়া লইল এবং তাহার চুলের উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কাঁদিস্ নি, করুণা!—কেন কাঁদিস্?—আমার কি মরণ আছে রে পাগল?"

নীরদাও আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "না—আমি এ জাল

বুঝ্‌ছি না, করুণা!—তুই বাবাকে বল্‌, তিনি আরও ভাল একজন ডাক্তার আনুন!"

কমলার ম্লান মুখে আবার একটু মৃদু হাসি দূরদিগন্তের শুভ্রমেঘবক্ষে ক্ষীণ বিদ্যুদ্‌ভাতির মত চকিতে একবার দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বলিল,—"না, করুণা! বাবাকে আর মিছে ভাবাস্‌ নি! —ধন্বন্তরি এলেও আমাকে বাঁচাতে পারবে না; আমার আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছে নেই!"

নীরদাও এইবার প্রকাশ্যভাবেই করুণার সঙ্গে রোদনে যোগদান করিল। তাহাদের দুইজনকেই কাঁদিতে দেখিয়া কমলা বলিল, "তুমিও কি করুণার মত পাগল হ'লে, দিদি?" তারপর সে নিজেও আর কথা কহিতে পারিল না। বাষ্পরাশি তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

একটু পরে যেন বহুপথ ছুটিয়া আসিয়াছে এমনি ভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কমলা বলিল,—"কাঁদিস্‌ নি, করুণা!—কেঁদ না, দিদি! তোমাদের কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে আমার প্রাণের ভেতরে যে কি হয় তা ব'ল্‌তে পারি না। আমি যে আর কাঁদ্‌তে পারি না।"—এই বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

নীরদা। তবে আর অমন কথা বল্‌বি না বল্‌!

কমলা। ব'ল্‌লে যদি তোমরা দুঃখু পাও তবে আর ব'ল্‌ব না।

কিছুক্ষণ পরে নীরদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"এ যেন তুই ইচ্ছে ক'রেই চ'লে যাচ্ছিস্‌, বোন্‌!—আচ্ছা, তেমন সোয়ামী, এমন লক্ষ্মণের মত দেওর, সাজান সংসার, সব ফেলে এই বয়েসে এমন ক'রে সবাইকে কাঁদিয়ে চ'লে যেতে তোর কি একটুও মন কেমন করে না, কমলা?"

কমলা। কেন মন কেমন ক'রবে, দিদি? ম'লে যার সুখ ফুরিয়ে

না খাবে, সেই মরণের নামে চমকে ওঠে,—সংসার ছাড়তে চায় না ; কিন্তু ম'লেই যার সব দুঃখ, সব জ্বালা-যন্ত্রণা ফুরিয়ে যাবে, তার কি ম'রতে মন কেমন করে ? বাঁচ্‌তে আমার আর এক তিলও ইচ্ছে নেই, দিদি,—বাঁচ্‌তে যেন আমি আর পারি না !

নীরদা। কেন ?—এখন ত তোর সুখের দিন ফিরে আস্‌ছে, বোন্ ! দুঃখের দিনে বেঁচে আস্‌তে পেরেছিস্, আর এখন বাঁচ্‌তে চাস্ না কেন ?—আমাদের কাঁদাবি ব'লে ?

নীরদা আবার চক্ষে আঁচল চাপিয়া ধরিল।

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "সুখের লুকোচুরি এই জীবনে অনেক দেখেছি, দিদি,—অভাগীদের কাছে সুখ ঘেঁস্‌তে চায় না। শুধু দুঃখের বোঝা বইতে কে বেঁচে থাকৃতে চায়—বল দেখি ?—অনেকদিন ধ'রে অনেক দুঃখের বোঝা ব'য়ে, অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা পেয়ে, প্রাণ যখন বড় কাতর—বড় অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন কার জুড়োবার ইচ্ছে হয় না, বোন্ ?—কিন্তু সংসার ত জুড়োবার ঠাঁই নয়, চিতায় গিয়ে না শু'তে পারলে আর জুড়ন হয় না।"

করুণা একবার কান্না বন্ধ করিয়া, আর্দ্র নয়ন দুইটিকে কমলার দিকে ফিরাইয়া কম্পিতকণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিল, "এ সব কথা আর ব'লো না, দিদি, তোমার পায়ে পড়ি !—আচ্ছা—মরণের নামে কি তোমার একটু ভয়ও হয় না ?"

কমলার বিশীর্ণ ওষ্ঠে আবার একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে করুণার দিকে মুখটি একটু ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি—এমনি সরল, শাদা মনটি নিয়েই যেন তোর জীবন কাটে,—সংসার কি, দুঃখ কি, তা যেন কখন বুঝ্‌তে না হয় !"—এই কথা

বলিয়া, একটু থামিয়া গম্ভীরভাবে আবার বলিল,"মরণের মূর্ত্তি দু' রকমের, করুণা !—সুখেই যাদের জীবন কেটে এসেছে, দুঃখ কি—কখন বুঝ্তে পারে নি, তারা মরণের যে মূর্ত্তি দেখ্তে পায়, তা বড় ভয়ানক! তার জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালসার শরীর থেকে একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, পচা মাংস খ'সে খ'সে প'ড়ছে, পোকা ন'ড়ে বেড়াচ্ছে ;—তার পোড়া কড়ির মত চোখের চাউনি দেখ্লেই প্রাণ শুকিয়ে যায়, সেচোখে সে যা দেখে তাই পুড়ে যায়, তার গায়ের বাতাসে, যা কিছু সুন্দর—সব কুৎসিত হ'য়ে যায় !—কিন্তু মরণের আরও একটি মূর্ত্তি আছে, তা বড়ই সুন্দর! যারা চিরদুঃখী—যাদের সুখের বড় কুঁড়িটিও ফোট ফোট হ'য়ে পোড়া অদৃষ্টের তাপে শুকিয়ে ঝ'রে গেছে—দুঃখের জ্বালায় ভাজা ভাজা হ'য়ে বেঁচে আছে, তারা মরণের সেই মনোহর মূর্ত্তি দেখ্তে পায় ; তাতে তার চাউনি থেকে করুণা ঝ'রে পড়্ছে, কোমল মুখখানি মমতামাখা, বিশ্রাম আর সান্ত্বনা দিতে, শান্তি-ভরা শীতল কোলে দুঃখীদের তুলে নেবার জন্যে কোমল দু'খানি হাত বাড়িয়ে র'য়েছে !"

করুণা যেভাবে চাহিয়া রহিল, তাহাতে বোধ হয় না যে, সে কমলার কথা কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। নীরদা বলিল, "সত্যি, বোন !—আমরাও অভাগী বটে, কিন্তু তোর দুঃখে যেন বুক ফেটে যায়! আহা—সব থেকেও কিছুই নেই !"—এই বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

কমলা। আমার দুঃখে দুঃখু ক'রো না, দিদি !—দুঃখে কেউ দুঃখু জানালে, সে দুঃখু যেন আর সওয়া যায় না। বল যে—আমার দুঃখু কিছুই নয়, এর চেয়েও অনেক ভারী দুঃখের বোঝা নিয়ে অনেক অভাগী সংসারে এসেছিল, সারা জীবনটা দুঃখের জ্বালায় জ'লে পুড়ে

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চ'লে গেছে।—কম্পিতকণ্ঠে এই কথা বলিয়া, একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কমলা চক্ষু মুদ্রিত করিল। দুই বিন্দু অশ্রু তাহার চোখের কোণে আসিয়া বসিয়া রহিল—গড়াইয়া পড়িল না। নিরন্তর কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার অশ্রু-ভাণ্ডার কি শূন্য হইয়া গিয়াছিল ?

কমলা ঘুমাইল ভাবিয়া করুণা ধীরে ধীরে কৃষ্ণনাথের নিকটে উঠিয়া গেল। নীরদাও অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময়ে হেমন্ত সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "নীর-দিদি! সুধাংশু বাবু নতুন-দিদির শ্বশুরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, আর একজন্ কে এসেছেন—তিনি না কি দিদির বড় মা! করুণা তাঁকে সঙ্গে ক'রে ওপরে নিয়ে আস্‌ছে!"

হেমন্তের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, করুণার হাতটি ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে তরঙ্গিণী একবারে কমলার শয্যার উপরে আসিয়া ঝুঁকিয়া বসিয়া পড়িল এবং দুই বাহুতে কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া কি বলিতে যাইতেছিল তাহা আর বলিতে পারিল না, অশ্রুর প্রবাহে তাহার কথা ভাসিয়া গেল!

কমলাও তরঙ্গিণীকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে অশ্রু-মোচন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষে যে তখনও তত অশ্রু সঞ্চিত ছিল—কে জানিত? দুই জনেই মৌন;—দুইটি হৃদয়ের বহুদিনের সঞ্চিত বিষাদ-কাহিনী অবিরাম নীরব-অশ্রুতে বিগলিত হইতে লাগিল।

নীরদা ও করুণা নীরবে দাঁড়াইয়া বিষাদ-বিজড়িত-হৃদয়ে সাশ্রুনেত্রে উভয়ের অশ্রুবর্ষণ দেখিতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড

শৈশব হইতে কখনও যাহাদের কোন ইচ্ছা বিফল হয় নাই, কোন উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই, সব ইচ্ছা অনায়াসে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সৌভাগ্য অযাচিতভাবে সুখ ও সম্পদ্ বিতরণ করিয়া আসিয়াছে, আত্মশক্তির উপরে তাহাদের ভারী একটা নির্ভর থাকে। অদৃষ্ট বা দৈব বলিয়া তাহারা কিছুই মানিতে চাহে না, কেবল পুরুষাকারকেই পূজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে; কিন্তু নৈরাশ্য ও অকৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের আত্মনির্ভরের উপরে একটা সংশয় ও অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে।

নীলকমলের ধারণা ছিল, তাঁহার বুদ্ধি অভ্রান্ত, কৌশল অব্যর্থ, শক্তি অপ্রতিহত; কিন্তু বিরাজমোহনের নিরুদ্দেশ ও কমলার অজ্ঞাতবাসের কথা প্রকাশ হওয়া হইতেই তাঁহার সে ধারণায় একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। শুধু পরের কাছে নহে—আপনার কাছেও তিনি যেন অনেক ছোট হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পূর্ব্বের সে তেজ ও দাম্ভিকতা হারাইয়া যেন কাপুরুষ হইয়া পড়িতেছিলেন। পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার নিকটে কথা কহিতে সাহস করিত না, তাহারাও এখন তাঁহার মুখের উপরেই কত অপমানের কথা বলিয়া থাকে। গৌরীনাথের সম্পত্তি যেন ছায়ার মত তাঁহার মুষ্টিসংগ্রহ হইতে সরিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজের সম্পত্তির আয়ও অনেক দিকে অনেক কমিয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষুদ্র শত্রু মাথা তুলিয়াছে। সময়টা বিরুদ্ধ বুঝিয়া তিনি খরচপত্র অনেক দিকে অনেক কমাইতেছিলেন; কিন্তু কমলার মাসহরাটি ঠিক সময়ে চূড়ামণির হাতে পৌঁছাইয়া দিতে

একটি দিনও বিলম্ব করিতেন না। সময়ে সময়ে তাঁহার মনের মধ্যে কেমন একটা রাগ উপস্থিত হয়, কিন্তু কাহার উপরে রাগ করিয়া কি করিবেন তাহা ভাবিয়া পান না। বালক রাগের বশে খেলনা ভাঙ্গিয়া যেমন ফুটিয়া কাঁদিতে পারে না, ভাঙ্গা খেলনার দিকে চাহিয়া রাগে ও দুঃখে ফুলিতে থাকে, তাঁহার মনের অবস্থাটাও যেন কতকটা সেই রকমের হইয়া পড়িয়াছিল।

তরঙ্গিণীর পত্রে বাড়ী ফিরিয়া সুধাংশু যখন চূড়ামণিকে লইয়া কমলার সন্ধানে বাহির হয়, তখন সে রাগ করিয়া নীলকমলকে গোটাকতক বড় কড়া কথা শুনাইয়া গিয়াছিল। সে কথাগুলিও সময়ে সময়ে তাঁহাকে কিছু অপ্রকৃতিস্থ করিয়া থাকে। সুধাংশুর স্বভাবের কথা ভাবিয়া নিদ্রাতেও তিনি নির্ভয় হইতে পারেন না; চক্ষু মুদিলেই স্বপ্ন দেখেন, যেন সে একটা পিস্তল লইয়া তাঁহাকে গুলি মারিতে আসিতেছে!

মধ্যাহ্নে একদিন নীলকমল অন্তঃপুরে বসিয়া তামাকু টানিতে টানিতে কি চিন্তা করিতেছিলেন। কাত্যায়নীও সেই ঘরে কি একটা কাজ লইয়া বসিয়া ছিলেন। সেই সময়ে সুধাংশু অকস্মাৎ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কাহারও অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই নীলকমলের আসনের একধারে বসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া নীলকমলের মুখখানা ম্লান হইয়া গেল, আর কাত্যায়নীর মুখের উপরে যেন সন্ধ্যার মেঘ নামিয়া আসিল।

নীলকমল চকিতে একবার সুধাংশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার মনে কি ভাবিতে ভাবিতে তামাকু টানিতে লাগিলেন। সুধাংশুর মুখের ভাবে কিন্তু তাঁহার এমনটা বোধ হইল না যে, সে প্রতিশোধের রুদ্রমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছে; বরং মনে হইল, তাহার এ অভিযানের অভিপ্রায় বিগ্রহই

নহে—সন্ধি। তিনি তামাকু-টানাটা একবার বন্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আস্‌ছ ?"

কাত্যায়নী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া স্বর টানিয়া টানিয়া বলিলেন, "আমার বউ-ব্যাটাকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই আর যাই করি, তাতে পাঁচজনের এত মাথা-ব্যাথা কিসের ?—পাঁচজনের কাছে তার জন্যে এত তর্জ্জন-গর্জ্জনই বা কেন ? কারু বাপের বিষয় ত আর কেউ খেয়ে ফেলে নি—বুঝে নিলেই ত চুকে যায় ।"

সুধাংশু নীলকমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাপের বিষয় বুঝে নেবার কথা কি হ'য়েছে, কাকা বাবু ?"—

নীলকমল চক্ষু বুজিয়া তামাকু টানিতে লাগিলেন—কোন উত্তর করিলেন না।

সুধাংশু বলিল, "বাবার বিষয় কি আছে না আছে—জানি না, জান্‌বার কখন ইচ্ছেও হয় নি। এই শরীরই আমার পৈতৃক সম্পত্তি, খাটালেই আমার জীবন বেশ কেটে যাবে। বাপের অন্য সম্পত্তি যদি কিছু থাকে আমি তা চাই না, আপনি যাকে ইচ্ছে হয় বিলিয়ে দিন্—গঙ্গার জলে ফেলে দিন্ ! কখনো জিগ্‌গেসাও ক'রতে আস্‌ব না, কাকে দিয়েছেন—কি ক'রেছেন।—এখন যে বিষয়ের জন্যে এসেছি একটু মন দিয়ে শুন্‌বেন ?"

নীলকমল সুধাংশুর মুখের দিকে চাহিলেন। সুধাংশু কমলার প্রবাস সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল—সব বলিতে আরম্ভ করিল।

নীলকমল নতমস্তকে বসিয়া ধীরে ধীরে তামাকু টানিতে টানিতে সুধাংশুর কথা শুনিতেছিলেন আর বামহস্তে সম্মুখের চুলগুলিকে

মুঠা করিয়া ধরিয়া, একটু টানিয়া ছাড়িয়া দিতেছিলেন। চূড়ামণির আচরণ ও হরকুমারের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার দীর্ঘ-লোমযুক্ত ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, আর সমস্ত মুখখানা যেন কুপিত-কপি-কপোলের ন্যায় তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। এক-মুঠা চুল ধরিয়া এমন টান দিলেন যে, অনেকগুলি চুল মুঠার ভিতরে উঠিয়া আসিল। গম্ভীরস্বরে চাকরকে ডাকিয়া তামাকু আনিতে বলিয়া, তিনি তাকিয়াটা কোলের উপরে তুলিয়া লইলেন এবং ঝুঁকিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

সুধাংশু বলিল, "তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে আমি অনেক সেধেছিনু। আপনি তাঁকে কি সত্যের বাঁধনে বেঁধে রেখেছেন—জানি না, আপনি না গেলে আর কারও কথাতেই তিনি আস্‌বেন না।"

কাত্যায়নী এতক্ষণ ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়াছিলেন, কমলাকে ফিরাইয়া আনিবার কথা হইতেছে শুনিয়াই তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন, "তাই ত—এত আর নয়?—যে বউ একবার ঘরের বা'র হ'য়ে গেছে, তাকে আবার ফিরিয়ে আন্‌তে হবে না কি?—নোকে মুখ পুড়িয়ে দেবে না?"

সুধাংশু। মুখ পোড়বার যে আর কি বাকী আছে তা ত দেখ্‌তে পাই না! সে ভয় আর নেই, কাকী-মা! মিথ্যের জয় ক'দিন?—শেষ-জয় সত্যের। মিথ্যে বা অপকর্ম্ম যে যতই লুকিয়ে করুক, তা বেশী দিন চাপা থাকে না। সত্যিটা এখন সকলেই বুঝে নিয়েছে। এখন লোকে কি বলে তা শুন্‌তে পাও কি?

কাত্যায়নী মুখখানাকে ঘুরাইয়া—"নোকে অমন সব বলে গো—তখন আবার কি বলে তা শুনো তখন"—বলিয়া, সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কাত্যায়নী চলিয়া গেলে, নীলকমল একটু গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি বুঝ্‌তে পারছ না, সুধাংশু!—সহসাই এখন কিছু করাটা ভাল হবে না।"

সুধাংশু। আমি না হয় বুঝ্‌তেই পার্‌ছি না; কিন্তু আপনি একবার বুঝে দেখুন দেখি, সংসার কি ছিল—কি হ'য়েছে, আপনি কি ছিলেন—কি হ'য়েছেন! যে পুত্রভাগ্যের জন্যে সকলে আপনার ঈর্ষা ক'রত, সেই পুত্র আজ আপনার অবাধ্য হ'য়ে, উদাসীনের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আপনার যে পুত্রবধূকে সূর্য্য অবধিও দেখ্‌তে পেত না, তিনি কি না আজ অনাথার মত পথে ঘাটে প'ড়ে থাকেন—পরের আশ্রয়ে, পরের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর ক'রে, প্রবাসে দুঃখের জীবন যাপন ক'রছেন। এসব কেন, কার জন্যে—তা কি আজও বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? না—বুঝে আজও তার প্রতিকার ক'রতে যত্ন ক'রবেন না? এখনও কি আপনি মনে ক'রেছেন, দাদা আবার বিয়ে ক'রে সংসারী হবেন? বউদিদি যদি মনের দুঃখে বিদেশেই প্রাণত্যাগ করেন, দাদা কি আর বাড়ীর দিকে মুখ ফেরাবেন? বাড়ীতে কে থাক্‌বে? আপনার কত সাধের সাজান সংসার উচ্ছন্নে যেতে ব'সেছে! আপনার এই এত যত্নের বাড়ীতে সন্ধ্যের দীপ জ্ব'ল্‌বে না—ভূতের বাসা হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বে! কত যত্নে যে বিষয় ক'রেছেন, তাও পরে ভোগ ক'রবে! এখনও উপায় আছে;—আপনি ইচ্ছে ক'রলেই এখনও আবার সবই হয়—আরও কি আপনি উদাসীন থাক্‌বেন?

নীলকমল পুনর্ব্বার চাকরকে তামাকু দিতে বলিয়া সুধাংশুকে বলিলেন, "তুমি এখন ওপরে যাও! আমি একটু ভেবে দেখি—কি ক'রলে ভাল হয়।"

সুধাংশু নীলকমলের পা দুইটিকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া, দীনদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বাষ্পজড়িত কাতরকণ্ঠে বলিল, "না—কাকাবাবু! ভেবে আর কি দেখ্‌বেন? ভাব্‌বার আর কিছু নেই, আর তার

সময়ও নেই। আমি বউদিদির যে অবস্থা দেখে এসেছি তাতে এতদিন তিনি বেঁচে আছেন কি না তাই সংশয়!—কাকাবাবু! আমার এই অনুরোধটি রাখুন! আপনার স্নেহে এতবড় হ'য়েছি, কখন কিছু চাই নি,—আর কখন কিছু চাইবও না; আমার এই ভিক্ষেই শেষ—রাখুন!"

বাষ্পাবেগে সুধাংশুর কণ্ঠরোধ হইল। নীলকমল চাহিয়া দেখিলেন, তাহার আরক্ত নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রু বিগলিত হইয়া গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছে! শৈশবেও কখন যাহাকে কাঁদিতে দেখেন নাই, তাহার এই অভূতপূর্ব্ব দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহার পাষাণ-প্রাণও বুঝি গল গল হইয়া উঠিল। অন্যদিকে চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "তবে রায়কে একবার ডেকে দাও!"

রায়মহাশয় যৌবনের প্রারম্ভেই নীলকমলের সেরেস্তায় নকল-নবীস্ হইয়া প্রবেশ করেন। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং প্রধান কর্ম্ম-চারীর পদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার একটা নাম অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাহার কোন ব্যবহার ছিল না; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকটেই তিনি হয় 'রায়মহাশয়' অথবা শুধু 'রায়'। আমরা তাঁহাকে 'রায়মহাশয়'ই বলিব।

রায়মহাশয় আপনিই আপনার পরিচয়। বাড়ীর কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এমন একটা স্থানের নাম করেন, যেখানে সকলকেই যাইতে হইবে অথচ কেহই যাইতে ইচ্ছা করে না। সন্তানাদির কথায় বলিয়া থাকেন—"অনেকগুলি"—কিন্তু বিবাহের কথায় বলেন—"হয় নি—এইবার হবে" এবং সেই প্রসঙ্গে বাড়ীর নিকটের একটা মুড়া গাছেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। বেশ-বিন্যাসের দিকে তাঁহার মোটেই দৃষ্টি নাই,—কখন ফরসা কাপড়ের উপরে ময়লা উড়নী, কখন ঠিক তাহার বিপরীত,

উভয়ের মিল কখনই দেখা যায় না। একটি পিরাণ ছিল—তাহার প্রাচীনতা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয়;—তালি ও সেলাই প্রভৃতিতে তাহার মূল কাপড়টা যে কি ছিল তাহা আর বুঝা যায় না। বহু-তালিসুশোভিত বহুদিনের একজোড়া চটী-জুতা ছিল; তপ্ততৈলে কৈ-মাছ পড়িলে যেমন হয় তাহার অবস্থাটাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। বাঁট্-ভাঙ্গা ও সিক-ভাঙ্গা ছাতার কাপড়েও শাদা, কালো, ছোট, বড়, অন্যূন দশগণ্ডা তালি, আর তাহার মাঝে মাঝে মোটা সূতায় তাঁহার স্বহস্তের মোটা মোটা দাঁড়া-সেলাই। দুইদিকেই সূতা-বাঁধা চশমা-খানিতে কেহ কখন দুইখানি কাচ দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারে না। এদিকে যাহাই হউক, অন্যদিকে তাঁহার খরচ ছিল। নূতন জিনিস কিছু উঠিলেই—দাম যতই হউক, আগে কিনিয়া পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ডাকিয়া খাওয়াইয়া থাকেন, গরীব-দুঃখীকে কখনও শুধু হাতে ফিরিতে দেন না এবং নীলকমল যে সকল দরিদ্র প্রজার অর্থদণ্ড করেন, রায়মহাশয় নিজের মাহিনা-হিসাবে খরচ লিখিয়া সরকারী তহবিলে তাহা আদায় দেখাইয়া থাকেন। জীবনের প্রভাতে কি দুঃখ বা দুর্ঘটনা তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছিল, সে রহস্য তিনি কখন প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার অন্তরে যে একটা মহা দুঃখ লুকাইয়া বাস করিত, তাঁহার মুখের ভাবে তাহা ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার মুখে কখন বেশ সরল হাসি দেখা যায় না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাও শুনা যায় না। লোকে এই সকল কারণে তাঁহাকে পাগল বলিয়া থাকে। নীলকমল কিন্তু তাঁহাকে বড় ভালবাসেন, খুবই বিশ্বাস করেন।

রায়মহাশয়ের উপরে কতকগুলি দুরূহ কার্য্যের ভার অর্পণ

করিয়া—সুধাংশু ও তরঙ্গিণীর সমভিব্যাহারে নীলকমল কাশী-যাত্রা করিয়াছেন।

২

নীলকমল যে দিন কাশী-যাত্রা করেন, সেই দিনেই সন্ধ্যার সময়ে কাত্যায়নী নিজের গহনা, কাপড় ও লুকান টাকা-কড়ি যাহা ছিল,—সব গুছাইয়া লইয়া রায়মহাশয়কে বাড়ীর ভিতরে ডাকাইলেন। রায়মহাশয় আসিলে, তাঁহার সম্মুখে একগোছা চাবি ফেলিয়া দিয়া কাত্যায়নী গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "এই চাবি-চাব্‌লা সব রইল—কত্তা এলে বুঝিয়ে দিও!"

রায়মহাশয় চোখদুটিকে বড় বড় করিয়া কাত্যায়নীর দিকে চাহিয়া, মাথা নীচু করিয়া বলিলেন, "বাড়ীতে তা হ'লে দেখ্‌ছি আর কেউই থাক্‌ছেন না!"

কাত্যায়নী ঝঙ্কার করিয়া উঠিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "আমাকেই চেরকালটা ভিটে কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাক্‌তে হবে—কেন বল দেখি? যার যেথা ইচ্ছে যেতে পারে—আমার বুঝি আর কোন চুলোয় ঠাঁই নেই?"

রায়মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চাবির গোছাটি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন। কাত্যায়নীও অভিমানের অশ্রু মুছিতে মুছিতে মোহিনীকে ডাকিয়া লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

বাড়ীতে শুধু রায়মহাশয় রহিলেন, আর দুই তিনজন দাসীচাকর মাত্র রহিল। তিনি তাহাদের খুব খাটাইতে আরম্ভ করিলেন। মাজা বাসনগুলিকেও আবার মাজাইয়া ঝক্‌ঝকে করাইয়া লইলেন। ঘর, উঠান প্রভৃতি ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া জিনিসপত্রগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া বাড়ীখানিকে যেন উৎসব-দিনের উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন। তিনি

নিজেও যেন কি একটা সুচিরবাঞ্ছিত উৎসবের আনন্দ ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন—অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার জরাকুঞ্চিত, চিরম্রিয়মাণ মুখখানিতে শ্মশানে জ্যোৎস্নার মত একটু হাসিও ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি গৃহের প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে পূজাদি পর্ব্বদিনের মত তুইটা সপল্লব ঘটও বসাইয়া দিলেন। একার্য্যটায় অবশ্যই অনেকে তাঁহার প্রচ্ছন্ন বায়ুরোগের পরিচয় মাত্র পাইলেন; কিন্তু তুই তিনদিন পূর্ব্বে চূড়ামণির গৃহে যে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে—যাহার ফলে তিনি সস্ত্রীক দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার ভিতরের কথাটা যদি প্রকাশ হইত তাহা হইলে আর কেহই বোধ হয় তাঁহাকে পাগল ভাবিতে পারিতেন না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একদিন রায়মহাশয় বসিয়া একমনে খাতা লিখিতেছেন এমন সময়ে এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—বিরাজ আসিতেছে। সম্ভ্রমে রায়মহাশয়ের বিভ্রম উপস্থিত হইল। চটী-জুতার একপাটী দেখিতে পাইলেন না, একপায়ে জুতা ও একপায়ে খড়ম পরিয়া কলমটা কাণে ও চশমাখানা হাতে করিয়াই বাহিরে ছুটিয়া গেলেন।

বিরাজ প্রবেশদ্বারে পদার্পণ করিয়াই উভয় পার্শ্বে ঘট দেখিয়া রায়মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল "এসব কি জন্যে, রায়?"

রায়মহাশয় কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। বিরাজ তুই একপদ অগ্রসর হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সুধা বাড়ীতে এসেছে নয়?"

রায় মহাশয় উত্তর করিবার মত কিছু পাইয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু উত্তর লইয়াও আরার মহাবিভ্রাটে পড়িলেন; প্রথমে বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ"; কিন্তু পরক্ষণেই বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, উত্তরটা

ঠিক হইল না, তখনই আবার বলিলেন, "আজ্ঞে না"। এ উত্তরটাও ঠিক হইল না ভাবিয়া আবার কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই বিরাজ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কোন্‌টা ঠিক্ ?"

রায়। এসেছিলেন—আবার গেছেন।

বিরাজ। কোথা গেছে কিছু জান ?

রায়। কাশীতে।

বিরাজ। বাবা কি বাড়ীর ভিতরে ?

রায়। তিনিও যে ছোট বাবুর সঙ্গে গেছেন।

বিরাজ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল; তখনই আবার বাহিরে আসিয়া রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথা—তিনিও গেছেন না কি ?"

রায়মহাশয় জেরার ভয়ে একথাটার উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বিরাজ তাহাতে কি বুঝিল বলা যায় না, সে স্তব্ধভাবে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া, একটু বড় গোছের একটা 'হুঁ' বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘট বসালে কে ?"

রায়মহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল। একার্য্যটার যে একবারেই কোন প্রয়োজন ছিল না, পূর্ব্বে তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বিরাজ তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তীব্রস্বরে বলিল "তোমার বায়ু-রোগটা কিছু প্রবল হ'য়ে উঠেছে—নয় ?"—এই বলিয়াই পদাঘাতে রায়-মহাশয়ের সযত্নসংস্থাপিত চূতপল্লবসনাথ মঙ্গল-ঘটদ্বয়কে ভগ্ন করিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। রায়মহাশয়ের হাত হইতে চশমা-খানি ভূতলে পড়িয়া গিয়া তাহার অবশিষ্ট কাচখানিও ফাটিয়া গেল।

* * * *

হাতে কাজ না থাকিলেই ভাবনা বাড়ে বলিয়া হীরালাল নিজের সদরে একটা পাঠশালার মত করিয়াছিল। তাহাতে সে যথেষ্ট কাজ পায়, কিছু কিছু টাকাও পায়; এখন সন্ধ্যার সময়ে অবকাশ পাইয়া, পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র মিহিরকে হাত ধরিয়া লইয়া বাড়ীর সম্মুখে বেড়াইতেছিল।

সন্ধ্যা-গগনে এক একটি করিয়া নক্ষত্র প্রকাশ পাইতেছিল। মিহির আকাশের দিকে চাহিয়া বাপের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল আর আঙ্গুল বাড়াইয়া—"ঐ এক-টা"—"দু-টো"—করিয়া তারা গণিতেছিল। তারকাগুলি যখন তাহার সংখ্যা-জ্ঞানের অতিরিক্ত হইয়া উঠিল, তখন সে চিন্তামগ্ন হীরালালকে "ঐগুলি কি, বাবা"—"ওখানে কেন"—"কে রেখেছে"—"কি ক'রে অমন শূন্যে রেখেছে"—"দিনের বেলা কোথা থাকে"—ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া তাহার চিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। হীরালাল মাঝে মাঝে তাহার কথায় এক একটা কথা কহিতেছিল, আবার নিজের চিন্তায় হারাইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সহসা কে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিল। হীরালাল চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল—বিরাজমোহন!

অনেক দিন পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে—এমন কাহাকেও সহসা সম্মুখে দেখিয়া লোকে যেমন অবাক্ হইয়া থাকে, বিরাজকে দেখিয়া হীরালালও সেইরূপ হইয়া গেল। বিরাজ যে এমন হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পড়িল, আকাশ হইতেই পতিত হইল—কি ভূমি ভেদ করিয়াই উত্থিত হইল, তাহা যেন সে বুঝিতেই পারিতেছিল না।

বিরাজ যে মৃত নহে—জীবিত এবং সশরীরে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, এই সহজ কথাটা বুঝিতেই হীরালালের অনেকক্ষণ

লাগিল। বুঝিবার পর কিন্তু তাহার মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। নিমেষে তাহার বাহুদ্বয়ে বিরাজের কণ্ঠদেশ আশ্লিষ্ট হইল। প্রিয়সম্ভাষণের জন্য তাহার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইয়া উঠিল; কিন্তু অকস্মাৎ আবার কি মনে হইয়া তাহার সে প্রফুল্লতা তখনই নিভিয়া গেল। গাঢ় বাহুবেষ্টন শিথিল হইয়া গেল। বাহুদ্বয় দেহপার্শ্বে বিলম্বিত হইয়া পড়িল। স্ফুরিতোন্মুখ ওষ্ঠাধর মৌনাবলম্বন করিল। মস্তক নত হইয়া পড়িল।

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা সকলে ভাল আছ ত, হীরুদা?"

হীরালাল ঘাড়টি ঈষৎ একটু হেলাইয়া বিষণ্নমুখে, অবনতমস্তকে বলিল—"হুঁ"।

বিরাজ। ব্যাপারটা কি বল দেখি!—বাড়ীতে ত দেখে এলুম—কেউই নেই! বড়বউঠাক্‌রুণও কাশীতে গেছেন না কি?

হীরালাল আবার সেই রকমের একটি ছোট 'হুঁ' বলিয়া নীরব হইল।

বিরাজ একটু হাসিয়া বলিল, "রায় দেখ্‌ছি তা হ'লে একাই পাগল নয়!"

হীরালাল মিহিরকে বাড়ী যাইতে বলিয়া, বিরাজের হাত ধরিয়া বলিল, "এই দিকে একটু বেড়াইগে—এস!—অনেক কথা আছে।"

হীরালালের পশ্চাতে চলিতে চলিতে বিরাজ ভাবিতে লাগিল, "হীরুদার সে 'অনেক কথা' কি?—তাহা কি পঞ্চমবর্ষীয় মিহিরের শুনিবার অযোগ্য-বাড়ীর নিকটেও দাঁড়াইয়া বলিবার মত নহে?"

নীলকমলের সদরপুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের উপরে আসিয়া দুইজনে বসিল। প্রদোষ-তিমিরাবৃত সেই নির্জ্জন সরস্তটে, নক্ষত্রমণ্ডিত মুক্ত গগনের তলে বসিয়া হীরালাল লজ্জাজড়িতস্বরে অনুচ্চকণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় কমলার প্রথম বাপের বাড়ী যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া,

তাহার অপবাদ ও অজ্ঞাতবাস এবং প্রবাসে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সে যাহা জানিত এবং তাহাতে সে নিজেও যাহা যাহা করিয়াছে—সব বলিতে আরম্ভ করিল।

সমস্ত শুনিয়া বিরাজ কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরে তখন এমন একটা আলোড়ন চলিতেছিল যাহা সাগর-মন্থনেরই অনুরূপ। সে আলোড়নের ফলে অতীতের সমস্ত বিস্মৃত স্মৃতি ভাসিয়া উঠিয়া আবর্ত্তে আবর্ত্তে তাহার মনের উপরে ঘুরিতে লাগিল। সেই জ্যোৎস্না রজনীতে কমলার উদ্দেশে গমন হইতে আরম্ভ করিয়া,—তাহার অদর্শন, অন্বেষণ, অনঙ্গের রোদন, চূড়ামণির কপটাচরণ, গভীর নিশীথে নির্জ্জন প্রান্তর-পথে সেই প্রত্যাবর্ত্তন, পরদিনে যামিনী ও হীরালাল প্রভৃতির কথোপকথন এবং সর্ব্বশেষে কাশীতলবাহিনী গঙ্গার পাষাণ-সোপানে কমলার মূর্চ্ছা-পতন পর্য্যন্ত—সমস্ত ঘটনা একে একে পরে পরে যেন 'চঞ্চলচিত্র'-নিবদ্ধ দৃশ্যাবলীর মত তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া চলিতেছিল। তখন বিরাজ বুঝিতে পারিল, কেন কমলা তাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং গিয়াও কেন তাহাকে পত্র দেয় নাই। মূর্চ্ছিতের মত নিশ্চলাঙ্গে বসিয়া বহুক্ষণ চিন্তার পর সশব্দে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তার বাপ্ ত তোমার কিছুই কেড়ে নেন্ নি, হীরুদা! তবে তার এ সর্ব্বনাশে তুমি কেন যোগ দিয়েছিলে?"

হীরালাল নীরব—অধোবদন। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে সেই প্রদোষের অন্ধকারে মিশিয়া যায়; মনে মনে হয় ত বলিতেও ছিল—"ভগবতি বসুন্ধরে—দেহি মে বিবরম্!"

৩

সন্ধ্যার পরেই রায়মহাশয় দপ্তর লইয়া বসিয়াছেন। মনটা তাঁহার আজ বড়ই অস্বচ্ছন্দ, কিছুতেই কাজে বসিতেছিল না। চশমার কাচখানি ফাটিয়া যাওয়ায় দেখিবারও বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল। দীপটা মশালের মত জ্বলিতেছিল, তথাপি তিনি তাহাতে আরও দুই একটা পলিতা জুড়িয়া দিবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময়ে বিরাজ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার কালী-পড়ার দাগ ও ধূলায় ভরা মাদুরের একপাশে বসিল।

রায়মহাশয় বক্রদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন—কোন কথা কহিলেন না।

বিরাজ একটু হাসিয়া—"আমার ওপরে রাগ হ'য়েছে, রায়?"—বলিয়া দুইখানি গিনি বাহির করিয়া তাঁহার দপ্তরের উপরে রাখিয়া দিল।

রায় মহাশয় আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?"

বিরাজ। তোমার যে দুটি ঘট ভেঙ্গে দিয়েছি তার দাম—আর আমার অপরাধের দণ্ড।

রায়মহাশয় এইবার অবসর বুঝিয়া, পূর্ব্বে বালক-বিরাজকে কাঠা-কালি বিঘা-কালি শিখাইবার সময়ে যেমন ধমকাইতেন সেইভাবে বলিলেন, "বলি—পূর্ণঘট কি পা দিয়ে ভাঙ্গ্‌তে আছে?"

বিরাজ। ব'ল্‌লুম ত কাজটা ভাল হয় নি—তুমি কেন তুচ্ছ মাটীর ঘট না বসিয়ে সোণার ঘট বসাও নি—তা হ'লে কি ভাঙ্গ্‌তে পারতুম?—

সে যা হ'ক, হীরুদার কি কি সম্পত্তি আমাদের হাতে আছে—বল দেখি ?—সে সব দলিল কোথা ?

রায়। কত্তার এখন ইচ্ছে হ'য়েছে—টাকা পেলেই সেগুলি ফিরিয়ে দেন, সেই জন্যে সেদিন খুঁজে খুঁজে দলিলগুলি বা'র করাও হ'য়েছিল ; এইখানেই আছে ।

উক্তরূপ বলিয়া রায় মহাশয় কতকগুলি দলিলের মধ্য হইতে কয়েকখানা দলিল বাছিয়া বিরাজের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

বিরাজ। আসল টাকাটা কত ?—সুদ এক পয়সাও ধ'রতে পার না—বিষয়ের উপস্বত্ব তোমরাই ভোগ ক'রে আসছ।

রায় মহাশয় মূল টাকাটা হিসাব করিয়া বলিলেন। বিরাজ পকেট্ হইতে 'ব্যাঙ্ক্'এর একখানি চেক্-বই বাহির করিয়া সমস্ত টাকার একখানি চেক্ লিখিয়া দিল এবং "আস্ছি" বলিয়া, দলিলগুলি হাতে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল ।

একদিন যে কক্ষ কমলাময় বলিয়া বিরাজ ঘৃণায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, আহারান্তে আজ আবার সেই কক্ষেই শয়ন করিতে আসিল। কমলার যে আলেখ্যখানিকে সে একদিন পদদলিত করিয়া গিয়াছিল, কে আবার সেইখানিকে সযত্নে কক্ষভিত্তিতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। ইহা যে সুধাংশুর কার্য্য তাহা বুঝিয়া, বিরাজ সযত্নে সেইখানিকে নামাইয়া হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল এবং ধূলা না থাকিলেও বারংবার কোঁচার কাপড়ে ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার যথাস্থানে ঝুলাইয়া রাখিল। নিরাশ্রয়ে মূর্চ্ছিতা সাক্ষাৎ প্রিয়াকে সেইভাবে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া চিত্রার্পিতার এই বহু-সমাদর আজ যদি তরঙ্গিণী দেখিতে পাইত তাহা হইলে বিরাজকে দুই চারিটা কথা শুনিতে হইত।

কমলা আবার ফিরিয়া আসিতেছে, আবার যেমন ছিল সব তেমনই হইবে—এই আশায় অতীতের সব দুঃখ, রাগ, বিষাদ ও অভিমান বিরাজের হৃদয় হইতে সরিয়া গিয়াছে। জীবনের এই অধ্যায়টাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া যেভাবে জীবন আরম্ভ করিবে, সে মনে মনে তাহারই একটা নক্সা করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মনটা যেন কেমন বিকল হইয়া গেল। দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া শয্যায় পতিত হইল। সে কোঁচার কাপড়ে তাহা মুছিতে না মুছিতে আবার দুই বিন্দু গড়াইয়া আসিল। তারপর আর বিরাম নাই—বিচ্ছেদ নাই—তাহার দুই চক্ষু হইতে দর দর করিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া, বিরাজ মুক্ত বাতায়নের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী গভীর। সুপ্ত পল্লী নীরব। নির্জ্জন গৃহ নিস্তব্ধ। গৃহসংলগ্ন উদ্যানের তরুপল্লব সকল নিষ্কম্প। শ্বাসের মতও বায়ু বহিতেছে না। নীল আকাশে দুই একখানা শুভ্র মেঘ যেন চিত্রিত গগনে চিত্রিত পয়োদের মত স্থির হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। সমস্ত প্রকৃতিতে যেন একটা প্রগাঢ় ঘুমঘোর লক্ষিত হইতেছে। চাঁদও যেন নিদ্রাবেশেই দিগন্ত-শয্যায় ঢলিয়া পড়িতেছে। সহসা দূর হইতে দূরবর্ত্তী ঝাউ-গাছের মাথা দোলাইয়া, কাহারও ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসের মত হু হু করিয়া একটা বাতাস বহিয়া আসিল। বিরাজের মনে হইতে লাগিল, যেন কে একটা প্রকাণ্ড শিয়াকুল কাঁটার বোঝা তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া জোরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—আর টানে টানে তাহার হৃদয়ের সূক্ষ্ম শিরাগুলি ছিঁড়িয়া যাইতেছে। আকুলহৃদয়ে কক্ষতলে পরিক্রমণ করিতে করিতে ভাবিতে

লাগিল,—"অকস্মাৎ মনটা এমন হইবার কারণ কি? এই হৃদয়ের উপর দিয়া কত দুঃখ ও বিষাদের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, এই মর্ম্মে কত নিরাশার আগুন জ্বলিয়াছে, কিন্তু মন ত কখন এমন আকুল হয় নাই! তবে আজ কমলার অসতীত্ব-সংশয়-নিরসনের দিনে—তাহার প্রত্যাগমনের আশা ও আনন্দের মধ্যে, হৃদয়ের এ অভূতপূর্ব্ব ব্যাকুলতা কেন?"

অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিয়া, বিরাজ পুনর্ব্বার বাতায়ন-সন্নিধানে আসিয়া, দূরে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—"দুঃখের কোন কারণ না থাকিলেও সুন্দর কিছু দেখিয়া অথবা মধুর ও মনোহর কিছু শুনিয়া মানুষের মন সময়ে সময়ে পর্য্যাকুল হইয়া উঠে!—মন অবোধপূর্ব্বক কি জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যের স্মৃতিতে তেমন হয় কে বলিতে পারে—কিন্তু সে আকুলতাটা কি এই রকমের? কূল-শৈলে দাঁড়াইয়া সাগরের সুনীল বক্ষে সূর্য্যাস্ত অথবা নিবিড় কালো মেঘের কোলে বিদ্যুদ্‌বিলাস দেখিলে—মনটা যেন কেমন হইয়া যায়! বসন্ত-প্রভাতে কোকিলের কাকলি অথবা নিদাঘ-নিশীথে পাপীয়ার ঝঙ্কার শুনিয়াও মনটা যেন কেমন বড় আকুল হইয়া উঠে!—কিন্তু সে আকুলতা ত এমন নয়! সে যেন মন কোথাও যাইতে চাহে তাহার ঠিকানা পায় না—কিছু পাইতে ইচ্ছা করে তাহার নাম বলিতে পারে না!—এ ত তা নয়!—প্রিয়জনের সঙ্গে আসিয়া বিজন দ্বীপে একাকী পরিত্যক্ত হইলে, জনহীন প্রান্তরের মধ্যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, অথবা অজানা সহরে পথ হারাইয়া গেলে, মনটা যেমন আকুল হইয়া উঠে!—প্রিয় আত্মীয় কেহ রাগ করিয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছে—কাতরে ডাকিয়াও তাহাকে ফিরাইতে না পারিলে, খেয়াহীন নদীর পরপারে কেহ বড় আপনার জন কাঁদিয়া ডাকিতেছে—তাহার নিকটে যাইতে না

পারিলে, হৃদয়ের কেহ প্রিয়তম বন্ধু অকূলে পড়িয়া হাবুডুবু করিতেছে —তাহার উদ্ধারের কোন উপায় করিতে না পারিলে, মনটা যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে—এ যেন কতকটা সেই রকমের!—যেন বড় দুর্লভ কিছু হারাইয়া গিয়াছে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না—যেন বড় দরকারি কিছু ভুলিয়া গিয়াছি তাহা মনে করিতে পারিতেছি না! মানুষের প্রাণে প্রাণেও তারহীন তাড়িতযন্ত্রের মত এমন একটা অদৃশ্য সম্বন্ধ আছে, যাহাতে একটি প্রাণের বেদনা ও আকুলতা অদ্ভুত উপায়ে দূরস্থ আর একটি প্রাণকে ব্যথিত ও আকুল করিয়া তুলে। কমলা যে রাত্রিতে বড় বিপদে পড়ে, সে রাত্রিতেও আমার মনটা ঠিক এমনই আকুল হইয়াছিল! সে কি আবার কোন নূতন বিপদে পড়িল?—সুধাংশু গিয়া কি তাহার দেখা পায় নাই?—"

এই সময়ে পূর্ব্বের মত আবার একটা বাতাস বহিয়া আসিল, আর সেই সঙ্গে কাহারও অব্যক্ত রোদন-গুঞ্জনের ন্যায় একটা শব্দ ভাসিয়া আসিল। ঘরটা অকস্মাৎ যেন বিবিধ পুষ্পের সৌরভে ভরিয়া গেল! কক্ষমধ্যে ময়াল-সাপের নিঃশ্বাসের মত একটা দীর্ঘ-শ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইয়া, বিরাজ চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, দীপটা কখন নিভিয়া গিয়াছে—কক্ষমধ্যে অন্ধকার, আর সেই জ্যোৎস্নাতরলিত ক্ষীণান্ধকারে একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রমণী দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে!

বিরাজের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নির্ণিমেষনেত্রে সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তাহার বেশ বোধ হইল, সেই ছায়া-মূর্ত্তি তাহার নির্ব্বাসিতা কমলার! সে মূর্ত্তি যে বাস্তব হইতে পারে না—বিরাজ চিত্তের আবেগে সে কথা ভুলিয়া গেল। অগ্রসর হইয়া, বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া সে সেই ছায়াময়ীকেই বক্ষে

চাপিয়া ধরিল। ছায়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল! বিরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া কক্ষতলে পতিত হইল।

জীবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে ছায়া-দেহ লইয়া দূরস্থিত প্রিয়জনকে দেখা দিয়া থাকে—শুনা যায়;—ইহাও কি তাহাই?

৪

প্রভাতে রায় মহাশয় বিরাজকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাঙ্গা চশমা-খানা খুলিয়া একবার দেখিলেন, দুই করে চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জন করিয়া আবার দেখিলেন; তাহার পরে চশমাখানা কাপড়ে মুছিয়া পরিয়া, পুনর্ব্বার দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "মানুষ কি একরাত্রির মধ্যে এত ফিরিয়া যায়!" বিরাজের মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না।

বিরাজ তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এঁরা সব কাশীর কোন্ ঠিকানায় গেছেন কিছু জান?"

রায়। হীরুবাবু ব'ল্‌তে পারেন।

বিরাজ আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে হীরালালের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া, বিরাজ রায় মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল, "একখানা গাড়ী ব'লে পাঠাও, রায়!—আমাকে দুপুরের ট্রেণটা পাইয়ে দেয়।"

রায়মহাশয় সবিস্ময়ে বিরাজের মুখের দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আবার আজই?"

বিরাজ। হ্যাঁ—কল্‌কেতা হ'য়ে আজই সন্ধ্যের 'মেল্'এ আমাকে কাশী যেতে হচ্ছে।

যথাকালে একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিরাজ প্রস্তুত হইয়া গাড়ীতে উঠিবে এমন সময়ে একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়া তাহার কাশী যাওয়া ঘুরাইয়া দিল।

গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী প্রান্তরের মধ্যস্থলে অরণ্যানীবেষ্টিত বহুকালের একটি দীর্ঘিকা ছিল। উচ্চতীরজাত, ঘনপল্লবান্বিত, বহুশাখাসমন্বিত বহু বনবৃক্ষ সেই দীঘির উপরে নিবিড় ছায়া বিস্তার করিয়া তাহার স্বাভাবিক কালো জলকে আরও কালো করিয়া দেখাইত। দীঘির চারি ধারেই খুব ঘন পদ্ম-বন, মধ্যে কাকাক্ষি সদৃশ স্বচ্ছ ও কৃষ্ণ জলরাশি। স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হইলেও কিন্তু সে জল কাহারও ব্যবহারে আসিত না; বহুদিনের বহু রহস্য-কাহিনী ও কিংবদন্তি সেই কালো জলের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত থাকিয়া তাহাকে সাধারণের যথেচ্ছব্যবহারের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছিল। নিকটের পল্লীবাসীরা কেহ অবগাহনের জন্য তাহাতে অবতরণ করে না। দুরন্ত পল্লী-বালকেরা কেহ সেই জলে নামিয়া পদ্ম তুলিবার চেষ্টা করে না। আগ্রীবনিমগ্না কোন পল্লী-বামাও কদাচিৎ সেই কালো জল আলো করিয়া ভ্রমরবৃন্দের ভ্রমোৎপাদন করে না। ঢুলের মেয়েরাও কখন তাহার ধারে নামিয়া ঝিনুক তুলিতে আইসে না। এই দীঘির তীরস্থিত, সলিলবিলম্বিত, পুষ্পিত তরুর প্রতিবিম্বে কতজন অন্তর্জলবাসী যক্ষের সুবর্ণরথের বিচিত্র ধ্বজা দেখিয়া থাকে এবং তাহার ধীবরাপরিচিত অগাধজলের বৃহদাকার মৎস্য-সমূহেও কতজন কত ভীষণ জল-জন্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সেই দীঘির জল হইতে পুলিশ কর্ত্তৃক কাত্যায়নীর মৃতদেহ উদ্ধৃত হই-

য়াছে। তাঁহার কণ্ঠদেশে নখের আঁচড়ের মত কতকগুলি দাগও দেখা গিয়াছে। তাহাতেই পুলিশের সংশয়, কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে।

কাত্যায়নী যেদিন সন্ধ্যার সময়ে মোহিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহত্যাগ করেন, তাঁহার মনে কি সঙ্কল্প লুক্কায়িত ছিল তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই। মোহিনী কিন্তু তাঁহার কথার ভাবে ধারণা করিয়াছিল যে, তাহারা তীর্থে যাইবার টিকিট্ কিনিয়া হাবড়ার রেল-গাড়ীতে চড়িবে। গহনা ও টাকা-কড়ির লোভে কাত্যায়নীকে গলা টিপিয়া মারিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়ার সংশয়ে ধৃত হইয়া, মোহিনী পুলিশে যে জবানবন্দি করিয়াছিল তাহাতে প্রকাশ যে, বাড়ী ছাড়িয়াই মোহিনী ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিতে চাহিলে কাত্যায়নী জল-পথে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গঙ্গার তীরে আসিয়া নৌকা ভাড়া করিতে চাহিলে তিনি ডাঙ্গা-পথে যাইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। ডাঙ্গা-পথে কিছু দূর আসিয়াই তিনি মোহিনীকে বলিয়াছিলেন, "মোহিনী—তুই আমার জন্যে ঢের ক'রেছিস্, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোকে দিচ্ছি—তুই তোর দেশে চ'লে যা!" মোহিনী তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে টাকা-কড়ি, গহনা ও কাপড়—সমস্ত দিয়া বলেন, "না—মোহিনী! আজ থেকে তোর আমার ভিন্ন পথ; তোর দেখান পথে চ'লে আমার সব গেছে। তুই তোর পথ খুঁজে নেগে যা—আমি, যে দিকে দু'চোখ যায়—চ'লে যাব।" মোহিনী গহনা ও টাকা-কড়ি লইয়া বিদায় হইলে পর তিনি কি করিয়াছিলেন তাহার প্রকাশ নাই।

আপনার জন যতদিন জীবিত থাকে ও নিকটে থাকে ততদিন কেহই ঠিক বুঝিতে পারে না—তাহাকে সে কতখানি ভালবাসে, চলিয়া

গেলেই তাহা বুঝিতে পারে এবং বুঝিতে পারিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। মৃতজনের দোষগুলি তখন আর ভাবিতে ইচ্ছা হয় না ; তাহার গুণের কথাগুলিই অহরহঃ মনে জাগিয়া মনকে আকুল করিয়া তুলে। তাহার উপরে নিত্যজীবনের ব্যবহারে যদি তাহার প্রতি কোন ত্রুটি, অনাদর বা অনুচিত ব্যবহার ঘটিয়া থাকে, তুচ্ছ হইলেও সেইগুলি তখন এক একটা বড় বড় মর্ম্মবেদনার হেতু হইয়া দাঁড়ায়। বিরাজ জননীর শোকে অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িল।

কাত্যায়নীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইবার পরদিনেই মধ্যাহ্নে সুধাংশু তরঙ্গিণীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়াই রায় মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, তরঙ্গিণী নামিয়া একহাত ঘোমটা টানিয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। সুধাংশুও গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়াই কোনও দিকে না চাহিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার উপক্রম করিল—তাঁহার সহিত একটা কথাও কহিল না।

রায় মহাশয় অবাক্। তিনি এই কয়েকদিন ধরিয়া বাড়ীখানিকে যাহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন—তাঁহার সেই 'বউ-মা' কোথায় রহিল ? আর যে 'কত্তা' কোথাও গিয়া কখনও দুই দিন কাটাইতে পারেন না—তিনিই বা কোথায় রহিলেন ? তিনি আর বিস্ময় ও কৌতূহলের আবেগ দমন করিতে পারিলেন না—সুধাংশুর পিছু পিছু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, "কত্তা কোথা রইলেন ?"

সুধাংশু মুখ না ফিরাইয়াই চলিতে চলিতে গম্ভীরভাবে বলিল, "কাশীতে।"

রায় মহাশয় আবার কিছুদূর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর বউ-মা ?"

সুধাংশু অস্পষ্টভাবে কি বলিয়া, উড়নীতে চোখ মুছিয়া স্খলিতপদে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। রায় মহাশয় অবনতমস্তকে, বিষন্নমুখে—যেন কিছু হারাইয়াছেন তাহাই খুঁজিতে খুঁজিতে—বাহিরে আসিয়া একবারে গঙ্গার দিকে চলিয়া গেলেন।

বিরাজ যে রাত্রিতে নিজ শয়নকক্ষে সেই ছায়া-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিল, সেই রাত্রিতেই কমলা, নীলকমল ও কৃষ্ণনাথের পদধূলি এবং উপস্থিত সকলের নিকটে সহাস্যমুখে বিদায় লইয়া জন্মের মত সংসার ছাড়িয়া গিয়াছে।

সংসার কি আশ্চর্য্য নিয়মেই পরিচালিত! কাহারও ইষ্টানিষ্ট বা সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই কঠোর সংসারের অনিবার্য্য স্রোত কেমন সবেগে—সদর্পে বহিয়া যায়! তোমার আশা-ভরসা একবারে বিলুপ্ত হউক—ভালবাসার জিনিসগুলি সব দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া যাউক—আনন্দ, সুখ, জীবনের যাবতীয় রম্য আকর্ষণ সব নীরস পাংশুতে পরিণত হউক, তথাপি তোমাকে জীবনের যাবতীয় কার্য্যই করিতে হইবে—খাইতে হইবে, ঘুমাইতে হইবে—আবার জাগিতে হইবে, সকলের সঙ্গেই মুখ তুলিয়া কথা কহিতে হইবে, হাসিতে হইবে, দেনা-পাওনাও বুঝিতে হইবে—আকর্ষণশূন্য সহস্র বিকৃতছায়ার অনুসরণ করিতে হইবে!

নীলকমল কাশী-বাস করিয়াছেন। বিরাজ গিয়াও তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। জননী ও পত্নীর বিয়োগ-দুঃখের উপরে সংসারের সমস্ত ভারও তাহাকেই বহিতে হইতেছে। শুধু তাহাদের একটা

সংসারের নহে—হীরালালের সংসার দেখিবার ভারও অভাবনীয় উপায়ে তাহারই উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

কমলার মৃত্যু-সংবাদ লইয়া সুধাংশু ও তরঙ্গিণী ফিরিয়া আসিবার পরেই হীরালাল কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সে চলিয়া যাইবার সময়ে একখানা পত্রে বিরাজকে যাহা লিখিয়া গিয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বিরাজ—ভাবিয়াছিলাম, আমি যাহা ভাঙ্গিয়াছি বিধাতা তাহা মিলাইয়া দিবেন ; কিন্তু তাহা হইল কৈ ? বোধ হয় তাহা হয় না—সংসারের সত্য ঘটনা উপন্যাসের ন্যায় রম্যপরিণাম হইতে বড় দেখা যায় না।

তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ বটে, কিন্তু আমি নিজেই আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে উৎসন্নের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছ—অধঃপাতের নিম্নসোপান হইতে টানিয়া তুলিয়াছ, টাকা না লইয়াই আমার বন্ধক দেওয়া সম্পত্তি ফিরাইয়া দিয়াছ। বিধাতাও আমাকে সুখী হইবার মত অনেক জিনিস দিয়াছিলেন, কিন্তু সুখ আমার ভাগ্যে নাই। শুধু তোমার নহে—আমি নিজেরও ইহজীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিয়াছি।

সংসার কাহারও কিছু দেওয়া গায়ে রাখে না—সব সুদে-আসলে ফিরাইয়া দেয়। একগুণ ভালবাসাকে শতগুণ করিয়া প্রত্যর্পণ করে, একগুণ ঘৃণাকে সহস্রগুণ করিয়া ফিরাইয়া দেয়। আমি চিরদিন সংসার ও সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি,—ঘৃণা ব্যতীত আর কি পাইব ? সংসারে তুমি ছাড়া আর সকলেই আমাকে ঘৃণা করে।

সাধে কি আমি সংসারকে ঘৃণা করিতাম—সমাজকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতাম ? কে আমাকে মন্দ হইতে শিখাইয়াছিল ? তোমরা বল—

আমি নিজেই হইয়াছিলাম; কিন্তু আমি বলিব—সংসার বা সমাজই আমাকে মন্দ করিয়াছিল। শৈশবে আমার চরিত্র কি বিশেষ মন্দ ছিল—জানি না, বাল্যে বা যৌবনের প্রারম্ভে বেশ জানি—আমি মন্দ ছিলাম না। তবে তত মন্দ আমার চরিত্রে কিরূপে বিবর্ত্তিত হইল—তত মন্দের বীজ আমার সে সোণার শৈশবের সরলতার ভিতরে কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল? সংসার যদি আমার দুঃখে ততটা উদাসীন না থাকিত, সমাজ যদি আমার অভাব ও অভিযোগের কথায় একদিনের জন্যও কর্ণপাত করিত, আমি বেশ বলিতে পারি—আমার অবস্থা আজ এমন শোচনীয় হইত না। আমার দোষ, আমি মন্দবুদ্ধি—বুঝিতে পারি নাই যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষে সুখ নাই—প্রতিহিংসা শুধু নিজের অশান্তি বাড়াইয়া থাকে।

ঘৃণ্যকে যে দয়া করিতে পারে—দ্বেষ্যকে যে ক্ষমা করিতে পারে, সে শুধুই মহৎ নহে—বিশ্বের মহৎ উপকারক। পতিত ও দুষ্টের সংশোধনের উপায়, দণ্ড নহে—ক্ষমা, ঘৃণা নহে—অনুকম্পা। তুমি তাহা জান, কিন্তু সমাজ তাহা বুঝে কৈ? সমাজ যেদিন এই কথা বুঝিবে, সেই দিন মানুষের অর্দ্ধেক দুঃখ কমিয়া যাইবে—সংসার শান্তির আবাস হইবে।

সে দিন কখনও আসিবে কি না—জানি না; আসিলেও আমি তাহা দেখিতে থাকিব না। লোকসমাজে আমি মুখ দেখাইতে পারি না, তোমাদের কাহারও সঙ্গে মিশিতে পারি না, বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না, নিজের ছেলে মেয়েদের পর্য্যন্ত প্রাণ ভরিয়া স্নেহ-যত্ন করিতে পাই না। তাহারাও বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করে, আমার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কহে, আমাকে যেন কি একটা প্রহেলিকার বিগ্রহ ভাবিয়া সংশয়পূর্ণনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থাকে,

আমার নিকট হইতে দূরে থাকিলেই যেন ভাল থাকে। মানুষের অপকর্ম্মের ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক শাস্তি হইতে পারে—জানি না! এ দুর্ভর জীবন লইয়া কি করিতে সংসারে থাকিব?—আমি পালাইলাম।

কোথায় যাইব—জানি না। কখনও ফিরিব কি না—তাহাও বলিতে পারি না। জীবন চঞ্চল। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তোমাদের সবার সঙ্গে হয় ত এ জীবনে এই শেষ কথা। যাহাদের ফেলিয়া চলিলাম তাহাদের দেখিও—আর কখন কখন আমার দোষ ও অপরাধ ভুলিয়া আমাকে তোমার শৈশবের সেই 'হীরুদা' বলিয়া মনে করিও!"

৬

কমলার মৃত্যুর পর দুই তিন মাস চলিয়া গিয়াছে। বিরাজ একদিন অপরাহ্ণে রায় মহাশয়ের নিকটে বসিয়া জমীদারী সংক্রান্ত একটা হিসাব দেখিতেছিল, সেই সময়ে সুধাংশু একখানা পত্র আনিয়া তাহাকে দিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানা ডাকযোগে আসিয়াছে। তাহার শিরোনামাটা ইংরাজীতে লেখা। ডাক-ঘরের অস্পষ্ট মোহর হইতে বুঝা যায় না, পত্রখানা কোথা হইতে আসিতেছে।

বিরাজ খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানা বাহির করিয়া দেখিল—বাঙ্গালায় লেখা। লেখাটা যেন বড় দুর্ব্বল হস্তের, আর কাঁচা লেখার উপরে জল পড়িলে যেমন অক্ষর ধুইয়া গিয়া পাতলা কালীটা কাগজের উপরে ছড়াইয়া পড়ে,—মাঝে মাঝে সেই রকমের অনেক দাগ! যে লিখিয়াছে সে কি কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিয়াছে?

পত্রখানার সমস্তটা নিমেষে একবার দেখিয়া লইয়া, বিরাজ কম্পিতহস্তে সেখানাকে আবার সেই ছেঁড়া খামের ভিতরে পূরিয়া

লইয়া উঠিল এবং নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িতে বসিল। পত্রখানা এইরূপ :—

"কমলার নাথ—জানি না, তুমি আজ কত দূরে—কোথায়—কি ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ! যত দূরে—যেখানে—যেভাবেই থাক, একদিন বাড়ীতে ফিরিবে ; সেই সময়ে এই পত্র তোমার হাতে পড়িবে। হাতে পাইয়াই যেন রাগ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিও না! তোমার অভিমান বৃথা—'কলঙ্কিনী' হইলেও তোমার কমলা অবিশ্বাসিনী নহে।

তুমি যেদিন আমাকে 'কলঙ্কিনী' বলিয়াছিলে, তাহার পূর্ব্বেই কেন আমার মরণ হয় নাই? কেন সেই দণ্ডেই মরিতে পারিলাম না? মূর্চ্ছা আসিয়াও কেন আমাকে ছাড়িয়া গেল?

'কলঙ্কিনী' বলিয়া নিরাশ্রয়ে ফেলিয়া যাইবে—তাহাই যদি তোমার মনে ছিল, তবে কেন আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে যত্ন করিয়াছিলে? কেন পায়ে করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া গেলে না?

তোমার দোষ নাই—আমি সব শুনিয়াছি। তুমিও যেদিন সব শুনিবে, বুঝিতে পারিবে—চলিয়া আসাতে আমারও বেশী দোষ ছিল না ; এক দোষ যে, তাঁহাদের কথা শুনিয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাঁহারা যে বলিয়াছিলেন, তাহাতেই সংসারের মঙ্গল হইবে—তুমি সুখী হইবে!

তুমিও ত কত দিন বলিয়াছ—'নিজের সুখ খুঁজ্‌তে গিয়ে কখন কারুকে দুঃখ দিও না! অন্যের যাতে এতটুকু দুঃখেরও সম্ভাবনা আছে, তেমন কিছু ক'রে কখন সুখী হ'বার ইচ্ছে ক'রো না! তেমন সুখ নিয়ে কেউ কখন সুখী হ'তে পারে নি। পরের সুখ খুঁজ্‌তে গিয়ে যদি দুঃখও পাও—তাই ক'রো! সে দুঃখেও সুখ আছে—মঙ্গল আছে, তাতে বিধাতার

আশীর্ব্বাদ লুকান থাকে'—আমার মন্দভাগ্যে ভাল থেকেও যে এত মন্দ—এত দুঃখ—এত অমঙ্গল উঠিবে, তাহা কি করিয়া জানিব ?

যেদিন তোমাকে লুকাইয়া তোমার ভালবাসার গণ্ডির বাহিরে চলিয়া আসি, আমিও কি সুখে আসিয়াছিলাম ? অন্তর্যামী জানেন! আমার সে দুঃখ আর কে জানিবে ? তোমাকে না বলিয়া দূরে চলিয়া আসিলে, যে তোমার ভালবাসা হারাইব—তাহা জানিতাম ; কিন্তু বেশ জানিতাম যে, তাহাতে তোমাকে হারাইব না।

তোমার সঙ্গে আমার কি এই এক জীবনের সম্বন্ধ, প্রাণাধিক ? মনে নাই—কত শত জন্ম পূর্ব্বে, এই কি আর কোন পৃথিবীর কোন্ দেশে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, মনে হয় না—কোন্ বিজন সৈকতে কি নিভৃত পর্ব্বতে আমাদের দু'জনের প্রথম দেখা, জানি না—কোন্ পুষ্পিত বনে কি বিজন গহনে আমাদের দু'জনের প্রথম মিলন, কিন্তু এ মিলন এই নূতন নহে—এ বিবাহও এই প্রথম নহে ; এ বন্ধন পুরাতন, কিন্তু ছিঁড়িবার নহে। জীবনের পর জীবন চলিয়া যাইবে, জন্মের পর জন্ম আসিবে, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কখন ছাড়াছাড়ি হইবে না—অনন্ত—অনন্ত কালেও না। এ যে বিধাতার বাঁধন, প্রিয়তম !

তোমার প্রাণের সুধাংশু আমাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অনেক সাধিয়াছিল। আমি যাই নাই। যে বাড়ীতে তুমি নাই, সে বাড়ীতে আমার কি আছে ?

ঠাকুরপো বলিয়াছিলেন, আমি ফিরিয়া না গেলে তুমিও ফিরিবে না ; কিন্তু আমি জানিতাম—আমি গিয়াছি শুনিলেও তুমি ফিরিয়া যাইবে না। তুমি যে জান—আমি 'কলঙ্কিনী'! আমার জীবনসর্ব্বস্ব—আমার

ইহকাল-পরকাল!—আমি যে তোমাকে ভুলিয়া কখন ইষ্টদেবতাকেও ভাবিতে পারি নাই!

সব কথা শুনিয়া হয় ত তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে,আমি অবিশ্বাসিনী নহি; কিন্তু আর সকলেও কি তাহাই বিশ্বাস করিবে? স্ত্রীজাতির কলঙ্ক যে তাহাদের চিতার ছাই দিয়াও মাজিয়া উঠান যায় না! সমাজ যদি কখনও এই কলঙ্কের কথা মনে করিয়া আমার ছেলে মেয়েদের অবধি কলঙ্কিত মনে করে?—যদি কেহ বিবাদের ছলেও তাহাদের বলে—"তোদের জননী 'কলঙ্কিনী' ছিল?" তাহাদের মুখে অপমানক্ষুব্ধ হৃদয়ের ম্লান ছায়া দেখিয়া কি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে না? তুমিই যখন আমাকে 'কলঙ্কিনী' বলিতে পারিয়াছ, অন্যে বলিবে তাহা অসম্ভব কিসে?

সুবিধা আসিয়াছিল, কাশী-তীর্থে—গঙ্গার পবিত্র কূলে তোমার দেখা পাইয়াছিলাম; কিন্তু আমি অভাগিনী সে সুবিধা হারাইয়াছি!—ত্রিভুবনের পুণ্যতীর্থ অপেক্ষাও পুণ্যতর তীর্থে—তোমার চরণতলে মাথা রাখিয়া মরিতে পারি নাই!

ভাগ্য যদি জীবনে কখনও সুপ্রসন্ন হয়—যদি তোমাকে রাখিয়া মরিতে পারি, আমার দোষ ভুলিয়া আমাকে মনে করিও! আমার স্মৃতিকে ভালবাসিতে না পার, আমার অপরাধ ক্ষমা করিও! ভালবাসিয়া না পার, চিরদুঃখিনী বলিয়া—পিতৃমাতৃহীনা অবলা বলিয়াও ক্ষমা করিবে না? ক্ষমা করিতেও যদি না পার, শুধু মনে রাখিও—আমি তোমারই—জন্মে জন্মে—জীবনে মরণে—কায়-মনে শুধু তোমারই; পূর্ব্ব-জন্মে আমি তোমারই ছিলাম—এজন্মে তোমারই আছি—মরিয়াও তোমারই থাকিব।

যাহারা অনন্ত কালের—অনন্ত পথের যাত্রী, তাহাদের এই একটা জীবনের পথ কতটুকু ?—তাহার পরেই আবার দেখা হইবে।

মরণের পারে গিয়া আমি তোমার পথ চাহিয়া থাকিব। কর্ম্মশেষে শ্রান্ত দেহ রাখিয়া তুমিও যেদিন জীবনের পরপারে যাইবে, আমি তোমাকে খুঁজিয়া লইব।

তোমার বা আমার এ আকার থাকিবে না—তাহা জানি ; তোমারই মুখে শুনিয়াছি—তাহা কাহারও থাকে না। নাম ও রূপ হারাইয়া যায়, কিন্তু মানুষ তবুও সেই একই থাকে। তুমিও থাকিবে—আমিও থাকিব ; আকৃতি বলিয়া না দিলেও অন্তর বলিয়া দিবে—তুমি আমারই ছিলে—আমি তোমারই ছিলাম।

তোমাকে এ জীবনে অনেক দুঃখ দিয়াছি, আপনিও কিছুই কম পাই নাই। শুধু তুমি ও আমি নহে—সংসারে যাহারা আসে তাহারাই দুঃখ ভোগ করিয়া যায়। সংসারে কে সুখী ? অভাব, নির্য্যাতন, রোগ, শোক, নৈরাশ্য ও অশান্তি—সবারই জীবনের নিত্যসঙ্গী। সকলেই নিজের নিজের দুঃখের ভারে শ্রান্ত—অদৃষ্টের নির্য্যাতনে ক্লান্ত। বিশ্রাম চাহিয়া সকলেই নিরন্তর সকাতরে বলিয়া থাকে—'জগদীশ ! দুঃখের ভার বহিতে যে আর পারি না! ডেকে নাও—বিশ্রাম দাও !'—কিন্তু বিশ্রাম কে পায় ? জীবনে কাহারও বিশ্রাম নাই !

বিশ্রাম কি নাই ?—আছে ; বিধাতা নিষ্ঠুর নহেন—অসীম দয়াবান্, শ্রান্ত জীবের কাতরতায় তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনিই একদিন তাহাদিগকে নিজের শীতল কোলে ডাকিয়া লইয়া বিশ্রাম ও শান্তি দান করেন।

বাবা আমাকে সান্ত্বনা করিয়া মাঝে মাঝে বলিতেন, 'মা—দুঃখ

ক'রো না! বিধাতার এই বিরাট্ বিশ্বের উপসংহার বিয়োগ নয়—মিলন, দুঃখ নয়—সুখ! দুঃখে যে জীবনের আরম্ভ—দুঃখেই তার অবসান হ'তে পারে না। সংসারের তা নিয়ম নয়।' তাঁহার এই কথাগুলি আমার জীবনে ধ্রুব-তারার মত হইয়া ছিল। দুঃখের তাড়নায়—বিপদ ও দুর্দ্দিনের অন্ধকারে, এই কথাগুলি মনে করিয়া দিশাহারা হই নাই। সেই জন্যই তোমাকেও বলিয়া যাইতেছি।

আমি চলিয়া গিয়াও তোমাকে আমার কথা মনে করাইয়া দিব। গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিও—তারার অক্ষরে আমি তোমাকে আমার প্রাণের কথা লিখিয়া জানাইব। প্রদোষে বা প্রভাতে বিজন নদীর কূলে গিয়া বসিয়া থাকিও—তটিনীর কলস্বরে আমি তোমাকে আমার মর্ম্মকথা বলিয়া পাঠাইব। সকালে বা সন্ধ্যাকালে নির্জ্জন প্রান্তরে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও—সমীরণের মৃদুশ্বাসে আমি তোমাকে আমার মর্ম্মব্যথা জানাইতে যত্ন করিব। যদি আমার জন্য কখন এক বিন্দুও অশ্রু তুলিয়া রাখিয়া থাক তবে আমাকে মনে করিয়া তাহা বিসর্জ্জন করিও! আমার জীবনের সব জ্বালা তাহাতেই জুড়াইয়া যাইবে।

কখন কিছু চাহিতাম না বলিয়া আক্ষেপ করিতে। কখন কিছু চাহিবার দরকার হয় নাই। এখন একটি চাহিবার দরকার হইয়াছে।

যাঁহার বাড়ীতে আমি আছি, তিনি বড় সদাশয়—বড়ই স্নেহময়। ভগবানের দয়ায় ঘোর বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াও যেদিন আশ্রয়ের অভাবে গঙ্গার ঘাটে পড়িয়া ছিলাম, যখন কেহ আমাকে আশ্রয় দিতে চাহে নাই—তুমিও অনাশ্রয়ে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিয়াছিলে, তখন তাঁহারই স্নেহে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। সেই অবধি আমার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা আপনার মেয়ের জন্যও কেহ করে না।

তিনি যদি কখন কোন বিষয়ের জন্য তোমাকে অনুরোধ করেন—তাঁহাকে নিরাশ করিও না!—এইটি আমার জীবনের শেষ ভিক্ষা।—তোমার চিরজীবনের—কমলা।"

পাঠকের মনে থাকিতে পারে—কমলা একদিন করুণাকে একখানা পত্র দিয়া, সেইখানাকে তাহার মৃত্যুর পরে বিরাজের ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। করুণা তখন তাহা করিতে অস্বীকৃত হইলেও কমলার অনুরোধ ভুলিয়া যায় নাই। এ সেই পত্র।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়। মাস, ঋতু, বৎসর, পরে পরে মহাসাগরের ছোট বড় তরঙ্গের মত, মহাকালের বক্ষে উঠিয়া অতীতের দিগন্তে মিশিয়া যায়। সংসার নিত্য নিত্য নূতন নূতন ভাবে সরিয়া পড়ে। তাহাতে অধিক দিন একভাবে কিছুই থাকিতে পায় না। শোকতাপও মানুষের হৃদয়ে বেশী দিন একভাবে থাকে না। যাহার বিরহাশঙ্কায় মানুষ জীবনেই শতবার মরিতে চাহে—দিনে সহস্রবার অশ্রু বিসর্জ্জন করে, যে চলিয়া গেলে মনে করে, বাঁচিবে না—বাঁচিতে হয় ত হাসিবে না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন অন্ধ হইয়া যাইবে, সেও চলিয়া যায়; তাহার জন্যই বা কতদিন কাঁদিয়া থাকে? সংসারের আশ্চর্য্য নিয়মে সকলকেই অশ্রু মুছিয়া হাসিতে হয়, শোক ভুলিয়া আবার আনন্দপর্ব্বেও যোগদান করিতে হয়। তবে হৃদয় সকলেরই সমান নহে, শোকও সবারই তুল্য হয় না; কাহারও শোকানল প্রিয়জনের চিতার সঙ্গেই নিভিয়া যায়, আবার কাহারও বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণের হোম-বহ্নির মত—রাবণের প্রবাদপ্রথিত চিতা-বহ্নির মত অহরহঃ ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে।

শোকতাপের কথা যাহাই হউক, প্রিয়জনের স্মৃতি কিন্তু মানুষের মনে অনেকদিন ধরিয়া জাগিয়া থাকে। সূর্য্য যতই পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়ে, বস্তুনিবহের পূর্ব্বগামিনী ছায়া ততই পৃথিবীর বক্ষে বস্তু অপেক্ষাও দীর্ঘতর হইয়া পড়িতে থাকে ; সেইরূপ প্রিয়জন অতীত হইবার পর যতই দিন যাইতে থাকে তাহার প্রিয়স্মৃতিও যেন ততই প্রিয়তর হইয়া উঠে।

কমলার মৃত্যুর পর এক দিন দুই দিন করিয়া কত দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্মৃতি কিন্তু আজিও কাহারও মন হইতে চলিয়া যায় নাই। সংসারের প্রতি সুধাংশুর উদাসীন-ভাবটা দিনে দিনে ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিতেছিল। তরঙ্গিণীরও প্রতিদিন কমলার জন্য কিয়ৎক্ষণ কক্ষতলে পড়িয়া অশ্রুধারায় ধরাভিষেচন করা এবং বৃথাকার্য্যে ঘাটে বসিয়া চোখের জলে আঁচল ভিজানটা একটুও কমিয়া যায় নাই। বিরাজ অবসর পাইলেই সুধাংশুকে লুকাইয়া একাকী বাড়ীর বাহিরে চলিয়া যায় ; কখন প্রদোষে গঙ্গার তিমিরাবৃত নির্জ্জন কূলে গিয়া বসিয়া থাকে, কখন গভীর নিশীথে নিদ্রানিস্তব্ধ গৃহের ছাদে উঠিয়া তারকামণ্ডিত নীলাম্বরে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কখন প্রভাতে শিশিরসিক্ত বিজনপ্রান্তরের শ্যামবক্ষে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন অপরাহ্নে বিরাজ কোথায় গিয়াছে। সুধাংশু একাকী বসিয়া, করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতেছিল। রায়মহাশয় পা পা করিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন।

অনেকক্ষণ পরে সুধাংশু মুখ তুলিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রায়মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে কিছু বল্‌বার আছে, রায়?"

রায়। একটা কথা আজ কত দিন থেকে ব'ল্‌ব ব'ল্‌ব মনে ক'রছি, একদিনও আপনাকে একা পাই না।

সুধাংশু। এখন ত আর কেউ নেই—ব'ল্‌তে পার।

রায়। বলি কি—বড় বাবু বিষয়-কর্ম্ম দেখ্ছেন, সংসার দেখ্ছেন; আপনি কি ক'রছেন?

সুধাংশু। আমাকে তুমি কি ক'রতে বল?

রায়। নিজে না পারেন—ও-বাড়ীর বউমাকে দিয়েও কি একবার বড় বাবুকে বলাতে পারেন না?

রায়মহাশয়ের কথার হাওয়াটা যে দিকের তাহা বুঝিয়া সুধাংশু বলিল, "ব'ল্তেও পারি—বলাতেও পারি; তাতে ফল কি, রায়?"

রায়। কেন—তাঁর বয়েস্ কি?

সুধাংশু। কিছুই নয়—কিন্তু খুব সতেজ গাছও একদিনের ঝড়ে মুড়ো হ'য়ে বুড়োর মত হ'য়ে গেছে—দেখ নি?

রায়মহাশয় কোন উত্তর করিলেন না। সুধাংশু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "বড় বউঠাকৃরুণ কি সে কথা তাঁকে এতদিন না ব'লেছেন?"

রায়। বড় বাবু তাতে কি বলেন?

সুধাংশু। তিনি বলেন, "কেন—বিয়ে কি আমার হয় নি?—স্ত্রী দু'দিন কোথাও চ'লে গেলেই যদি আবার একটা বিয়ে ক'রতে হয়, তা হ'লে ত জীবনে অনেকবারই বিয়ে করা দরকার হ'য়ে পড়ে। সে আজ দু'দিন আমার কাছ থেকে দূরে গিয়ে র'য়েছে; দু'দিন পরেই যখন আবার দেখা হবে, আর একটা বিয়ে ক'রে গিয়ে কি ব'লে তার সঙ্গে কথা কইব?"—আরও কত কথা বলেন তার কাটান্ নেই।

রায় মহাশয় কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—আপনার আপত্তি কি?"

সুধাংশু গম্ভীরভাবে বলিল, "অনেক—সে কথা আবার কেন ?"

রায় মহাশয়ের প্রশ্নটা সুধাংশুর চিত্তে একটা চিন্তার তরঙ্গ তুলিয়া দিল। বিবাহে একদিন যে তাহার খুবই আপত্তি ছিল এবং কমলা যে তাহার সে আপত্তির খণ্ডন করিয়া তাহাকে তাহাতে রাজী করিয়া গিয়াছিল তাহা দেখা গিয়াছে। কমলার মৃত্যুর পর হইতে আবার একটা নূতন আপত্তি নিদাঘ-দিনান্তের দিগন্তপ্রসারী নিবিড় কালো মেঘের মত তাহার হৃদয়ের গুপ্ত প্রদেশ হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়াছিল।

কমলা যেদিন কাশীতে করুণার মুখখানি দেখাইয়া সুধাংশুকে বলিয়াছিল, "অনেক দেশ ত ঘুরেছ, ঠাকুরপো, এমন মুখ আর কোথাও দেখেছ ?"—সেই দিন হইতে মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণার সেই অচিরপ্রবৃত্ত প্রভাতের ঈষদুন্মেষিত পদ্মের মত,ব্রীড়াবনত, লজ্জাসঙ্কুচিত মুখখানি সুধাংশুর মানসে ফুটিয়া উঠিত। সেই দিন হইতে প্রায়ই তাহার মনে হইত—সংসারটা যেন বড়ই নীরস, দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি বড়ই গুরুভারাপন্ন। সেই দিন হইতে তাহার মন যেন কি একটা খুঁজিয়া বেড়াইত, তাহা না পাইয়া বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত ; তাহার মনে হইত, যেন তদভাবে তাহার জীবনটাও অসম্পূর্ণ।

এমন অনেক কথা আছে যাহা একসময়ে চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারা যায় না, আবার সময় ক্রমে আপনা হইতেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। পত্নীপ্রেমে মুগ্ধ বিরাজের সেই—"সংসারে অনেক রকমের অনেক দুঃখ, অনেক অভাব ও অশান্তি ; কিন্তু আত্মহারা হ'য়ে যে কাহাকে ভালবাস্‌তে পেরেছে, আপনার প্রাণকে আর একজনের প্রাণের সঙ্গে [illegible]য়ে দিতে পেরেছে, কোন দুঃখই আর তার দুঃখ ব'লে বোধ হয়

না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে তাতে বঞ্চিত, তার জীবন যতই উন্নত বা মহৎ হ'ক—অসম্পূর্ণ; সে অন্যদিকে আর যতই সুখী হ'ক, তার মত দুঃখী জগতে নেই"—ইত্যাদি যে কথাগুলি তখন সুধাংশু ভাল বুঝিতে পারিত না, সেই কথাগুলি ইদানীং সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া তাহার মনে হইত।

সে ভাবিত, "আমি কি কারুকে ভালবাসি না?—কেন, দাদার মুখ ম্লান দেখ্‌লে ত সংসার আমার অন্ধকার মনে হয়—তাঁর পায়ে একটা কাঁটা ফুট্‌লে আমার বুকে যেন একটা পাহাড় বিঁধেছে ব'লে মনে হয়!—এর নাম কি ভালবাসা নয়?—ভালবাসা হ'লেও এটা বোধ হয় আত্মহারা হ'য়ে ভালবাসা নয়—কারও প্রাণে প্রাণ মিশান রকমের ভালবাসা নয়! এতে যে দু'জনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বেশ বোঝা যায়! প্রাণে প্রাণে মিল থাকলেও এ মিলনকে মিশ্রণ বলা যায় কি?—এ যেন একহাতের দুটি আঙ্গুল—একবোঁটার দুটি ফুল! যে ভালবাসাতে দুটি প্রাণ যুক্তধারা দুটি নদীর মত, কিম্বা মিলিতশিখা দুটি দীপের মত এক হ'য়ে গেছে, যাতে আর দুটিকে স্বতন্ত্র ক'রে ভাবা যায় না—স্বতন্ত্র ব'লে বোঝা যায় না, ভালবাসার সে মিলন বা মিশ্রণ আমার জীবনে কোথায়?—পতিপত্নীভাব ভিন্ন বোধ হয় সে মেশামিশিটা জীবনে সম্ভব হয় না!"

এই চিন্তার সঙ্গে আরও অনেক কথা সুধাংশুর মনে হইত। সে ভাবিত, "প্রাণ মেশাবার মত প্রাণ কৈ?—দাদার মত ভাগ্য ক'জনের হয়?—তাঁর ভাগ্যে যেমনটি ঘ'টেছিল তেমন ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? তেমন আর নেই—তেমন বোধ হয় আর হয় না! সে যেন বিধাতার কি একটা অপ্রতিরূপ সৃষ্টি! তেমন—সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, সমান সুন্দর!—তেমন, ক্রোধে ও ঘৃণায়—স্নেহে ও ভালবাসায় তুল্য অতুলনীয়, পৃথিবীতে বড় বেশী দেখা যায় না!—করুণা মেয়েটিও মন্দ নয়!

ঠিক তেমনটি না হ'লেও অনেকটা যেন সেই ভাবের!—সে যেন পূর্ণিমার পূর্ণকলা ইন্দুচ্ছবি—আর এ কলামাত্র ইন্দু! তা হ'লেও এতে যেন সেই রকমের একটু প্রহ্লাদনী শক্তি আছে! সে যেন শ্রাবণের পূর্ণসলিলা ভাগীরথী—আর এ নিদাঘের ক্ষীণতোয়া সরস্বতী! —হ'লেও এতে যেন সেই রকম একটু পুণ্যজনকতার প্রসক্তি আছে! বউ-দিদি কি করুণার সঙ্গে আমার বের কথা পেড়ে গেছেন?—বোধ হয়! তা যদি না হবে তবে তেমন ক'রে আমাকে তার মুখখানি দেখাবার মানে কি?—দেখিয়ে, আমি যা সত্যি ক'রেছিনু তাও মনে করিয়ে দিলেন কেন? তা যদি ঘটে—করুণা যদি আমার সংসার-সঙ্গিনী হয়, তা হ'লে বোধ হয় জীবনটা এমন দুর্ভর—হৃদয়টা এমন ফাঁকা ফাঁকা—মনটার সর্ব্বদাই এমন উড়ু উড়ু ভাব—এসব কিছুই থাকে না!"

সুধাংশু যখন এইভাবের চিন্তায় দিন কাটাইতেছিল সেই সময়ে একদিন তরঙ্গিণীর মুখে শুনিল যে, কমলা হেমন্তের সঙ্গে পারুলের, আর করুণার সঙ্গে বিরাজের সম্বন্ধ স্থির করিয়া গিয়াছে। সেই দিন হইতে সে আর সেভাবে করুণার কথা ভাবিতে পারে না; তাহার হৃদয়ে পূজ্যের জন্য যে স্বতন্ত্র স্থান—যাহাতে পূর্ব্বে কমলার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিত, এবং এখন যাহা তাহার স্মৃতির অধিষ্ঠান হইয়াছে, সেই স্থানেরই একপাশে বসাইয়া, লোকে যেভাবে দেবীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া থাকে সেই-ভাবে এখন সে কখন কখন করুণার মূর্ত্তিটি চিন্তা করিয়া থাকে। এখন সে মাঝে মাঝে ভাবিয়া থাকে, এবং রায়মহাশয়ের—"আপনার আপত্তি কি?"—এই প্রশ্ন শুনিয়াও ভাবিতেছিল—"দাদা অনুরোধ ক'রলেই আমাকে বিয়ে ক'রতে হবে; তা না ক'রলে বউ-দিদির আত্মার

নিকটে মিথ্যেবাদী হ'তে হবে—তাঁর স্মৃতির অমান্য করা হবে! কিন্তু সে বিয়েতে আমি সুখী হব না। সংসারে যদি করুণার মতও আর কেউ না থাকে তবে, হে ভগবন্! দাদা যেন আর আমাকে বিয়ে ক'রতে না বলেন!" এই কথা ভাবিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "আমাদের বেশী কিছু ক'রতে হবে না, রায়!—বউ-দিদি নিজেই সে সব ব্যাবস্থা ক'রে গেছেন।"

রায়। এ বুড়োকে কি সে কথা শুন্‌তে নেই?

সুধাংশু। কেন—তুমি কি শোন নি যে, কৃষ্ণনাথ বাবুর ছেলের সঙ্গে পারুলের বের সম্বন্ধ ঠিক হ'য়েছে—তিনি তাকে দেখ্‌তে আস্‌ছেন? তাঁর একটি বড় মেয়েও আছে; বউ-দিদি তার সঙ্গে দাদারও সম্বন্ধ ঠিক ক'রে গেছেন।

আশা করিবার মত কিছু একটা পাইয়া রায় মহাশয় হর্ষোৎফুল্লমুখে চলিয়া গেলেন।

৮

দুই চারিদিন পরেই একদিন কৃষ্ণনাথ আসিলেন। সুধাংশু ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার অপরিচিত, সকলে সেইভাবেই তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছিল। তিনি কিন্তু সবার সঙ্গে এমনি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন সকলেরই কতদিনের কত আপনার জন। তাঁহার আদর অভ্যর্থনার জন্ম সকলকেই বিশেষ একটু বিব্রত দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বিরাজকে বলিলেন, "দেখ—বাপু, আদর যত্ন যদি কারুকে সুখী করবার জন্যেই করা দরকার মনে কর, তবে আমাকে পর ভেবে তার একটুও বাড়াবাড়ি ক'রো না, তাতে আমি একটুও সুখী হ'ব না।"

সে কথা কে শুনে? তরঙ্গিণী সুধাংশুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যেন একটা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তুলিল।

রায় মহাশয় যেন যৌবনের বল ফিরিয়া পাইয়াছেন। কৃষ্ণনাথ আসিতেছেন—এই সংবাদ পাইয়াই তিনি হাত-কাটা একটা পিরান্ এবং নূতন একখানা চশমাও খরিদ করিয়া ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণনাথের অভ্যর্থনার পাছে কিছু ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায় সকলের অপেক্ষা তিনিই অধিক ব্যস্ত ; কিন্তু সে ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে সুধাংশুকে নিকটে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে—"সে কথাটা কখন হবে ?—যেন ভুল না হয় !"—এই কথাটা বলিতে ভুলিতেছেন না।

আহারান্তে কৃষ্ণনাথ নীলকমলের উপরের দালানে বসিয়া বিরাজের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। নীচের দালানে তরঙ্গিণী পারুলকে ধরিয়া বসাইয়া তাহার চুল-বাঁধা লইয়া ব্যস্ত ছিল। সুধাংশু এক একবার উপরে গিয়া কৃষ্ণনাথ ও বিরাজের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, আর মাঝে মাঝে নামিয়া আসিয়া, প্রসাধনের ব্যাপারটা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সমাধা হয় সেই জন্য তরঙ্গিণীকে তাগাদা করিতেছিল।

মধ্যে একবার উপরে গিয়া সুধাংশু শুনিতে পাইল, কৃষ্ণনাথ বিরাজকে বলিতেছেন—"আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, বৎস, যা যায় তা একেবারে যায় না—চিরদিনের জন্যে কিছুই তিরোহিত হয় না ; সবই আছে—সবই থাকে, শুধু স্থানান্তরে গিয়ে রূপান্তরে থাকে। যাওয়ার মানে আর কিছুই নয়, শুধু পরিবর্ত্তন—স্থান, নাম ও অবস্থার পরিবর্ত্তন। যা হারিয়েছি তা যে আর কখন পাব না—এমনটা আমার মনে হয় না। ভুল হ'লেও আমি এ ধারণাটা পরিবর্ত্তিত ক'রতে চাই না—এটা বিয়োগীর একটা ভারী সান্ত্বনা। তবে যে মোহিনী শক্তি সংসারের যাবতীয় কঠোর কর্ত্তব্যকে মনোহর

ক'রে রাখে, তার অভাবে হৃদয়ে যে একটা বিশাল শূন্যতা এসে পড়ে তাও সত্য। সে শূন্যতার যে কিছুতেই পূরণ হয় না—বিশ্বের স্থান হ'য়েও যে তার অনেকটা খালি প'ড়ে থাকে তা আমিও বুঝি। কিন্তু উপায় কি? নিয়তি ত আমাদের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী নয়—আমরাই তার ক্রীড়া কন্দুক।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'সংসারীর পক্ষে স্ত্রী-বিয়োগের মত এমন দুঃখ আর নেই। ঘর, সংসার, কিছুই কিছু নয়—গৃহিণীই পুরুষের গৃহ। গৃহশূন্য হ'য়ে সংসার ক'রতে কার ভাল লাগে? কিন্তু কতকগুলি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তা ক'রতেও হয়। হাতে রং বা কেরাই না থাকলে যেমন তাস খেলাতে মন লাগে না; অথচ আর আর যারা খেলাচ্ছে তাদের জন্যে খেলে যেতেও হয়, এও যেন সেই রকম। তবে যারা স্ত্রীর চিতা নিভ্‌তে না নিভ্‌তে আবার চেলী প'রে টোপর মাথায় দিতে পারে তাদের কথা স্বতন্ত্র"—

কৃষ্ণনাথের শেষ কথাগুলি সুধাংশুকে ভাল লাগিল না। আজ তিনি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মুখে এ কথাগুলি যেন বড় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তাহার মনে হইল; সে অপ্রসন্নমুখে নামিয়া আসিল।

সুধাংশু নিম্নে বসিয়া তরঙ্গিণীর সঙ্গে কি একটা পরামর্শ করিতেছিল, সেই সময়ে বিরাজ নামিয়া আসিয়া, তাহাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া বলিল, "ও—সুধা! কৃষ্ণনাথ বাবু যে অবিবাহিত মেয়েকে রেখে আগে ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হন না!"

সুধাংশু। তিনি যে কিছু অন্যায় ব'ল্‌ছেন তা ত বলা যায় না, দাদা!

বিরাজ। কিন্তু সে অপেক্ষায় পারুলকে ত আর বেশী দিন রাখাও চলে না!

সুধাংশু। অপেক্ষারই বা দরকার কি?—হুঁ'—

বিরাজ। তিনিও তাই বলেন ;—মেয়েটিরও বিয়ে তিনি আমাদেরই বাড়ীতে দিতে চা'ন।

সুধাংশু। বড় বউঠাক্‌রুণ ব'ল্‌ছিলেন—বউ-দিদি না কি নিজেই সেকথা পেড়ে গেছেন।

বিরাজ। আমিও কৃষ্ণনাথ বাবুকে একরকম কথা দিয়েছি।

সুধাংশু। তাঁর ঋণ আমরা জীবনে কখন শোধ ক'রতে পারব না—তাঁর অনুরোধ অমান্য করা কোন রকমেই কর্ত্তব্য নয়।

বিরাজ। তবে তুই পারুলকে নিয়ে ওপরে আয়!—আশীর্ব্বাদের কাজ তিনি আজই শেষ ক'রে যাবেন ব'ল্‌ছেন।

বিরাজ উপরে চলিয়া গেলে সুধাংশু একমুখ হাসিয়া, তরঙ্গিণীর নিকটে আসিয়া বলিল—"মেঘ না চাইতেই যে জল, বউঠাক্‌রুণ!"

তরঙ্গিণী পারুলের বেণীবন্ধন শেষ করিয়া তাহাতে 'হেয়ার্‌-পিন্' গুঁজিতেছিল—বলিল, "কি খবর?"

সুধাংশু। দাদা রাজী—তুমি শীগ্‌গির ক'রে পারুলকে একখানা কাপড় পরিয়ে দাও—সাজ-গোজের কিচ্ছু দরকার নেই।

তরঙ্গিণী তাহাই করিল। সুধাংশু লজ্জানম্রমুখী, বেপথুমতী বালিকার হাত ধরিয়া, তাহাকে কৃষ্ণনাথের সম্মুখে আনিয়া বসাইয়া দিল; এবং ভরসা দিবার জন্য আপনিও তাহার নিকটেই বসিল।

এদিকে আশীর্ব্বাদের কথা শুনিয়া রামের-মা, শ্যামের-মা, কামিনী, দামিনী, নবী, ভবী, প্রভৃতি প্রতিবেশিনীরা দলে দলে উপস্থিত হইতে-ছিলেন। চারিদিক্ হইতে উঁকি-ঝুঁকি ও কাণাকাণির খুব ধুম্ পড়িয়া গিয়াছিল। বালিকারা শাঁখ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাতে ফুঁ দিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কৃষ্ণনাথ ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর সুলক্ষণাবলী

নিরীক্ষণ করিতে করিতে, কথা কহাইবার জন্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে এক একটা প্রশ্ন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল— বিরাজ ও সুধাংশু, আর পারুলের উত্তর শুনিয়া প্রীতমনে হাসিতেছিলেন —কৃষ্ণনাথ এবং রায় মহাশয়!

শুভ মুহূর্ত্তে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সুবর্ণমুদ্রা, শুক্লধান্য ও দূর্ব্বা হস্তে লইয়া কৃষ্ণনাথ শুভ আশীর্ব্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্ময়ের বিষয়, সে সকল বিরাজের মাথায় না উঠিয়া সুধাংশুর মস্তকে আসিয়া পড়িল।

সুধাংশু একেবারে অবাক্! সে সংশয়ে ভ্রূযুগ কুঞ্চিত করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে প্রথমে কৃষ্ণনাথের তৎপরে বিরাজের মুখ পানে চাহিল। কার্য্যটা যে ভুলক্রমে হইল, কাহারও মুখের ভাবেই এমনটা তাহার বোধ হইল না—বরং দেখিল, বিরাজ তাহার ভাব দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, এবং বাহিরে একটা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তরঙ্গিণীও তাহাই করিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে ইহা যে তাহাদেরই ষড়যন্ত্র তাহা বুঝিয়া, সুধাংশু মুখখানাকে ভারী করিয়া বসিয়া রহিল।

পারুলকেও যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণনাথ বিদায়োন্মুখ হইলেন। রায়মহাশয় ও বিরাজ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলে, তরঙ্গিণী সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

কমলার মৃত্যু ও হীরালালের নিরুদ্দেশ হইতে তরঙ্গিণীর মুখের ভাবে একটা বিষাদজড়িত গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়িয়াছিল। এখন আর তাহার মুখে বড় হাসি দেখা যায় না—বেশী কথাও শুনা যায় না। আজ কিন্তু তাহার সেই গাম্ভীর্য্যম্লানতার অভ্যন্তর হইতে মেঘাবৃত চন্দ্রের ম্লান কিরণের মত একটা ম্লান প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে আসিয়াই একটু হাসিয়া বলিল, "এখনও যে মাথা পেতে ব'সে র'য়েছ, ঠাকুরপো!—

আশীর্ব্বাদ মন-সই হয় নি কি? আচ্ছা—তবে আমিও কিছু আশীর্ব্বাদ করি—"

সুধাংশু ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিল, "তুমি যে ব'লেছিলে—দাদার সঙ্গে?"

তরঙ্গিণী। তোমার মনটা ছ'লে দেখেছিনু—এখন খুসী হ'য়েছ ত?

এই ব্যাপারটা কমলার স্নেহের কথা সুধাংশুর মনে জাগাইয়া দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন কে একটা গুরুভার অয়োঘনের দ্বারা তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগে আঘাত করিতেছে। সে অশ্রু-সমাকুল-নেত্রে তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া বাষ্পজড়িত গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "না—বউঠাক্‌রুণ! তোমার পা ছুঁয়ে শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি, এ আশীর্ব্বাদ যেন আজ আমার অভিশাপ মনে হচ্ছে।"

তরঙ্গিণীও গম্ভীরভাবে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বাষ্পকম্পিতকণ্ঠে বলিল—"এ সবের যে ঘটক সে আমার আজ কোথায় র'য়েছে, ঠাকুরপো?"—বলিয়াই চক্ষে আঁচল চাপিয়া কান্না সুরু করিয়া দিল।

কমলার বিয়োগজনিত দুঃখের সঙ্গে আর কাহারও বিরহব্যথা আসিয়া যোগ দান করিল কি না—কে বলিতে পারে, কিন্তু তরঙ্গিণী আকুল-হৃদয়ে ভারী কাঁদিতে লাগিল।

কৃষ্ণনাথকে বিদায় দিয়া বিরাজ আসিয়া দেখিল, সুধাংশু ও তরঙ্গিণী দুই জনে দুই দিকে বসিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহাদের দুইজনকেই কাঁদিতে দেখিয়া তাহার মুখখানিও আর তেমন সহর্ষ রহিল না—গম্ভীর হইয়া গেল।

নীরবে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিরাজ গম্ভীরভাবে বলিল, "এ তোমাদের কি হচ্ছে, বউঠাক্‌রুণ?—ছিঃ! তুমিও কি সুধার মত ছেলে মানুষ হ'য়ে

উঠ্‌বে ?”—আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “যাও—শুভদিনে চোখের জল ফেল্‌তে নেই !”

তরঙ্গিণী চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া চলিয়া গেলে, বিরাজ সুধাংশুর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বলিল, “আয়, ভাই—একটু গঙ্গাতীরে গিয়ে ব’সে আসি !”

* * * * * * * * * *

সুধাংশু ও পারুলের বিবাহের কার্য্য সব শেষ হইয়া যাইবার কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময়ে বিরাজ ও সুধাংশু আসিয়া গঙ্গার নির্জ্জন কূলে বসিয়াছিল।

সায়াহ্নের তাম্র-ভানু পশ্চিম গগনে লোহিত রাগের একটা ম্লান আভা রাখিয়া দিগন্তরালে ডুবিয়া গিয়াছে। নক্ষত্রাবলী নীলাবরণের মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যা-সমীরণ ভাগীরথীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ধীরে ধীরে তীরাভিমুখে বহিয়া আসিতেছে। তরঙ্গাবলী যেন অবিরাম উত্থান-পতনে অতিমাত্র শ্রান্ত হইয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া সৈকত শয্যায় লুটাইয়া পড়িতেছে। বিরাজ ও সুধাংশু দুই জনেই মৌন—দুই জনেই চিন্তামগ্ন। মধ্যে মধ্যে দুইজনে এক একটা কথা হইতেছিল আবার বহুক্ষণ ধরিয়া গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল।

সুধাংশু ভাগীরথীর দূর বক্ষে অলস দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া ম্লানমুখে বসিয়া বিমনমনে কিছু চিন্তা করিতেছিল। আর নীল নভোবৃত্ত বক্রভাবে নামিয়া যেখানে তিমিরাবৃত বনরেখার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, বিরাজ অনিমেষনেত্রে সেই স্থানে চাহিয়া গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে যেন কিছু দেখিতেছিল।